চিকিৎসা শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদের

প্ল্যাটফর্ম

১ম বর্ষ ▣ ২য় সংখ্যা ▣ আগস্ট ২০১৪ ▣ পৃষ্ঠা ২৮ ▣ মূল্য ৫০ টাকা

নিরাপদ কর্মস্থল চাই
চিকিৎসকের উপর হামলা : গন্তব্য কোথায়
চিকিৎসকদের ধর্মঘটঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

প্রস্তাবনা
মেডিকেল কলেজে সপ্তাহে ৬ দিন ক্লাস কতটা যৌক্তিক?

যারা চিকিৎসক নন তাঁদের প্রতি
ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রচলিত কিছু প্রশ্ন এবং অন্যান্য

শিক্ষকদের পাতা
লিন্ডাও ঃ নোবেল জয়ীদের সাথে তরুণ গবেষকদের সম্মেলন

Career
MRCP: The Story of a Post Graduate Examinee

সরকারি ডাক্তার
ইনজুরি সার্টিফিকেট কড়চা

প্রচ্ছদ | ডাঃ আজমিরী বিনতে আসলাম

সম্পাদকীয়

একজন চিকিৎসক দায়বদ্ধ থাকেন সমাজের কাছে, তার নিজ মেডিকেল কম্যুনিটির কাছে। চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা থেকে "প্ল্যাটফর্ম" পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো যেখানে সাম্প্রতিক চিকিৎসক অসন্তোষ, চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত নানা অস্থিরতা নিয়ে নবীন চিকিৎসকদের দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি একজন সংবাদকর্মীর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে । চিকিৎসকদের সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা, চিকিৎসা খাতের বিদ্যমান অসংগতিগুলো সাধারণ মানুষকে জানানো এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা, প্রস্তাবনা "প্ল্যাটফর্ম" পত্রিকার এবারের সংখ্যার মূল বিষয়। চিকিৎসা শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকদের পেশাগত জীবনের হাসি-কান্না, শিক্ষানবিশ এবং অবৈতনিক চিকিৎসকদের সংগ্রাম, পোস্টগ্রাজুয়েশন ও ক্যারিয়ার গাইড লাইন, ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক অর্জন, গবেষণা, সরকারী চাকরীর অভিজ্ঞতাসহ পড়াশোনার বাইরে নানা আয়োজন উঠে এসেছে প্রতিটি লেখায়। ডেন্টাল শিক্ষার্থী ও ডেন্টিস্টদের জন্য আলাদা পাতা এবং শিক্ষকদের অসাধারণ লেখনীতে এবারের সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে। বরাবরের মতই 'প্ল্যাটফর্ম' পত্রিকার এই প্রয়াস চিকিৎসক সমাজের একতাবোধ দৃঢ় করতে কাজ করবে।

☐ **সম্পাদক//**
ডাঃ মোহিব নীরব

☐ **উপদেষ্টা সম্পাদক//**
ডাঃ মোহাম্মদ শাহ আলম
ডাঃ সানজিদা শাহরিয়া
ডাঃ আবু সাদাত মোহাম্মদ নুরুন্ নবী
ডাঃ ইনকগনিটো
ডাঃ সেলিম শাহেদ
ডাঃ অনুজ কান্তি দাশ
ডাঃ জুবায়ের মাহমুদ খান
ডাঃ মোঃ মারুফুর রহমান অপু
ডাঃ রজত দাশ গুপ্ত
তন্ময় বিশ্বাস

☐ **শিল্প সম্পাদক//**
ডাঃ শাকিল সালেকিন

☐ **সম্পাদনা পরিষদ//**
আহমেদুল হক কিরণ
ডাঃ জাহিদুল ইসলাম
আদনান বিন আখতার
ইশরাত জাহান মৌরি
সিফাত খন্দকার
ডাঃ ইয়াসির আরাফাত হিমু
সিফাত রহমান
তুনাজ্জিনা শাহরিন
মারেফুল ইসলাম মাহী
মোঃ ফেরদৌস রহমান
ফাতিমা ফারিহা আনিকা
শরিফ মারিয়া রহমান
মোঃ আসিফ উদ্দিন খান
মেহেদী শাহরিয়ার রীহান
মোঃ ইনজামাম উল হক

☐ **সজ্জা //**
ডাঃ এনামুল হোসেন ইমন

☐ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**
১৫, বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ০১৬৭০৯৭৪২৫৩,০১৯১১০৫৬১৭৭, ০১৬৭৪৯৩০৫৩০
ওয়েব: www.platform-med.org
ইমেইল:bddoctorsplatform@gmail.com
বিকাশ নাম্বারঃ ০১৬৭৬ ৩৩৩৪৯৯ (পত্রিকা প্রাপ্তি)
০১৭৯৩ ৫৯৪৩৪৫ (মেম্বারশিপের জন্য)
ফেসবুক পেজ:www.facebook.com/pages/প্ল্যাটফর্ম/237592689724934
ফেসবুক গ্রুপ:www.facebook.com/groups/platform.bd/

☐ মূদ্রণ: খন্দকার কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টিং
১১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাটাবন, ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ০১৭১৪২৪৪৯৬৬

চিকিৎসকের উপর হামলা : গন্তব্য কোথায়

ডা. আহমেদ সালাম মীর, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল

একজন ডাক্তার কিভাবে চিকিৎসা করেন? সেই ছোটবেলায় যখন জ্বর-কাশি-শ্বাসকষ্ট নিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে যেতাম, তখন আমার ধারণা ছিল, টেবিলের ওপর রাখা মোটা মোটা বইগুলোতে নিশ্চয়ই রোগ ধরার সব কায়দা কানুন লেখা আছে। ক্লাস ওয়ানে পড়া ছয় বছরের একটা ছেলে যদি মিরপুর থেকে তিনদিনের জ্বর আর খুসখুসে কাশি নিয়ে আসে, তাহলে কোন সিরাপ কতদিন কিভাবে খেতে হবে, সব ওখানে লেখা। তারপরও বুঝতে না পারলে বুকের মধ্যে স্টেথোস্কোপটা বসিয়ে দিলেই হল আওয়াজ শুনেই ডাক্তার সাহেব সব বুঝে যাবেন আর ঝটপট প্রেসক্রিপশন লিখে দেবেন, অসুস্থও ভাল হয়ে যাবে।

এখন এত বছর পর জিনিসগুলো চিন্তা করে হাসি পেলেও চোখ বন্ধ করে বলতে পারি, বেশীর ভাগ সাধারণ লোকের ধারণা এর চেয়ে খুব একটা পরিস্কার নয়। হিপোক্রেটিস বা ইবনে সিনার যুগের মত একজন গুরুর কাছ থেকে ডাক্তারি শেখার যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। চিকিৎসা এখন শুধু বিদ্যা নয় বিজ্ঞান। চিকিৎসক রোগীর উপসর্গ ও শারীরিক পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি সম্ভাব্য রোগকে বেছে নেন। তারপর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যটিকে ভিত্তি করে চিকিৎসা শুরু করেন। একই অংকের যেমন একাধিক সমাধান সম্ভব, তেমনি একই রকম উপসর্গ একাধিক রোগে হতে পারে। বৈজ্ঞানিক সমাধানের সীমাবদ্ধতা থাকবেই। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সয়ূজ মহাকাশযান যখন দুর্ঘটনায় পড়ে বা চেরেনোবিল ভাইরাসের আক্রমণে যখন শত শত কম্পিউটার ক্র্যাশ করে,তখন আমরা মাথা নিচু করে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মেনে নিলেও হাসপাতালে রোগী মারা যাওয়াকে সেই ব্যাখ্যায় ফেলতে আমরা নারাজ। একটা মাত্র ব্যাখ্যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য চিকিৎসকের অবহেলা ও ভুল চিকিৎসা। তথ্যপ্রমাণ সাক্ষীসাবুদ থাকুক আর নাই থাকুক,আমরা এই ব্যাখ্যাই বিশ্বাস করছি, প্রচার করছি, তারপর ডাক্তারের ওপর আক্রমণ করে মনের ঝাল মিটিয়ে নিচ্ছি। প্রশ্ন হচ্ছে, বারবার কেন চিকিৎসকের ওপরই হামলা? সহজ জবাব চিকিৎসকদের হাতের নাগালে পাওয়া যায় এবং তাঁরা অরক্ষিত। এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছেনা, রাস্তায় জ্যাম, লিফটে রোগীদের লম্বা লাইন, ঔষধের চড়া দাম, হাসপাতালের বিল দিতে ব্যাংকে যেতে হবে এই ক্ষোভগুলো ঝাড়বো কোথায়? (এরপর ১৯ পাতায় প্রথম কলাম)

হাসপাতালে কী ঘটে, মিডিয়াতে কী আসে

দৃশ্যপট ১- বারডেমের চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে প্রচারপত্রঃ গত ১৩ এপ্রিল ২০১৪ রবিবার বারডেম জেনারেল হাসপাতালের ১৩২নং ওয়ার্ডে একজন রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোগীর স্বজনেরা হাসপাতালে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগে চিকিৎসাধীন ১৩৩১নং বিছানার এই রোগী যথোপযুক্ত চিকিৎসা এবং ব্যবস্থাপনা পাওয়া সত্বেয় ঐ দিন রাত ৮টায় মারা যান । তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোগীর স্বজন নামধারী প্রায় ৬০-৭০জন দুষ্কৃতিকারী হাসপাতালে তান্ডব চালায়। তিনজন কর্তব্যরত চিকিৎসককে তাঁরা ১৩২২নং কক্ষে জিম্মি করে রাখে। এরপর ঢাকা জোনের উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা পরিচয় প্রদানকারী একজন ব্যক্তি ও প্রাক্তন এক মন্ত্রীর এপিএস পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির ইন্ধনে তারা চিকিৎসকদের উপর হামলা চালায়। তারা চিকিৎসকদের মাটিতে ফেলে নির্মমভাবে প্রহার করে ও তাঁদের উপর টেলিভিশন মনিটর, পানির ফিল্টার ইত্যাদি ছুড়ে ফেলে রক্তাক্ত করে। একজন মহিলা চিকিৎসক প্রাণভয়ে টয়লেটে লুকিয়ে থাকলে তারা দরজা ভেঙ্গে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে বের করে লাঞ্ছিত করে। তাঁদেরকে বাঁচাতে এসে সহকারী অধ্যাপক (ডাঃ) মো ফিরোজ আমিন ও লাঞ্ছিত হন ।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকজন আনসার এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তা থাকলেও দু-একজন ছাড়া বাকী সবাই নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। আরো লক্ষ্যণীয় যে, হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বারবার জানানো ও সাহায্য চাওয়া সত্বেয় সময়মত কোন সাহায্য আসেনি । ঘটনা শুরুর প্রায় তিন ঘন্টা পর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে আসেন । রাত ১২.৩০ এর দিকে দুষ্কৃতিকারীরা বীরদর্পে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

প্রিয় সহকর্মী, এরপরও কী আপনি প্রতিবাদ না করে ক্যারিয়ার আর প্রমোশনের আশায় কেঁচোর মত জীবন কাটিয়ে দেবেন?

আসুন এই দাবীতে সোচ্চার হই- ১ এই ঘটনায় যথাসময়ে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে দোষী ব্যক্তিদের যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রাক্তন এক মন্ত্রীর এপিএস পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তিসহ দুষ্কৃতিকারীদের রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৩ আহত চিকিৎসক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা,নিরাপত্তা ও আইনী সাহায্য নিশ্চিত করতে হবে।

এ দাবীগুলো বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা কর্মস্থলে ফিরে যাবো না। আমরা একাই একশ,তাহলে একশ চিকিৎসক কেন এক হতে পারে না? আসুন আমরা সবাই এক হই । (এই লিফলেটটি গত ১৪ এপ্রিল বারডেম জেনারেল হাসপাতালে সর্বস্তরের চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়,লিফলেটের তথ্য বা বিষয়বস্তুর জন্য প্ল্যাটফর্ম দায়ী থাকবেন না)

গণমাধ্যমে খবর: ভুল চিকিৎসার অভিযোগ থেকে বাঁচতে ডাক্তারদের ধর্মঘট নাটক। রোগীদের দূর্ভোগ! (এরপর ২০ পাতায় প্রথম কলাম)

পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ মিটাবে বিবাদ

গোলাম রাব্বানী, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

"ও ডাক্তার, ও ডাক্তার/ তুমি কতশত পাস করে এসেছ বিলেত ঘুরে মানুষের যন্ত্রণা ভোলাতে/ ডাক্তার মানে সেতো মানুষ নয়/ আমাদের চোখে সেতো ভগবান। কসাই আর ডাক্তার একই তো নয়/ কিন্তু দুটোই আজ প্রফেশান।"

কলকাতার শিল্পী নচিকেতার গান। এর কতোটা সত্য, আর কতোটা মিথ্যে সেটা যাচাই করা কঠিন। তবে সম্প্রতি দেশে চিকিৎসকদের সাথে রোগী এবং তাদের স্বজনদের মধ্যে প্রায়ই বাধছে বিরোধ, যে কারণে চিকিৎসকদের ভাবমূর্তির ক্ষূণ্ন হচ্ছে নিঃসন্দেহে। ভুল চিকিৎসা, দুর্ব্যবহার, যথাযথ চিকিৎসা না দেয়ার অভিযোগে একাধিক স্থানে চিকিৎসকদের ওপর হামলা করেছে রোগীর স্বজনরা। আবার কোথাও কোথাও সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের ওপর হামলাও করেছে চিকিৎসকরা। এসবের জেরে আবার হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা বন্ধ করে দেয়া নিয়ে সমালোচনায় পড়েছে চিকিৎসকরা। তবে এসব ঘটনার জন্য সবাইকে ঢালাও দোষারোপ করা ঠিক না। আর সব ঘটনাতেই যে চিকিৎসকরা দায়ী ছিলেন, বিষয়টিও ঠিক না।

বিনয়, নম্রতা, সততা, একাগ্রতা, কর্তব্যপরায়ণতা পেশার প্রতি কমিটমেন্ট সকল পেশাজীবীকে উর্দ্ধোলোকে নিয়ে যায়। একজন রোগীর মাথায় ডাক্তাররা মা-বাবা বলে যখন হাত রাখেন তখনই রোগী ভালো হয়ে যান অর্ধেক। আর ডাক্তারের প্রতি রোগীর বিশ্বাস তাকে অর্ধেক সুস্থ করে তোলে। তাই রোগীর প্রতি ডাক্তারের মানবিক আচরণ, দায়বদ্ধতা, পেশার প্রতি কমিটমেন্ট আমাদের তরুণ ডাক্তারদের জন্য অনুসরণীয়। তা হলেই রোগী পাবে সঠিক সেবা। বিবাদ হবে না করো সঙ্গে।

একইভাবে একজন সংবাদকর্মী যখন একজন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায় তার পেশাদারিত্ব নিয়ে, তখন তিনিও ভুলে যান নিজের কথা। কিভাবে সাহায্য করা যায় তাই শুধু ভাবেন। আর এমন সাহায্যের হাত বাড়াতে গিয়ে কখনো জড়িয়ে পড়েন বাক-বিতণ্ডায়। তখন তিনি হয়ত ভুলে যান তার দায়িত্বের কথাও, যে তিনি প্রশাসনের কেউ নন। কাউকে কিছু করতে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন না। তবে অনুরোধ করতে পারেন। আর এভাবেই কখনো কখনো ডাক্তার ও সাংবাকিদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়।

তবে যে যার অবস্থান থেকে পেশার কথা স্মরণ রেখে নিজে বিনয়ী, নম্র, কর্তব্যপরায়ণ হলেই কখনো বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর পেশাকে ইবাদতের মতো গ্রহণ করে এক একটি প্রতিষ্ঠানকে প্রার্থনাশালায় পরিণত করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়। তরুণ ডাক্তারদের দেশ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই সামনের পথে পা বাড়াতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর স্বজনরাও কখনো কখনো অতিমাত্রায় হাসপাতাল ভাঙচুরসহ নানা কাণ্ড ঘটান। মনে রাখতে হবে দেশ আমাদের। সম্পদ আমাদের। সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার করেই এগিয়ে যেতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে, স্বাধীনতার ৪২ বছর পর যে জাতি গভীর জাতীয়তাবোধ থেকে দীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশ স্বাধীন করেছিল, সেই তারা আজ চিকিৎসার জন্য বিদেশে উড়ে যাচ্ছে। আমাদের চিকিৎসাসেবার প্রতি মানুষের আস্থা না বাড়ালে একটা বিশাল অংকের অর্থ প্রতি বছর বিদেশ চলে যাবে। আর বিদেশে চিকিৎসাসেবা নেওয়ার সামর্থ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের তো নেই-ই, শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষই দেশের চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে। তার মধ্যে বড় অংশটি সরকারি মেডিকেল কলেজ, হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে। আর আমাদের তরুণ ডাক্তারদের মধ্য থেকেই আধুনিক মালয়েশিয়ার জনক একজন মাহাথির মোহাম্মদ বেরিয়ে আসবেন। মাহাথির মোহাম্মদও পেশায় একজন ডাক্তার ছিলেন। এমনকি দুনিয়ানন্দিত বিপ্লবী চেগুয়েভারাও একজন চিকিৎসক ছিলেন। সাধারণ মানুষরা চায় তরুণ ডাক্তার-সাংবাদিকদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগ্রত হোক। (এরপর ১৯ পাতায় তৃতীয় কলাম)

একটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একজন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের কথা

ডাঃ আনোয়ারুল ইসলাম (দিদার), ব্যাচ-১, কক্সবাজার এমসি

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি, বাবার সাথে গিয়েছিলাম সাবেক পিজি হাসপাতালে। আব্বা সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন, সবাই মোটামুটি শ্রদ্ধা এবং ভয় দুটোই করত। সেদিন আব্বা কেন জানি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, চেম্বার থেকে বের হয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "আল্লাহ আমার একটা ছেলেকে অন্তত ডাক্তার বানিয়ে দাও।" কেন বললেন? আজও জানি না। এসএসসিতে গোল্ডেন এ+ পেয়ে হাওয়ায় উড়তে উড়তে এইচএসসিতে একদম ডাব্বা মেরে বসলাম মানে জিপিএ ৪.৩০ পেলাম। একদম আসমান থেকে ৩ ফুট মাটির নিচে। সেই হতাশায় কোথাও সুযোগ পেলাম না। একদিন এলাকার ব্রিজে বসে মাছি মারছিলাম, স্কুলের পেছনের বেঞ্চের এক বন্ধু এসে বিশাল জ্ঞান দান করে গেল। সে তখন বুয়েটের ছাত্র আর আমি আদু ভাই। রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পরও কাঁদি নাই কিন্তু ঐদিন অনেকক্ষণ কাঁদলাম। মনে মনে ভাবলাম যে স্কোর, তাতে ভাল কোথাও সুযোগ পাওয়া মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। যা হোক, আমার মত একই পথের পথিক পাঁচ জন বন্ধু যোগ হল, এক সাথে আমরা শুরু করলাম মেডিকেলের পড়া। দেখতে দেখতে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমাদের সেশনের সর্বশেষ মেডিকেলে সুযোগ পেয়ে গেলাম। সবাই বলে নতুন মেডিকেল, শেষের দিকের মেডিকেল-আমি শুধু বললাম, সুযোগ যে পেয়েছি, তাতেই আলহামদুলিল্লাহ। যা হোক মেডিকেলে আসলাম, আল্লাহর অপরূপ লীলাভূমি কক্সবাজারের প্রাণকেন্দ্রে আমাদের মেডিকেল। দুরু-দুরু মনে ক্লাস শুরু করলাম, প্রিন্সিপাল স্যারসহ মোট শিক্ষক মাত্র ৪ জন। স্যারেরা সবাই আসলেন ঢাকা আর রংপুর থেকে। আমরা পরিবারের জন্য কাঁদি, স্যারেরাও তাঁদের পরিবারের জন্য কাঁদেন। ফলস্বরূপ, কয়েক দিনের মধ্যেই সবাই চলে গেলেন। পুরো তিন মাস একা মেডিকেল চালিয়েছেন অধ্যাপক বিএম আলি ইউসুফ স্যার। তিনি আমাদের সব বিষয় পড়ান, তিনি অফিসের কাজ করেন, আবার তিনিই ক্লাসরুম, অফিস ঝাড়ু দেন। অন্য কোথাও এই নজির আছে কিনা সন্দেহ। মনে আছে লাইব্রেরির বেশিরভাগ বই আমরা নিজের হাতে সাজিয়েছি, এখন লাইব্রেরির দিকে তাকালেই চোখে পানি এসে যায়। শুরু করলাম আন্দোলন, অনশন। ২৫০ টাকা চাঁদা দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করলাম। এর ফলে ৭ জন শিক্ষক যোগদান করলেন। এইতো গেল কলেজের কথা, এ বার আসি হোস্টেলের কথায়। অন্যান্য বড় মেডিকেলের বন্ধুরা যখন মজায়, আমরা তখন বাসা খুঁজে বেড়াই। কক্সবাজার পর্যটন-নগরী হওয়ায় এখানকার মানুষ একটু বেশি ব্যবসায়ী ধ্যান ধারণার। পানি নিয়ে বাড়িওয়ালীর সাথে ঝগড়া, দরজা জোরে লাগানো নিয়ে ঝগড়া, তারপর বাসা থেকে বের করে দেয়া, তারপর আবার বাসা খোঁজা-এ ভাবেই পার করেছি এক বছর। বুয়া এসে রান্না করত, কি রান্না করত জানি না, না পেরে তাই খেতাম। একবার বুয়া বলল, কি রাঁধব? বললাম-মুরগী রাঁধেন। বুয়া বলল, লবন নাই, পিয়াঁজ নাই। বললাম-লবন, পিয়াঁজ ছাড়াই রাঁধেন-এই ছিল অবস্থা। দেখতে দেখতে ফার্স্ট প্রফ পাশ করলাম, এবার শুরু হল ওয়ার্ডের ঝামেলা। প্রথম ব্যাচ হিসেবে কিছুই গোছানো ছিল না, তাই ওয়ার্ড শুরু হল তিন মাস পর। রেজিস্ট্রার, সিএ কেউ নাই। প্রফেসর স্যারেরা ক্লাস নেন, তারাই ওয়ার্ড ফাইনাল ঠিক করেন। প্রফের সময় দেখি নতুন নতুন নিয়ম, এগুলো বুঝতে পারাই ছিল মূল সমস্যা। তখন সিনিয়রদের অভাব টের পেয়েছি, স্যারেরাই ছিলেন আমাদের বড় ভাই।

শুধু অসুবিধা না, অনেক সুবিধাও পেয়েছি। নতুন মেডিকেলের প্রথম ব্যাচ হিসেবে স্যারদের অনেক কাছাকাছি ছিলাম, স্যারদের সাথে অনেক ভালোভাবে মিশতে পেরেছি, অন্য কোথাও এই সুবিধা মনে হয় পেতাম না। অন্য মেডিকেলের বন্ধুরা বলত, ওরা প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে ঢুকতে পারত না। আর আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার রোজার সময় নিজে ইফতারি বানিয়ে আমাদের খাওয়াতেন। ফাইনাল প্রফের রেজাল্টের পর স্যারদের বাচ্চাদের মত আনন্দ কে দেখে! স্যারদের সাথে এত বন্ধু সুলভ পরিবেশ অন্য মেডিকেলে আছে কিনা জানা নাই। মাথার উপর বড় ভাই নাই, তাই ধমক খাওয়ার ভয় নাই। জুনিয়রদের আমাদের প্রতি ভালবাসা আর শ্রদ্ধা ভুলবার মত নয়। তাছাড়া মেডিকেলের স্টাফদের স্নেহ দেখার মত ছিল। মেডিকেলের বাইরের মানুষের শ্রদ্ধা নিজের মনে গৌরবের এক শীতল পরশ এনে দেয়। সেই আগের কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম স্বয়ংসম্পূর্ণ মেডিকেল কলেজ। শুধু লেখা-পড়া না, সব জায়গাতে এখন আমার মেডিকেল কলেজের দৃপ্ত পদচারণা। নতুন মেডিকেল কলেজ হয়েও প্রতিটি প্রফে প্লেস করা একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কিছুর পেছনে আমাদের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন। বিশেষ করে একজন মানুষের কথা না বললেই নয়-তিনি আমাদের ভাইস-প্রিন্সিপাল অরুপ দত্ত বাপ্পি স্যার। ছোটখাট এই মানুষটার পাহাড়সম ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা এই মেডিকেল কলেজের সুদৃঢ় অবস্থানের একটি কারণ। মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে পেট ব্যথা, আর্থিক সমস্যা থেকে পারিবারিক সমস্যা, বই চুরি থেকে ল্যাপটপ চুরি-সব কিছুতে প্রথম ফোনটা স্যারের কাছে যায়। তিনিও একটা না একটা ব্যবস্থা করে ফেলেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাদের নিয়ে কিভাবে পড়ে থাকেন-আল্লাহই জানেন। দেখতে দেখতে মেডিকেলের পাঁচটি বছর শেষে আমি কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের এক জন ডাক্তার। এত কষ্ট আর ভালবাসার মধ্যে ডাক্তার হয়েছি বলেই হয়ত এই কষ্টের জীবনটাকে ভালবেসে ফেলেছি । গর্বে চিৎকার করে বলি- আমি ডাক্তার,আমি কক্সবাজার মেডিকেলের ডাক্তার। একটা কথা খুব মনে পড়ে, কক্সবাজার আসার আগে খুব কেঁদেছিলাম। বড় ভাই বলল-কিরে বাসার জন্য কাঁদছিস? আমি মাথা নাড়লাম। তখন ভাইয়া বলল, দেখবি যেদিন কক্সবাজার ছেড়ে চলে আসবি, সেদিন কক্সবাজারের জন্য কাঁদবি। আমার এখনই কান্না পায়, বর্ণিল মেডিকেল জীবনটা শেষ হয়ে গেল-এই ভেবে।
(প্ল্যাটফর্মিয়ানদের পক্ষ থেকে একই সাথে কক্সবাজার, নোয়াখালী এবং পাবনা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের সকল নবীন চিকিৎসককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি- সম্পাদক)

আমার মেডিগল্প

ডাঃ এএসএম সাব্বির, ব্যাচ-৪৬, ময়মনসিংহ এমসি

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু হয় আমার মেডিকেলের পথ চলা। প্রথম বর্ষের উত্তাল দিনগুলো! 'মেডিকেল স্টুডেন্ট' এই পরিচয় দেয়ার জন্য মুখিয়ে থাকি! মেয়েরাতো তখন রীতিমতো দোকান, মার্কেট, বাস, ট্রেন এমন কোন জায়গা নেই যে এপ্রোন পরে না। ছেলে হয়ে আমরা আর এই কাজ করতে পারি না। তবে ডাক্তারের কাছে গেলে বলি "স্যার থোরাক্সে ব্যথা,লোয়ার লিম্বে ল্যাটারালি ব্যথা"। একবার এক বন্ধু ক্রিকেট খেলার সময় বোলার কে বলছিল-"ঐ স্ট্যাম্পের মিডিয়ালি বল কর! এই হল ফার্স্ট ইয়ার, ড্যাম কেয়ার!
কিন্তু আমার এই ঘটনা এই সব মেডিকেলীয় বুলি শেখার আগে।। ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের পর সাতদিন ক্লাস হয়েই বন্ধ। ময়মনসিংহ মেডিকেলের স্পেশাল ছুটি "ব্রেথিং লিভ"। বিকেল পাঁচটায় ট্রেন। সবাই যার যার মত দ্রুত বাড়ি যাচ্ছে। আমি আর আমার রুমমেট স্বাধীন বের হওয়ার সময় ভাবলাম-' মেডিকেল স্টুডেন্ট, একটু ভাব না দেখালে ক্যামন হয়। মেয়েদের মত এপ্রোন তো আর পরা যায় না! তাই সিদ্ধান্ত নিলাম দুই চারটে বোনস নিয়ে যাই। যেই ভাবা সেই কাজ! সাথে নিলাম ভার্টিব্রা, আর রিবস্।
ট্রেন সাড়ে পাচঁটায়। কিন্তু চলে গেলাম একঘন্টা আগে! উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি স্টেশনের একমাথা থেকে আরেক মাথা! কিন্তু খুবই বিমর্ষ! ব্যথিত! এর মাঝে ট্রেন চলে এলে বুকে একরাশ কষ্ট নিয়ে ট্রেনে উঠলাম। কিন্তু একি! এতো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! দুজন এপ্রোন পরিহিতা এসে বসলেন ঠিক আমাদের বিপরীতে। আমি আর স্বাধীনও নড়ে চড়ে বসলাম!
দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালানোর জন্য এবার আমাদের আলোচনা :
-'গাইটন বইটা পুরাই ভুয়া,গ্যানন ছাড়া আমার কমফোর্ট হয় না!-বিডি কোন বই হল? গ্রে মোটামুটি চলে'! এসব শুনে দেখি তারা মিটিমিটি হাসে! আমরাও বেশ সাফল্য অনুভব করছি! ভাবকে এবার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নেয়ার জন্য বোনস বের করলাম! আলোচনায় এবার অনন্য গতি!
-'বুঝলি এইটা টিপিক্যাল ভার্টিব্রা,এইটার আরেক নাম আদর্শ কশেরুকা'! আমাদের এহেন আলোচনা শুনে রীতিমতো অট্টহাসি শুরু করলেন তারা। আমারা কিছুটা বেকুব বনে গেলেও চালিয়ে গেলাম। তারপর আমাদের এহেন আলোচনা থামিয়ে দিয়ে একজন বলে উঠলেন
-তোমরা কি ফার্স্ট ইয়ার?
-(কিছুটা বিরক্ত!) হুম!
-দেখি ভার্টিব্রাটা দাও, তোমাদের ধরা উল্টো হয়েছে!
(এই বলে পুরোটা ডেমো দিল)
-(মনে মনে বিরক্ত! পাকনা আইছে)
ছোঁ মেরে ভার্টিব্রা নিয়ে বললাম
-তোমরা কোন ইয়ার?
-আমি তোমাদের গাইনির রেজিস্ট্রার !!

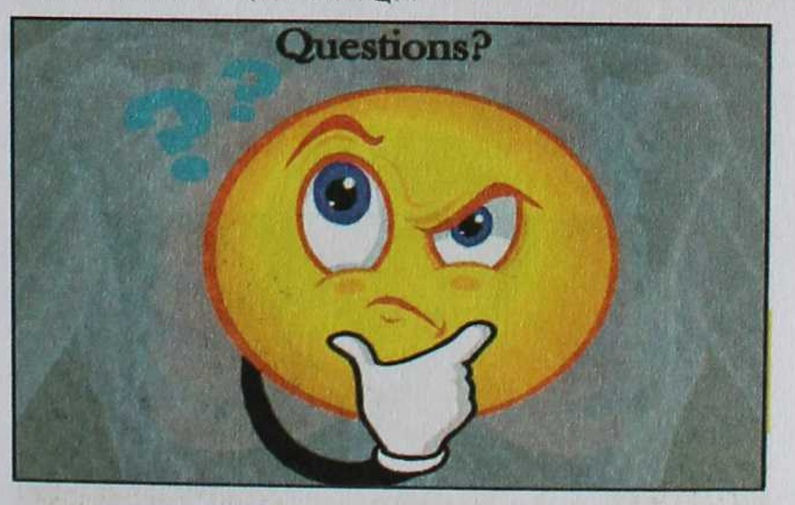

মেডিকেলীয় ফ্যাক্টস

ডাঃ ইসমত আলো, ব্যাচ-১২, জেড এইচ শিকদার ওমেন্স এমসি
সহকারী সার্জন, সিরাজদীখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মুন্সিগঞ্জ

আইটেমঃ "টেবিলের এপারে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,ওপারের টিচারের চেয়ারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস"। "আমি যদি কখনো টিচার হই তাহলে,আমার স্টুডেন্টদের আইটেম এমনিতেই ক্লিয়ার করে দিব। এটি প্রতিটি স্টুডেন্টের মনের সুপ্ত ইচ্ছা। আইটেম হলো,টিচার আর স্টুডেন্টদের মধ্যকার ১০নাম্বারের এক মেডিকেলীয় যুদ্ধ, যা অনুষ্ঠিত হয় tutorial ক্লাসে,এই যুদ্ধের সময়কাল আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের মত স্টুডেন্টের কাছে মনে হয় হাজার ঘন্টা ধরে আইটেম দিচ্ছি,আর টিচার ভাবে,কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না । লাইফের প্রথম আইটেম প্রতিটা মেডিকেল স্টুডেন্টের জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা,আইটেমের মধ্য দিয়েই মেডিকেলের স্টুডেন্ট পরিচিত হয় pending আর demo এর সাথে । আইটেম নিয়ে নানা মতবাদঃ আঁতেলদের মতে-তোরা যে যা বলিস ভাই,আইটেম দেয়া আমার চাই । ফাঁকিবাজদের মতে-আইটেম যে দেয় আর আইটেম যে নেয় ,উভয়েই সমান অপরাধী । মিডিয়ামদের মতে-পড়া হোক যথা তথা আইটেম হোক ভাল ।
পেন্ডিং ঃ দুঃখ,হতাশা অপর নাম Pending। মেডিকেলে ভর্তির পর প্রথম হতাশার নাম pending, টিচারদের হাতিয়ার আর স্টুডেন্টদের মস্তিস্কের বাড়তি প্রেসারের নাম pending, pending যার নাই কোন ending। pending নিয়ে নানা মতবাদঃ টিচারদের মতে "পুনরায় সুযোগ",স্টুডেন্টদের মতে, "টর্চারের নতুন রূপ",
আঁতেলদের মতে, "ফাঁকিবাজদের শাস্তি",বাবা-মায়ের মতে, "একবার না পারিলে দেখ শতবার"।
pending নানা প্রকার হয়ে থাকে, যেমনঃ
১) জেনুয়িন পেনডিং : কিছু না পারার কারণে যে পেন্ডিং ।
২) সারপ্রাইজ পেন্ডিংঃ সব পড়ে যাওয়ার পর, যেটা না পড়ে যায়, সেটা ধরার কারণে যে পেন্ডিং ।
৩) এক্সিডেন্টাল পেন্ডিংঃ হঠাৎ জানতে পারে যে আইটেম,আর পড়াও সম্ভব না,সেকারণে যে পেন্ডিং ।
৪) কনফার্ম পেন্ডিং : বিশেষ কারণে টিচার যাদের দেখতে পারেন না,তাদের যে পেন্ডিং হয়।
৫) বোনাস পেন্ডিংঃ টিচার যার প্রতি বিরক্ত,তার সাথে আইটেম দিতে গেলে যে পেন্ডিং।
৬) পেন্ডিং এর পেন্ডিংঃ একই আইটেমের একাধিক বার যে পেন্ডিং ।
সব স্টুডেন্টদের একটাই দাবি, পেন্ডিং মুক্ত আইটেম চাই ।

মুখস্ত বিদ্যা

ডাঃ তাহসিনা আফরিন, ব্যাচ-৪৬, চট্টগ্রাম এমসি
৩৩তম বিসিএস ফরেন সার্ভিস ক্যাডার

ছোটবেলায় ক খ গ ঘ মুখস্ত করেছিলেন, বুঝে পড়েন নাই। একটু বড় হয়ে কিছু ফুল-ফল-গাছ-অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইংরেজি বানান মুখস্ত করেছিলেন,বুঝে পড়েন নাই। তারপর শুরু হল নামতা মুখস্ত, ওইটুক বয়সে নামতা বুঝে পড়ার মতো কাবিল কেউ ছিল না। আরেকটু বড় হয়েই বুঝেছিলেন,ক এর পর খ হবেই,খ এর পর। এরা ব্যাঞ্জন বর্ণ। এদের কেউ অল্প প্রাণ,কেউ মহা প্রাণ । বুঝেছিলেন সব বানান মুখস্ত করা লাগবে না,সিলেবাল ভাগ করে নিলে বানান সহজ। দুই চারটা ব্যতিক্রম বানান আছে, সেটা দেখে নিলেন শুধু। বুঝেছিলেন, নামতা ব্যাপারটা বেশ মজার। নিজে নিজেও নামতা বানানো শিখে গিয়েছিলেন। ৯ এর ঘরের পর আর মুখস্ত করতে হয়নি। মুখস্ত আমাদের করতেই হয়। কারো নাম, ফোন নাম্বার, বাসার ঠিকানা। সারাদিন আমরা কত মুখস্ত বিদ্যা ব্যবহার করি। নামাজের সুরা বুঝে পড়ার কারবার নাই, আপনি আরবি ভাষায় নামাজ পরলে সুরা মুখস্ত করতে হবে। কবিতা, গান, কোটেসান-কত কিছুই মুখস্ত থাকে আমাদের। মুখস্ত মানেই ভুয়া,সেটা ভাবলে আপনি এই দ্রুততার পৃথিবীতে পিছনে পরে থাকবেন। এর পরে কি হবে সেটা বুঝে বের করতে করতে ট্রেন ছুটে যাবে। পাঁচ সাতে কত হয় মুখস্ত না থাকলে পরীক্ষার বেল বেজে যাবে, অঙ্ক শেষ হবে না। কিছু বানান মুখস্ত না থাকলে,বার বার ডিকশানারি দেখেব ন? না এভাবে হবে না। আইটেমে সারাদিন আপনার বিদ্যা যাচাইয়ের সুযোগ-সময় কোনটাই নাই স্যারের। উত্তর দেয়া লাগবে বাতাসের গতিতে। রিটেন পরীক্ষায় সময় সীমিত, আপনার উর্বর মস্তিস্ক সেখানে সিন্থেসিস করতে অবকাশ পাবে না। লিখতে হবে দ্রুত যেন, মাথায় বসানো আছে বইয়ের পুরো পাতাটা। তাহলে উপায়? প্রকৃত শিক্ষাতো মুখস্তে আসে না! হয় না! আপনি বুঝে না পড়লে পড়তে পারেন না। ঠিক আছে, বুঝে পড়েন। তাহলে সময় দেন আরেকটু বেশি। মেইন বইটা পড়েই উঠে যাবেন না। নিজের একটা নোট খাতা বানান, সেখানে সব পয়েন্টগুলো লেখা থাক। ভ্যালুগুলো। গড়গড় করে পড়া যায় এমন ভাবে লিখেন। আইটেমে পড়ে যান, রিটেনে দেখে যান, ভাইভাতে মুখস্ত করে যান।
এতো সময় নাই নিজের নোট করার? তাহলে মান ইজ্জতের মাথা খেয়ে টেক্সট বইয়ের সাথে একটা চটি বই কিনে নেন না। শুধু আইটেমের আগের দিন মুখস্ত করার জন্য। পাঁচটাই এটিওলজি,স্যার পাঁচটাই জানতে চান। আপনি সিন্থেসিস করতে করতে বেল বেজে যায়,আগের রাতে একটু 'মুখস্ত' করেন, পাঁচটার পাঁচটাই লিখে দিয়ে আসেন। ক্ষতি কি? মুখস্ত করেছেন বলে জাত গেলো জাত গেলো বলবেন কেন?
মেডিকেলে জ্ঞান লাভ আর পাস করাকে সাংঘর্ষিক ভাববেন না। আপনাকে জ্ঞান-পাস দুইটাই অর্জন করতে হবে। হোস্টেলে একা মেইন বই নিয়ে পরে থাকবেন ৬ মাস,আর মুখস্তবিদ বন্ধু স্টেথো নিয়া ডিউটি করতে গেলে,লুসার কে? শুধুই কি সেই মুখস্তবিদ বন্ধু,আপনি একটুও না? ওকে শিখান মেইন বইয়ের মর্ম,ওর থেকে শেখেন মুখস্তের মর্ম! হয়ে যান সব রকম গুণের কম্বো । বিএফসি, কেএফসিতে কিসের ডিমান্ড বেশি? কম্বো মিল এর! এক প্লেটে সব কিছু, এফরডেবল অ্যান্ড সাফিসিয়েন্ট। মুখস্তবিদ্যা আপনার সৃজনশীলতা নষ্ট করে যদি সেটা একা হয়। তাকে জুড়ে দিন বুঝে পড়ার সাথে, আপনাকে কেউ আটকাতে পারবেন না।

(প্ল্যাটফর্ম মুখস্ত বিদ্যাকে না বলার পক্ষপাতি এবং প্রব্লেমবেজড লার্নিং ও প্রায়োগিক শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তারপরও বর্তমান সিস্টেম অনুযায়ী অধিকাংশ শিক্ষার্থী সাফল্যের জন্য আলোচ্য পদ্ধতি কার্যকর বিধায় লেখাটি প্রকাশিত হলো।)

লেকচার ক্লাসের কমন দৃশ্য

ডাঃ আব্দুল্লাহ আল ইলিয়াস (আশিক), ব্যাচ-৪৬, ময়মনসিংহ এমসি

সামনের বেঞ্চের স্টুডেন্টরা স্যারের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আর জ্বি স্যার জ্বি স্যার করতে করতে এমনভাবে মাথা ঝাঁকাবে/নাড়াবে যেন স্যারের চেয়েও বেশি বোঝা শেষ। যেন আর একটু হলেই স্যারকে বলবে, 'স্যার পরের টপিকে যান'। চিন্তাই লাগে কখন বুঝি ঘাড়টা মটকে যায়। আঁতেল হলেও হাজারো হোক ফ্রেন্ড/ব্যাচমেটতো। কেউ ফেসবুক/চ্যাটিং/নেট-এ ব্যস্ত। কেউ কানে হেড ফোন লাগিয়ে গান শোনে। কেউ গল্পের বই/উপন্যাস পড়ে। কেউ বসে বসে হাই-বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমায়। তবে সাবধানতা স্বরূপ মাথার সামনে ব্যাগটা রেখে দেয় যেন স্যার বুঝতে না পারেন। কেউ একদম পেছনের বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে গান শোনে/ঘুমায়। স্লাইড প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে লেকচারগুলোকে কেউ কেউ আঁতেলদেরকে ডিস্টার্ব করার জন্য স্লাইডের লেখা শেষ না হওয়ার আগে আগেই বলে, 'স্যার Next (Next One)'। কেউবা পাশের জনের সাথে গল্প করে। একদম শেষের লেকচারে পেছন থেকে অনেকে একসাথে বলবে, 'স্যার-ছেড়ে দেন নইলে দেরি হলে গিয়ে খাবার পাবো না/আজ ফিস্ট আছে'। কেউ পেছনে বসে ফোনে কথা বলে। কেউ একদম পেছনের বেঞ্চে শুয়ে ঘুমায় আর আগেই কাউকে বলে রাখে, 'দোস্ত, Attendance দেওয়ার সময় একটু ডাক দিস'। বেশিরভাগ স্টুডেন্টই আইটেমের পড়া পড়ে। সবকিছু মিলিয়ে লেকচার ক্লাস বেশ মজার রূপ ধারণ করে। শুধুমাত্র স্যারের লেকচার ছাড়া।

নেফ্রাইটিক সিন্ড্রোম

মোঃ মনিরুজ্জামান, ব্যাচ-৫, চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল এমসি

৫ বছরের বাচ্চার
মুখ ফুলে puffy
scanty micturation এ
colour টা smokey.

প্রস্রাবে লাল লাল
red cell cast
হতে পারে infection,
হতে পারে sore throat.
uremia থাকে তার
থাকে hypertension
fever থাকে মাঝে মাঝে
নাই বা করি mention.

বাচ্চাদের এই রোগ
not so uncommon
medical term এ তা
Nephritic Syndrome

সেলফ কনফিডেন্স

ফাতিমা ফারিহা আনিকা, ব্যাচ-৭, এনাম এমসি, সাভার

যখন খুব ছোট্ট ছিলাম, খুব সম্ভবত কে.জিতে পড়ি কেবল তখন বাবা আমাকে সাইকেল চালানো শিখালো! এরপর থেকে আমার ইন্টার পর্যন্ত আমি বেশ তুখোড় সাইকেল চালক ছিলাম! বিকেল থেকে মাগরিব পর্যন্ত সাইকেল আমার এক মাত্র সঙ্গী ছিলো! আমি বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে মেইন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত সাইকেল চালিয়েছি!

এরপর ছেড়ে দেই সাইকেল চালানো! তিনবছর পর একদিন বন্ধুর সাইকেল দেখে খুব ইচ্ছে করে সাইকেল চালাতে! কিন্তু সাহস পাই না। আত্মবিশ্বাস নেই। বলি যে আমি পারি না সাইকেল চালাতে! আমার বন্ধু অবাক হয়ে বলে "তুই বছরের পর বছর সাইকেল চালায় আজকে বলতেসিস পারবি না!"আমি খুব ভীত ! আমি পারবো না বলে সরে গেলাম!ও আমাকে জোর করে ধরে আনলো! বলল "তুই উঠ , আমি ধরছি! "আমি ওকে সাইকেল ধরে রাখতে বললাম, আর ওর উপর ভর করে আমি সাইকেল এ উঠে বসলাম! প্রথমে পড়ে যাচ্ছিলাম, এরপর প্যাডেলে পা যেই দিলাম আবার সাহস ফিরে এলো। এবং আমি খুব খুশী মনে সাইকেল চালাতে লাগলাম আর খেয়ালও করলাম না যে আমার বন্ধু অনেক আগেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে! আমি একাই চালাচ্ছি! কিছুক্ষণ পর যখন খেয়াল হলো আমি আবার পড়ে যাচ্ছিলাম। আবার সে দৌড়ে এসে ধরলো! আবার সাহস দিলো। আবার চালালাম। কিছু সময় পরে আমার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। আমি চালাতে পারলাম সাইকেল। হয়তো তিন বছর আগের মত তুখোড় ভাবে না। কিন্তু পারলাম ঠিকই! গল্পটা শুনে খুবই হাসবেন,বলবেন এই গল্পের মানে কি! এখন বলছি কি মানে! আমাদের মেডিকেল জীবনের প্রতিযোগিতায় কেউ মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ে! এটাই স্বাভাবিক! কেউ পিছিয়ে পড়ছে এই কারণেই কেউ সামনে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাচ্ছে! সবাই যদি এক ভাবে চলতো তাহলে কেউ পিছাতো না, কেউ আগাতো না! সবাই কন্সট্যান্ট অবস্থায় থাকতো!যারা এগিয়ে যাচ্ছে তাদের পাশে আমরা সবাই থাকি! তাদের বাহ বাহ দিতে সবাই খুব ব্যস্ত আমরা! আর যারা পিছিয়ে পড়ছে তাদের দিকে আমাদের চোখ পড়েই না!তারা অসহায়, পিছিয়ে পরা মানুষ! তাদের জন্য আমাদের মন্তব্য-'আরে তাদের দিয়ে কিছুই হবে না'!

কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন! সামনে যারা এগিয়ে গেছে তাদের আপনার এটেনশনের বিন্দু মাত্র প্রয়োজন নেই! তারা আপনার বাহ বাহ ছাড়াই জীবনে আরো সাকসেসফুল হতে পারবে! কারণ তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের আত্মবিশ্বাস, সাহস আছে! কিন্তু যারা পিছিয়ে গেলো! তারা হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে! তারা শুধু জানে তারা পারবে না কোন দিন! এই সময় তাদের প্রয়োজন একটা শক্ত হাত। যেই হাত ধরে সে উঠে দাঁড়াবে ! একটা শক্ত কাঁধ যেই কাঁধে সে ভর দিবে! একটা মানুষ যে তাকে বার বার বিশ্বাস দিবে যে সে পারবে! মেডিকেলে বিশেষ করে এম.বি.বি.এস লেভেল এই শক্ত হাত,কাঁধ,মানুষটা হল একজন শিক্ষক। বিশেষ করে একজন লেকচারার! অথচ আমরা ক্লাসের ভালো স্টুডেন্টকে দেখি। যে একটু পিছিয়ে নিজের মনোবল হারিয়ে কাউকে ফেস পর্যন্ত করতে পারে না তাকে গোণায় পর্যন্ত ফেলি না আমরা! কেনো? সে উল্টা সামনে আসলে তাকে অপমান করে, যা তা বলে, তাকে সুযোগ না দিয়ে তাকে আর ঠেলে ফেলে দেই আমরা! এভাবে করে তারা পিছাতেই থাকে। হ্যাঁ ব্যাতিক্রম থাকে তাদের মাঝে কেউ। ঝড় ঠেলে বেরিয়ে আসে ঠিকই! কিন্তু সবাই পারে না! কিন্তু আমরা কি পারি না পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোকে একটু দেখতে? আমার বন্ধুটির মত 'তুই পারবি' বলে টেনে নিয়ে আসতে? জীবনে টাকা-পয়সা, সম্মান সব পাবো আমরা। কিন্তু একজনকে কুয়া থেকে তুলবার মাঝে যেই আনন্দ আছে তা ধারণার বাইরে! আমি এই প্ল্যাটফর্মের সব শিক্ষকদের অনুরোধ করবো প্লিজ আপনার ক্লাসের সব চাইতে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর দিকে একবার তাকান। সে খুব ভীত, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। ভয়ে আপনার সামনেও আসতে পারছে না। ভেঙ্গে পড়েছে! তাকে গড়ে তুলুন। তাকে গালাগাল করে, ভয় বাড়িয়ে তাকে ফেরানো যাবে না। তার হাত শক্ত করে ধরে তাকে টেনে তুলতে হবে! ভালো কে ভালো করবার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই, খারাপ কে যদি ভালো করতে পারেন তবেই আপনি সার্থক! আমার অনুরোধ রাখবেন। আপনার প্রতিটা স্টুডেন্ট আপনার সন্তানের মত। সন্তানকে ফেলে দিয়েন না!

ট্রাভেল গাইড

ডাঃ মারুফুর রহমান অপু, ব্যাচ-৩৫, স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

একটু অন্যরকম গল্প লিখছি,গল্পটা আমার ব্যক্তিগত হলেও আপনাদের অনেকের সাথে মিলে যাবে। মেডিকেল এডমিশনের ফর্ম তুলেছিলাম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে। তখনকার জরাজীর্ণ অবস্থা আর অত দূরে যাওয়ার রাস্তার অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছিল আল্লাহ এই যায়গায় যেন আমার আর না আসতে হয়! কিছুদিন পর দেখা গেল এই মেডিকেলেই আমি লেপ তোষক নিয়ে উঠে পড়েছি! মেডিকেলে পড়ার ইচ্ছাটা আমার পারিবারিক সিদ্ধান্ত,নিজের ইচ্ছা ছিল না। তাই শুরুতে মানিয়ে নিতে পারিনি। কিছুদিন ক্লাসে যাওয়ার পর এক অদ্ভুত রোগে পেয়ে বসল। ক্লাসে যেতাম না সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমাতাম। এভাবে করে মেডিকেলের প্রথম কার্ড থোরাক্স এ বসলাম না এমনকি তারপরে ফিজিওলজির প্রথম কার্ডে ফেল মেরে বসলাম। হতাশা গ্রাস করল। আমাকে তখন উঠতে সাহায্য করেছিল এক বন্ধু (বান্ধবী আসলে,তার একগুঁয়ে চেষ্টায় সুস্থ হতে শুরু করলাম পরবর্তীতে তাকে জীবনসঙ্গীনি করে ফেলেছি!) এরপর হঠাৎ নিজ দায়িত্বে পড়া শুরু করে বায়োকেমিস্ট্রি প্রথম কার্ডে প্লেস করে বসলাম! উদ্যম ফিরে এল। তখন অনেক কিছু ভালো লাগতে শুরু করেছে। হোস্টেলের পাঁচ তলায় বুড়িগঙ্গার পাড়ে ১ম বর্ষের সবাই আমরা থাকি। প্রতি কার্ড পরীক্ষার আগে বিরাট অবস্থা সব রুমে,কেউ শুয়ে কেউ বসে,কেউ চেগিয়ে কেউ বেঁকিয়ে পড়ছে নাক মুখ গুঁজে আর হায় হায় করছে কালকে কি হবে,ফেইল হবে ইত্যাদি। পড়তে পড়তে অস্থির হয়ে

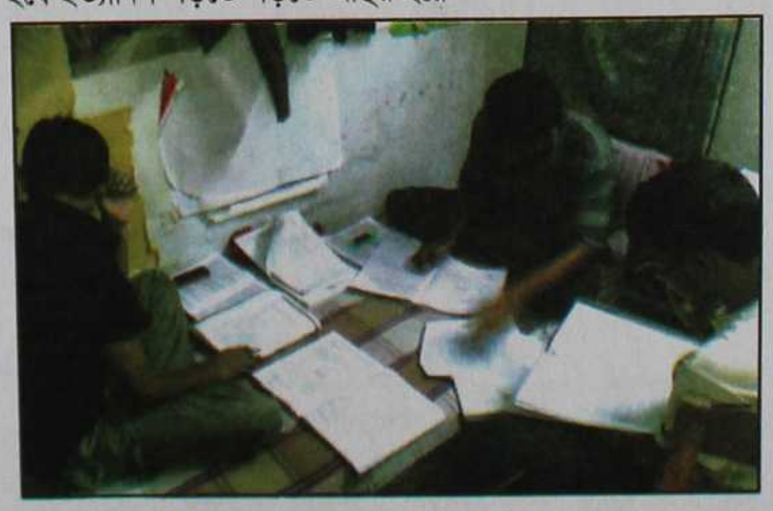

এক দুজন বেরিয়ে এসে সবার রুমে যেয়ে পেইন দেয়া শুরু করেছে। আমিও ভিড়ে গেলাম সেই দলে। তারপর হঠাৎ হঠাৎ একটা করে গ্রুপ বের হওয়া শুরু হল,চল যাই নান্নায় খেয়ে আসি, চল রাজ্জাকে খেয়ে আসি, চল রয়েলে খেয়ে আসি, চল স্টারে খেয়ে আসি! আমিও রাজ্জাকে খেয়ে আসলাম! কিছুদিন পর আরো ভয়াবহ ব্যাপার ঘটল, আগামীকাল এবডোমেন কার্ড, পড়তে পড়তে একদল পাগল হয়ে গেল, সিদ্ধান্ত নিল আজ রাতেই কক্সবাজার যাবে! আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ঠাট্টা করছে, পরে দেখি আসলেই তারা ৮ জন বের হয়ে গেল কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে! ১ম দুই বছর এভাবেই কেটেছে। বড় ভাইদের প্রফের সময় হোস্টেলের করিডোরে রাত ৩টা পর্যন্ত ক্রিকেট খেলেছি, বড় ভাইয়েরা প্যাকেট করে ফেলবে এই হুমকির পরেও! হতাশার অন্ধকার কেটে উপভোগ করা শুরু করলাম নতুন জীবন।

প্রথম প্রফের পর প্রথমবারের মত ঘুরতে বের হলাম মেডিকেলের বন্ধুদের নিয়ে কক্সবাজার। ২১ জনের বড় দল। কি যেন একটা ছুটি চলছিল তখন ৩ দিনের সরকারি ছুটি। আমরা ১ দিনের জন্য কোন মতে একটা হোটেলের ২টা রুম ম্যানেজ করতে পেরেছি। এরপর কি করব জানিনা। সাথে মেয়েরাও আছে। ভাগ্য ভাল ছিল তাই মেয়েদের জন্য সরকারি এক কর্মকর্তার জন্য বরাদ্দ কয়েকটি রুমের একটি ম্যানেজ করে ফেললাম। এক রাত থেকে পরদিন রওনা দিলাম সেন্ট মার্টিন। এদিকে আরেক প্যারা,এক বন্ধু সেন্ট মার্টিন যাবে না, বাপের কড়া নির্দেশ, সে কোনভাবেই অমান্য করতে পারবে না। বাধ্য হয়ে তাকে রেখেই যেতে হল। দুপুর ১২টার পর তাকে বের করে দিল হোটেল থেকে, কারণ সময় শেষ!

সে বেচারা আমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় রাত ১০টা পর্যন্ত একা একা সি বিচে কাটিয়েছে! আমরা সেন্ট মার্টিন ঘুরে এলাম রাত ১০টায়, এরপর আমাদের থাকার যায়গা নাই! তখনো কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ হয়নি, কি বিপদ! কোন মতে কোন হোটেলে একটা রুম ও পাওয়া গেল না। এরপর নানাজনকে ফোন দিয়ে আমরা কক্সবাজারের একটা পাহাড়ে এক স্থানীয় পরিবারের আশ্রয় পেলাম। পরদিন ফিরে এসেছিলাম ঢাকায়!

ঘোরাঘুরিটা খুব উপভোগ করছিলাম, তাই কিছুদিন পর আবার বের হয়ে গেলাম রাঙ্গামাটি। বর্ষা সিজন, এক উপজাতি বন্ধুর মা ব্যাঙ রান্না করে দিলেন, অসাধারণ তৃপ্তি নিয়ে খেলাম! আর রাতে স্থানীয় বাজারে যেয়ে খেলাম শামুক আর চাপিলা মাছ! শুভলং ছিল আমার দেখা প্রথম ঝরনা। এর বিশালত্ব আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তখন।

ঘোরাঘুরিটা নেশার মত পেয়ে বসল। ইচ্ছেমত ক্লাস ফাঁকি মেরে ঘুরতে চলে যেতাম। পরীক্ষার সময় নাক মুখ গুঁজে পড়ে পার পেয়ে যেতাম কিভাবে যেন। হাতে টাকা না থাকলে ঘুরে বেড়াতাম পুরান ঢাকায়, আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা, বুড়িগঙ্গা, হোসেনি দালান, আর নতুন নতুন খাবারের দোকান, তাঁতিবাজারের চাপ, রাত ১১টায় মেহেদীর খিচুড়ি, ভোর ৬টায় স্টার এর খিচুড়ি আর ব্রেন ফ্রাই, রয়েল এর চাইনিজ প্যাকেজ,বিউটির লেবুর সরবত আর কাচ্চি,খুশবুর তেহারী, কেরানিগঞ্জের চালের রুটি মাংস আরো নাম না জানা কত যায়াগা!

ঘোরাঘুরির নেশায় আবার বেরিয়ে পড়লাম শ্রীমঙ্গল। ঈদের পরদিন, প্রচন্ড ঠাণ্ডায় শ্রীমঙ্গলের ঠাণ্ডা উপভোগ করতে যাওয়া। অনেকবারই গিয়েছি। প্রথমবার যাই নন মেডিকেল বন্ধুদের সাথে। পরেরবার গিয়েছিলাম সম্ভবত সেকেন্ড প্রফের ২দিন আগে! পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে তিন বন্ধু মিলে সিলেট এর বাসে উঠে পড়েছিলাম। ভোর ৫টায় বাস নামিয়ে দিল সিলেট। রাস্তার পাশে আগুন পোহালাম তিনজন সকাল ৭টা পর্যন্ত। এরপর শ্রীমঙ্গল এসে ঘুরেছি।

পরের ট্যুরটা ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম জয় করার। রাঙ্গামাটি বান্দরবান খাগড়াছড়ি তিন জেলা টানা ঘুরে ফেলার টার্গেট ছিল কিন্তু রাঙ্গামাটি যেয়ে এক বন্ধু পা মচঁকে ফেলায় আর হল না। আমরা সেন্ট মার্টিন রওনা দিলাম। তখন পুরোপুরি অফ সিজন। কোন জাহাজ নাই সেন্ট মার্টিনগামী। আমরা ট্রলারে রওনা দিলাম। জীবনে সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলাম সেইদিন। ইলিশ মাছের বস্তার উপর বসে ছিলাম ৩ ঘন্টা, খোলা সাগরে ট্রলারের দুলুনী, ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম।

নেশা একবার ধরে গেলে সহজে কাটে না। এরপর কত যায়গায় বেড়িয়েছি হিসাব নেই। এখনো বেড়াচ্ছি। রাঙ্গামাটির পর গিয়েছিলাম সুনামগঞ্জ। অবহেলিত এক ভিনদেশী নারী মুক্তিযোদ্ধা কাকন বিবি, ভিক্ষা করে জীবন কাটাচ্ছেন শুনে তাকে খুঁজে সাহায্য করতে গিয়ে ছিলাম, বাস, নৌকা, ভ্যান, রিকশা, হোন্ডা, আছাড়, সাতাঁর,হাওড়, নদী, পাহাড়, বর্ডার, গণকবর, কত কিছু পেরিয়ে সুনামগঞ্জের কোন এক সীমানায় খুঁজে পেলাম সেই বীর নারীকে। তাঁর মুখেই গল্প শুনলাম। পেপারে কিছু লেখালেখির পর সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব দিয়েছে, থাকার যায়গা দিয়েছে, মাসিক কিছু টাকা পয়সাও দিচ্ছে। তিনি অনেক অসুস্থ তাঁর চিকিৎসা খরচ বাবদ আমরা কিছু সাহায্য দিয়ে এলাম। তিনি নিতে চান নি। শুধু এটাই বলেছেন তিনি সরকারের কাছে নিজের জন্য কিছু চান না,শুধু তার এলাকায় আসা যাওয়ার অনেক কষ্ট মানুষের, রাস্তা যেন ভাল করা হয়, একটা স্কুল করে দেয়া হয়, একটা ছোট হাসপাতাল থাকে এইটুকুই। তার গল্প শুনে কেদেঁছিলাম সেদিন।

হঠাৎ করে কেন জানি পাহাড় আর ঝর্নায় পেয়ে বসল আমাকে। ছুটলাম বান্দরবান। নাফাখুম জায়গাটার কথা তখন ব্লগে পড়ে জানতে পেরেছি। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। পাহাড়ি তীব্র খরস্রোতা সাংঙ্গু বেয়ে ছোট নৌকা নিয়ে ছুটে চলা। চোখের সামনে নৌকা উল্টাতে দেখেছি। পড়ে গেলে পাথরে বাড়ি লেগে নির্ঘাত মৃত্যু। তবু চললাম। তিন্দু, রাজা পাথর পেরিয়ে স্বর্গসম রেমাক্রি। রেমাক্রি যেয়ে হঠাৎ আমার ডায়রিয়া হয়ে গেল,বাকিরা আমাকে ফেলে পরদিন ছয় ঘন্টার হাঁটাপথ পেরিয়ে নাফাখুম জয় করে এল। তবে যেটুকু দেখেছি তখন আমার মনে হয়েছি এই বাংলাদেশ এর চেয়ে সুন্দর জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

অভ্র

নিলয় শর্মা শুভ, ব্যাচ-২১, ফরিদপুর এমসি

স্বপ্ন থাকে কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে। ভর্তি পরীক্ষার খেলায় ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রবেশ করে এনাটমির ফরমালিনের রাজ্যে। এখানে পাঁচ বছর টিকে থাকতে থাকতে স্বপ্নগুলো একসময় ধূসর হয়ে যায়। আমি ভাবতাম মেডিকেলে পড়ে শুধু ডাক্তার হওয়া যায়। কিন্তু মেহদী হাসান খান এই সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আজকে যে অভ্র না থাকলে বাংলা কম্পিউটিং এত উন্নত হত না, সকলের জন্য উন্মুক্ত হত না আমার মাতৃভাষা, শিকল পরে থাকতে হত বাংলা টাইপিংয়ের কঠিন নিয়মে সেই অভ্রের জনক মেহদী হাসান খান। মেডিকেলে মোটা মোটা বইয়ের চাপে কিভাবে যে অভ্রের জন্ম দিতে পেরেছে তা একমাত্র এই মানুষটি জানেন। মেহদী হাসান খান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। অভ্র নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সময়। তিনি সর্ব প্রথম ভিজ্যুয়াল বেসিক প্রোগ্রামিং ভাষা দিয়ে সফটওয়্যারটি তৈরি করেছিলেন।

ইউনিকোড নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ইচ্ছে হলো-সহজে বাংলা লেখার জন্য একটি মুক্ত সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করার। তখন পর্যন্ত বাংলা লেখার অধিকার টাকা দিয়ে কিনতে হত। দরকার ছিল কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন। অভ্রর কাজের জন্য ফার্স্ট প্রফেও প্রথম বার অংশগ্রহন করতে পারেন নি। বাসায় চলে এসেছিল অভ্র নিয়ে কাজ করতে। মেডিকেলের প্রতিটা স্টুডেন্ট জানে মেডিকেল জীবনে প্রথম বারে ফার্স্ট প্রফের অনুভূতি কী! এত কষ্ট করে তৈরি করা এই সফটওয়্যারকে ইচ্ছে করলেই বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা আয় করতে পারতেন; তাছাড়া বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করলেও বাংলা টাইপিং এর অন্যান্য সফটওয়্যারের চেয়ে অভ্রই বেশি চলত কারণ অভ্রের তুলনা শুধু অভ্রই। অথচ তিনি তা সকলের কাছে বিনামূল্যে উন্মুক্ত করেছেন! ২০০৩ সালের ২৬ শে মার্চ "ভাষা হোক উন্মুক্ত" শ্লোগান ধারণ করে আবির্ভূত হয় অভ্র কিবোর্ড সফটওয়্যার। সাথে সফটওয়্যারটির উন্নতির জন্য যুক্ত হন অনেক ডেভলপার! তারপর মেডিকেলের পড়াশুনার পাশাপাশি দীর্ঘ পথ। কাজ করে যেতে হয়, অভ্রর পরবর্তী ভার্সনের জন্য। কিভাবে বাংলা টাইপিংকে আরও ব্যবহার-বান্ধব করা যায়, বিনামূল্যে সকলের কাছে পৌছে দেয়া যায়, সেটা নিয়েই ভাবনা চিন্তা। ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ানো অবস্থা। এই অভ্রর সাথে এখন বাংলা ভাষাভাষী প্রায় সকল মানুষই পরিচিত।

অভ্রর পথচলা সহজ ছিল না। বিনামূল্যে অভ্রর কাজ করার পরও বিভিন্ন সময়ে অভ্রকে পাইরেটেড সফটওয়্যার বলে অভিযুক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত মিথ্যে কপিরাইট লংঘনের দায়ে উকিল নোটিশ যায় মেহদী হাসান খানের কাছে। উকিল নোটিশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দিয়ে আক্রমণের হুমকি উপেক্ষা করে কাজ করে যায় বাংলা টাইপিংকে সহজে সকলের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য। ২০০৩ সালে যখন এরকম একটি সফটওয়্যার ডেভেলপের পরিকল্পনা করছিল, তখন মুঠোফোনে প্রচলিত ক্লোজ সফটওয়্যারের স্বত্ত্বাধিকারীর কাছে লেআউট ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন এবং বলা হয়েছিল, সফটওয়্যারটি বিনামূল্যে যে কেউ ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু টাকা ছাড়া তিনি রাজি হননি। পরে অভ্রে সেই সফটওয়্যার ব্যবহার না করে ইউনিজয় লেআউট ব্যবহার করা হয়। মেহদী যখন থার্ড ইয়ারে পড়ে তখনই অভ্র জয়রথ চারদিকে ছড়িয়ে যায়। তৈরি করেন অমিক্রন ল্যাব নামে একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান। যেখানে মেডিকেলে একজন থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট শুধু ওয়ার্ড আর টার্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে সেখানে এই ছেলেটির তৈরি একটি সফটওয়্যার বাংলা টাইপিংয়ে বিপ্লবের সূচনা করেছে। কপিরাইট লঙ্ঘনের অভিযোগ সমঝোতা হয় ২০১০ সালের ১৬ই জুন। যখন মেহদী হাসান খান ইন্টার্নীতে ব্যস্ত। অভ্রের মাধ্যমে মানুষের ভালবাসা অর্জন করতে পেরেছেন তিনি। যখন তার বিরুদ্ধে পাইরেসির অভিযোগ উঠল, জবাব মেহদী হাসান খানের দেয়ার প্রয়োজন হয় নি। বাংলা কমিনিউটি ব্লগ, ফোরামে, ফেসবুকে শত শত মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। মায়ের ভাষা নিয়ে ব্যবসা করা যায় না! আমাদের অনেকেই অনেক প্যাশন নিয়ে মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাসে আসে। এখানে জ্যান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টায় হয়তবা হারিয়ে যায় সেই লুকোনো ইচ্ছেগুলো। মানব সেবার ব্রতের পাশাপাশি শুধু টিকিয়ে রাখতে হয় সেই অদম্য ইচ্ছেগুলো, সফলতা একদিন আসবেই!

চিকিৎসক আলোকচিত্রী

ইশরাত জাহান মৌরী, ব্যাচ-১৪, ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা

একজন সৃষ্টিশীল চিকিৎসক নাদীয়া ইসলাম নিতুল। ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ থেকে বিডিএস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে মাস্টার্স শেষ করে বর্তমানে পেশাদার ফটোগ্রাফির পাঠ নিচ্ছেন। শখের ফটোগ্রাফিতে অর্জনও কম নয়, নাদিয়া ইসলাম সম্প্রতি 'ফটোফি একাডেমি অব ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফি ও লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন ক্যানভাস' আয়োজিত ছবির গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। মে মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ফটোগ্রাফি ব্লগ 'ওয়ান টু ওয়ান ক্লিকস'-এর সোলফুল পোট্রেট প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। ২০১৩ সালে ফটোফি আয়োজিত ফটোগ্রাফি উৎসব 'সৃষ্টি-সুখের উল্লাস'-এ তাঁর ছবি সম্মানসূচক পুরস্কার অর্জন করেন। এ ছাড়া ২০১২ সালে দ্যা ডেইলি স্টার ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আয়োজিত সেলিব্রেটিং লাইফ প্রদর্শনীতে নির্বাচিত হয় তাঁর ছবি। একই বছর নর্থ সাউথ

ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক ক্লাব আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইন্টার ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায়ও তাঁর ছবি নির্বাচিত হয়েছে। প্ল্যাটফর্মে তাঁর সেরা কয়েকটি ছবি প্রকাশিত হলো। প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য রইল শুভ কামনা।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি

মেডিকেলে ভর্তি হবার পর থেকে আইটেম,কার্ড, টার্মের চাপে নতুন কিছু বা পুরানো শখকে টিকিয়ে রাখাই যেখানে কষ্ট, সেখানে নতুন করে স্বপ্ন বা ক'জন দেখতে পারে বা দেখা স্বপ্নের অপমৃত্যু ক'জন ঠেকাতে পারে। নাচ গান ছবি আঁকা ঘোরাঘুরি বা অন্যকিছু। এতোটুকু করতে গিয়েই যেখানে গলদঘর্ম অবস্থা, সেখানে নতুন কোন শখ বা স্বপ্নতো দুঃস্বপ্ন। কিন্তু মেডিকেলের একমুখী জীবনের বাইরেও আমরা খুঁজে নিয়েছি নতুন কিছু। যা নাচগানের মত অনুষ্ঠান নির্ভরশীল নয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বনিয়ন্ত্রিত। আর তা হল ফটোগ্রাফি। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শখ এবং পেশা দুইভাবেই এটাকে বেছে নিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু দিনশেষে তো আমাদের ডাক্তারই হতে হবে, তাই না! কিন্তু এরই মধ্যে শখের বশে ক্যামেরা হাতে ঘোরাঘুরি আর ছবি তোলার শখ একসাথে মিটে গেলে ক্ষতি কি?

এম৪৬ এর ডাঃ নয়ন কুন্ডু'র হাত ধরে মমেক ক্যাম্পাসের কয়েকজন ছবি তোলার পাগল হিমেল (এম৪৭), মাসুম (এম৪৯) এর একসাথে সংগঠিত হতে পারা, এদের হাত ধরেই ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি এর প্রতিষ্ঠা হয় ২০/১২/২০১২তে, কলেজ থেকে রেজিস্ট্রেশন আর তারপর শুধুই এগিয়ে চলা। এসব ক্ষেত্রে এম৪৬ এর ডাঃ রিফাত, সনেট, সৈকত এবং ডাঃ জাবের এর কথা না বললে কথাগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ডাঃ নয়ন কুণ্ডু'র একান্ত চেষ্টায় আয়োজন করা হয় ট্রেনিং কোর্সের। এই পাগলগুলোর বাইরেও যে আরো পাগল আছে, বোঝা যায় তখনি, সাড়া পাওয়া যায় অভূতপূর্ব। এরই ধারাবাহিকতায় ৪/৫ মার্চ বিএমএ এর প্রোগ্রামের দিন আয়োজন করা হয় প্রথম Exhibition। এতো বেশি সাড়া পাওয়া যাবে আশাও করেননি কেউই। বিশেষ করে স্বাচিপ বিএমএ নেতা নেত্রীবৃন্দ এবং প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমন্ডলী এতো বেশি প্রশংসা করেন, আয়োজকরা আসলেই অনেক বেশি অভিভূত হয়ে যায়। ছবি বিক্রয়ের কোন নিয়ম না থাকলেও স্যারদের চাপে আয়োজক কমিটি বাধ্য হয় মত বদলাতে। যিনি না থাকলে এতো কিছুর কিছুই হত না, তিনি প্রাণপ্রিয় শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ডাঃ এহসানুর রেজা (শোভন) স্যার (সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ)। পরবর্তীতে মমেক ক্যাম্পাসে প্রথমবারের মত পহেলা বৈশাখেও Exhibition এর আয়োজন করা হয়। প্রিন্সিপাল স্যার এত বেশি খুশি হয়েছিলেন যে Exhibition শুরুর আগেই তিনি একবার ছবিগুলো দেখে নেন এবং কয়েকটা ছবির নেওয়ার জন্য আগাম বুকিং দিয়ে রাখেন। দুটো Exhibition এ সফল করার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি আমাদের হিমেল দাদা।

গত ১১/০৬/২০১৪ তারিখে MMCPS এর প্রথম কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। যার প্রেসিডেন্ট হিসাবে সেই হিমেল কুমার বিশ্বাস (এম৪৭) দাদাকেই এবং জিএস হিসেবে মোস্তাফিজুর রহমান (এম৪৮) ভাইকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। প্রদর্শনীর একটি সেরা ছবি-

কবিতা : একদিন ডাক্তার হব

সুলতানা জাহান, ব্যাচ-৩, কক্সবাজার এমসি

কাউকে বলিসনা প্লিজ।
একদিন ক্ষয়ে যাওয়া স্টেথোটা গলায় ঝুলিয়ে,
আমি ডাক্তার হবো ঠিক ঠিক।
তার আগ পর্যন্ত ভাল থাকিস।
গতকালও আমি অনেক হতাশ ছিলাম।
ভেবেছি সাপ্লির বেড়াজালে একটা জীবন,
আটকা পড়ে আছে যেন কয়েক জন্ম ধরে।
তাইতো মরফিনে ডুবে কতিপয় সুখ,
একটু ভালোবাসা খুঁজে বেড়িয়েছি এতকাল।
সবাই মনে মনে বলেছে,
আর কত বাপের খাবিরে ব্যাটা।
খোঁটায় খোঁটায় অতিষ্ঠ,
একদিন আমিও ভালো ছাত্র ছিলাম ।
ক্যানাবিসের ধোঁয়াটে নেশায় টলতে টলতে হুটহাট,
ক্লাসের সবচে সুন্দরী সেই তোকে,
দেখতাম করিডর ধরে সেদিনে র মত হেঁটে বেড়াতে।
মৃদুস্বরে বলি স্টেথো দিয়ে একদিন শুনে যাস প্লিজ,
বুক ভরে শ্বাস নিতে কষ্ট কেমন!
একটা ব্লেড উঁকি দেয় ডায়েরির ভাঁজে,
হাতের শিরাটা দপদপ কাঁপে।
তোকে আর কেউ ছোঁয় যদি,
মরে যাবো সত্যিই! কি হাস্যকর! একদিন বলেছিলাম।
এইতো আর কটা দিন,
নিজেকে বেঁচে থাকব বলে কথা দিয়েছি।
মরফিন ক্যানাবিস কাল থেকে
ছোঁবনা আর ।
তোর কাছে আমার রক্তের দাম নেই তাতে কি !
অচেনা মানুষ,
ওয়ার্ডে ময়লা চাদর গায়ে জড়িয়ে
শুয়ে থাকা
সেই অচেনা মানুষ।
কয় ব্যাগ রক্তের খোঁজ
যাকে মৃত্যুর মুখে দিয়েছে ঠেলে।
তার কাছে এই নেশাখোরের রক্ত
কতটা দামী ছিল তুই জানিস ?
অতএব তোকে ভুলে যাব।
ব্যবসায়ী স্বামীর বুকে শুয়ে
দিনশেষে তুই গৃহিণী হোস।
আমি কাউকে বলবনা,
একদিন তুই ডাক্তার হবি বলেছিলি ।
তুই ও কাউকে বলিসনা প্লিজ,
ক্ষয়ে যাওয়া স্টেথো গলায় ঝুলিয়ে
একদিন ডাক্তার হবো ঠিক ঠিক।
মরণ রোগে আক্রান্ত
কিছু মানুষ বাঁচাব।
ততদিন ভালো থাকিস।

A+ Teacher

সৈয়দা মাসরুরা তানজিম, ব্যাচ-৩২, স্যার সলিমুল্লাহ এমসি,
সহকারী সার্জন, বামনডাঙ্গা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা

তৃতীয় বর্ষ, ডাক্তার ভাব নিয়ে ওয়ার্ডে যাই। তবে ওয়ার্ডেও বৌরিং লেকচারে এই ভাব উড়ে যাওয়ার পথে। ইউনিট ৩ এ প্লেসমেন্ট শুরু হল। ইউনিট প্রধান আসলেন ক্লাস নিতে। সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালাম। স্যার মাটির দিকে এক দৃষ্টিতে কী জানি দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হঠাৎ হাঁটা শুরু। পড়িমরি করে স্যারের পিছু পিছু সবাই দৌড় আর ধাক্কাধাক্কি করে সবার কাছে থাকার চেষ্টা। ফিমেল ওয়ার্ডের কোণার দিকে ছোট রুমটার একটা বেডে থামলেন স্যার। এক বৃদ্ধা বসে আছেন। স্যার সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল আছেন? বৃদ্ধা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন। স্যার তাঁকে শুয়ে পড়তে বললেন। আর বললেন, মা দেখেন এতগুলো ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করে আপনার রোগটা কী বের করতে আসছে। স্যার চেস্টে স্টেথো রেখে একজনকে ডাকলেন অস্কালটেট করতে। সে গিয়ে শুনল আর বিরাট পণ্ডিতের মত মাথা নাড়ল। এরপর স্যার একে একে সবাইকে ডাকলেন শোনার জন্য আর স্যার স্টেথো ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন, এরপর সবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন আসলেই সবাই বুঝেছে কিনা। এরপর স্যার বললেন তোমরা হার্ট সাউন্ডের সাথে যে হুশ হুশ শব্দ শুনতে পেলে এটাই Murmur। এরপর উনি সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক Murmur-এর পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলেন। আবার সবাই স্যারের সাথে দৌড়। মেল ওয়ার্ডের এক রোগীর সামনে থামলেন স্যার। এবার এক রোগীর সাথে কুশল বিনিময় শেষে স্টেথো ধরলেন বুকে। সবাই এক এক করে শুনল আর বলতে হল Murmur টা সিস্টোলিক নাকি ডায়াস্টোলিক। সিস্টোলিক যারা বলল, তারা এক পাশে দাঁড়ালো, ডায়াস্টোলিক যারা বলল, তারা আরেক পাশে দাঁড়ালো। এরপর স্যার বললেন, এরপর আশা করি Murmur কারো ভুল হবে না। বাসায় যখন থাকবা, নিজের হার্ট বিট শুনবা আর ওয়ার্ডে Murmur শুনবা, কোনদিন Murmur মিস হবে না। এভাবে স্যার রঙ্কাই, ক্রেপ্টস, প্লুরাল রাব, থ্রিল, হিভ সবই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একে একে টানা এক মাস ওয়ার্ডে। কেউ এক দিনের জন্যও আর বিরক্ত হই নাই। আমাদের এই স্যারের নাম পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ আজিজুল কাহহার।

Prof Preparation

Dr. Rafid Ahmed, Batch-65, Dhaka Medical College

First prof is the first touch of harsh reality in medical life.Your insight about MBBS is bound to change after this prof. Many students who have previously performed ok in previous cards and terms may face difficulties if he/she fails to recognise this fact and act thereby. Hopefully this article will help you in this regard.

Exam Structure: Anatomy
written: 2 papers MCQ and SAQ General Anatomy, Histology, Embryology, different regions are covered in these two papers. Please consult a question bank for details.

Practical: Histology (Practical Khata, 2 lucky slides)
OSPE: 2 OSPEs one for histology (on the day of Hard part viva, Histology and bones OSPE) one for Regional Anatomy (on the day of Soft part viva)
Viva: 2 boards (one for Hard Part, one for Soft Part)
On the day of Soft part Viva: identification in Cadaver/Dissection, Surface marking, Radiology(X ray)

Suggested plan: study material
Written: Regional Anatomy Datta (for thorax, abdomen, brain, head-neck) + authentic guide+ lecture khata of dept.heads /asso. prof (BD if you were never used to study datta, no time to switch to Datta now unless you want to fail!)
BD/Datta (for sup-ex and inf-ex)
Embryology, Histology (lecture khata should be enough) no harm if you wish to study Langman, Janquera, but if you haven't studied them previously, you should not attempt now.

MCQ: textbooks (Dutta+Langman+Janquera)+ PREVIOUS 5 YEARS MCQ
Viva: Hard part: textbooks (BD+Datta+Langman +Janquera
Soft part :textbooks (Dutta+ Langman +Janquera)
OSPE: we had no OSPE book back in our time, if any is available now, grab it, correct it, use it!!

Physiology
Exam structure: written 2 papers SAQ and MCQ GP and SP are covered in different papers. Please consult a question bank in this regard
Practical: Practical khata and long practical
OSPE: usually 10 stations

VIVA: 2 boards
Study material written and viva: Guyton + authentic guide (Ganong should never be touched before any prof exam)
OSPE: OSPE book, if available.
Long Practical: Prof. Ruhul Amin sir's practical book was the only practical book at our time.
Biochemistry
Exam structure: written 2 papers SAQ and MCQ Topics are covered in different papers. please consult a question bank in this regard.
Practical: Practical khata and long practical.
OSPE: usually 10 stations
VIVA: 2 boards
Study material: written and viva: Satyanarayana/ Lippincott + authentic guide.
Practical and OSPE: OSPE book, if any. We had to follow Prof. Ruhul Amin sir's book as none was available at that time.
Combined Study Plan:
Recommended way: Anatomy is the most important among the three. But having a low yield,i.e. very less is remembered after some time, it should be studied last physiology and biochemistry should be studied first, should be finished atleast 15 days before prof. rest 15 days should be devoted to anatomy.This way you will have fresh anatomy knowledge just before your written exam (provided anatomy is the first exam)
Risky way: As anatomy has the most vast syllabus it should be combatted first. You will get enormous confidence if you finish anatomy 10-15 days before prof. then you may study physiology and biochemistry in a relaxed mood. but the problem is you may forget many importent things before prof, so you may need to review frequently.I always felt comfortable in the second way, as a matter of fact I had no plan in my first prof, heck i had no idea of the strucure even 7 days before my prof.Hopefully you'll not make the same mistakes i made.Best of luck to you all.

ইসিজির অ আ ক খঃ পর্ব এক-লাইট... ক্যামেরা... একশন...

আলিম আল রাজি, ব্যাচ-১৩,নর্থ ইস্ট এমসি, সিলেট

ইসিজি কী? ইসিজি একটি অসাধারণ জিনিস। এর মধ্যে এক ধরণের মাদকতা আছে, থ্রিল আছে, এডভেঞ্চার আছে। ইসিজির পূর্ণ মানে হচ্ছে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফি। কয়েকটা আঁকাবাকা লাইন দেখে 'হৃদয়ের' অবস্থা ধরে ফেলা যাচ্ছে-এর থেকে চমৎকার বস্তু আর কী হতে পারে। বেশি ভণিতা না করে মূল লেখায় চলে যাই।
লাইট ক্যামেরা একশন-
মানব দেহে কোটি কোটি কোষ আছে। একেকটা কোষ হচ্ছে একেকটা ছোটখাটো বিদ্যুৎকেন্দ্র। প্রতিটা কোষে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, সেই বিদ্যুৎ এক কোষ থেকে আরেক কোষে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটা খুব মজার। আমাদের কোষ অর্থাৎ সেলের বাইরের দিকে যে আবরণটা থাকে সেটা হলো সেলমেমব্রেন। এই মেমব্রেনে অনেকগুলো দরজা আছে। একেক দরজা একেক জিনিসের জন্য তৈরি হয়েছে। দরজাগুলোকে বলে চ্যানেল।
সব চ্যানেল নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবো না। আমরা ঘামাবো দুটো চ্যানেল নিয়ে। সোডিয়াম চ্যানেল ও পটাশিয়াম চ্যানেল।
একটা সেল দুটো অবস্থায় থাকতে পারে।
১। রেস্টিং স্টেজ, অর্থাৎ এই স্টেজে সেলটা বিশ্রাম নেবে। খুব উল্লেখযোগ্য তেমন কাজ করবে না।
২। একটিভ স্টেজ। অর্থাৎ এই স্টেজে সেলটা কাজ করবে।
কী কাজ করবে? যে কাজ করার কথা সে কাজ করবে। যেমন, হার্টের সেল কন্ট্রাক্ট করবে, নার্ভ সেল তথ্য আদান প্রদান করবে।
এখন প্রশ্ন হলো, সেল এই কাজটা কীভাবে করে? একটিভ থেকে ইনএকটিভ হয় কীভাবে? আবার ইনএকটিভ থেকেইবা একটিভ হয় কীভাবে? উত্তর হলো বিদ্যুতের মাধ্যমে। পাল্টা প্রশ্ন হলো এই বিদ্যুৎটা কীভাবে উৎপন্ন হয়? উত্তরটাও মজার। বিস্তারিত বলা আছে গাইটন ফিজিওলজিতে। আমরা খুব সংক্ষেপে আরেকবার প্রক্রিয়াটা মনে করার চেষ্টা করবো। একটা সেল যখন রেস্টিং স্টেজে থাকে তখন তার ভেতর থেকে ৩টা পজিটিভ চার্জের সোডিয়াম আয়ন বের হতে থাকে আর দুইটা পজিটিভ চার্জের পটাশিয়াম আয়ন ঢুকতে থাকে। একটু খেয়াল করুন। তিনটা বের হচ্ছে, দুইটা ঢুকছে-তার মানে ভেতরে সবসময় একটা নেগেটিভ চার্জ বজায় থাকছে। এই চার্জটা যেকোনো পরিমাণ হতে পারে। যেমনঃ-৯০ মিলিভোল্ট, -৮০ মিলিভোল্ট,-৫০ মিলিভোল্ট। এই নেগেটিভ চার্জ নিয়ে সেলটা চুপচাপ বিশ্রাম নেয়। এখন এই অলস সেলটার বিশ্রাম ভাঙ্গাতে হলে একে পজিটিভ বানাতে হবে। কীভাবে বানানো যায়? যে সোডিয়াম আয়নগুলো বের হয়ে যাচ্ছে সেগুলোকে যদি আমরা ভেতরে ঢুকিয়ে দেই ঘাড় ধরে তাহলেই তো পজিটিভ হয়ে যাবে সেল। আমাদের বডিও একই কাজ করে।

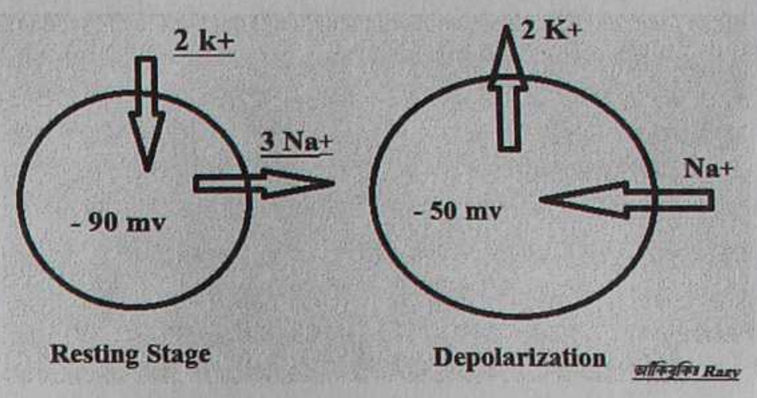

সেল থেকে সোডিয়াম বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ করে সাথে সাথে উলটা প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম ঢুকতে শুরু করে। অর্থাৎ সোডিয়াম চ্যানেলের 'পারমিয়েবিলিটি' বেড়ে যায়। কতোটা? কিছুটা অবিশ্বাস্য শুনালেও সত্য পারমিয়েবিলিটি বাড়ে যায় ৫০ থেকে ৫০০০ গুণ।
অন্যদিকে যে দুটো পটাশিয়াম আয়ন ঢুকছিলো সেগুলো বের হতে থাকে। এখন সেলের ভেতরে প্রচুর পজিটিভ চার্জ যুক্ত সোডিয়াম ঢুকে যাওয়ায় সেলের ভেতরের নেগেটিভিটি কমে যায়। উদাহারণস্বরূপ-যে সেলের চার্জ আগে ছিলো -৯০ মিলিভোল্ট সেটা দেখা যায় হয়ে গেছে -৫০ মিলিভোল্ট। এটাকে বলে ডিপোলারাইজেশন। একট সহজ ছবির মাধ্যমে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করা যাক-এই যে কারেন্ট বদল হওয়ার প্রক্রিয়া,এই প্রক্রিয়াটাই মূলত সেলটাকে একটিভ করে দেয়। এই সেল তারপর তার আশেপাশের সেলকে কারেন্ট দেয় তারপর একসাথে নিজেদের কাজ করে। হার্টের সেল হলে কন্ট্রাক্ট করে, প্যানক্রিয়াসের সেল হলে ইনসুলিন রিলিজ করে। (ব্যাপারটা অনেকটা এরকম। একই কারেন্ট টিউবলাইটে গেলে আলো দিচ্ছে, ফ্যানে গেলে বাতাস দিচ্ছে।)
আমরা ইসিজিতে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে, এই কারেন্টটা ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে কিনা, ঠিকমতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে কিনা,আশেপাশের সেলকে কারেন্ট দিতে পারছে কিনা, কারেন্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা,কম হয়ে যাচ্ছে কিনা, কারেন্ট উলটাপালটা ভাবে উৎপন্ন হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। (চলবে)

razy17@gmail.com

ক্রনিক চটি সিন্ড্রোম

মোঃ নাহিদুজ্জামান তালুকদার, ব্যাচ-৪০, রংপুর এমসি

মেডিকেলের একজন সফল,মেধাবী নিয়মিত ছাত্র হিসেবে মেডিকেলীয় গাইড বইসমূহ যা চটি নামে অধিক সমাদৃত সেই সব বইয়ের একজন একনিষ্ঠ পাঠক আমি। কিছুদিন হল কলেজে ক্লাস এবং বাসায় এসে খাওয়া ঘুম আর কাইজ্জা-ক্যাচাল বাদ দিয়ে অফুরন্ত সময় হাতে থাকার কারণে অলস সময় পার করছিলাম। Then a Sudden Peep on my mysterious mind ! মনে হল এই সময়টুকুতে একটু পড়াশোনা করা যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। শুরু হয়ে গেল ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে মূল বই ছাড়া অন্য কোন বইয়ে হাত পর্যন্ত দিব না। অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে শুরু করলাম "Baily & Love's SHORT PRACTICE of SURGERY" বইখানির "Musculo-skeletal system" চ্যাপ্টারটি। বর্তমানে অর্থোপেডিক্স ওয়ার্ড চলার কারণে এই চ্যাপ্টারটির অগ্রাধিকার।
আসল ঘটনায় আসি। বইটি পড়তে গিয়ে বারবার কনফিউজড হয়ে যাচ্ছিলাম আচ্ছা সব ঠিকঠাক আছে তো? যতই পড়ি কেমন কেমন জানি লাগে! মনে হয় বইয়ের কোথাও না কোথাও, কোন না কোন এক বিষয়ের কিছু না কিছু একটা গড়মিল আছে। কনফিউশন ক্লিয়ার হবার জন্য "Macleod"টা দেখা শুরু করলাম। নাহ! তাও মন শান্তি হয়না। কেমন কেমন জানি লাগে! তাই তৎক্ষণাৎ সামনে থাকা মহান চিকিৎসক Selim Reza রচিত গাইড বইখানি খুলে মিলিয়ে নিয়ে নিশ্চিত হলাম,আসলে "Baily and Love's এবং "Macleod" এ দেয়া তথ্য নির্ভুল এবং সঠিক।
ঠিক তারপর, পুরা তব্দা খেয়ে গেলাম। এইটা কি হল? আমি গাইড বই দেখে মূল বই মিলিয়ে নিলাম! অথচ স্যারেরা সব সময় বলে গাইড থেকে পড়লেও যেন মূল বই থেকে মিলিয়ে নেই। ইস চটি পড়তে পড়তে এমন অবস্থা যে মূল বইকেও আর বিশ্বাস হয়না!

ইন্টার্নের দিনলিপি-১

ডাঃ ইমরান কায়েস, ব্যাচ-৩২, স্যার সলিমুল্লাহ্ এমসি,
সহকারী সার্জন, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল

ইন্টার্নের প্রথম দিকের দিনগুলো কী আনন্দময়ই না ছিলো। পড়া নাই। স্যারদের চোখ রাঙ্গানি নাই। ফড়িং এর ডানার স্বাধীনতা কেবল। সত্যিকার ডাক্তারের মতন গম্ভীর মুখ করে হেঁটে বেড়াই। ডিউটি না থাকলেও ওয়ার্ড এ যেয়ে বসে থাকি। যার সাথে পাঁচ বছরেও কথা হয় নাই তার সাথেও ঝগড়া হয়, হইহুল্লা হয়। প্রাপ্তির আনন্দে পরিপূর্ণ জীবন। মাশুক আর আমার ডিউটি ঘুরে ফিরে একসাথে পড়ে। এক সাথে নাইটে নির্ঘুম প্যাঁচার সতর্কতায় আমরা রাত জাগি। মেডিসিন ইউনিট টু'র জানালার পাশ দিয়ে জং ধরা চাকার চিৎকারে রাত ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে আসে পুরনো স্ট্রেচার। আমরা সতর্ক হই, টিভির ভলিউম কমাই, ওয়ার্ডে এসে বসি। তিনটা-চারটার দিকে ভিড় কমে আসে। তীব্র শীতের রাতে রঙজ্বলা সরকারি কম্বল গায়ে শুয়ে থাকি দেয়াল ঘেঁষা স্টেইনলেস স্টিলের নড়বড়ে বেডে। ম্লান হয়ে আসে ক্লান্তি। আহ কি মধুর অবসর! ঘুম আসেনা। ওয়ার্ডে কারো নাক ডাকার শব্দ চাপানো দরজার পুরনো মেহগনি কাঠ এফোড়ওফোঁড় করে কানে এসে বিঁধে। বিরক্তিতে, ক্ষোভে খোঁজ নিতে উঠি। বারান্দার ৫০ ওয়াটের চুইয়ে আসা ঘোলা আলোয় ওয়ার্ড তখন মায়ানগর। নয় নম্বর বিছানার চাচা খাটের স্ট্যান্ডে পিঠ লাগিয়ে বসে আছেন একখন্ড জমাট অন্ধকার হয়ে। শ্বাস কষ্টের তীব্র গোঙ্গানির শব্দ ভেসে আসে।

নেবুলাইজার পায় নাই?

অক্সিজেন?

রাতের ওষুধ?

কাছে যাই।

কি চাচা? শ্বাস কষ্ট?

চাচার লম্বাটে সফেদ মুখে ডাক্তারের ঘুম ভাঙ্গানোর এক টুকরো লজ্জার হাসি। 'গ্যাস পান নাই'? চাচা মাথা নাড়েন উপরে নীচে। তবু নেবুলাইজার নিয়ে আসি। মোলায়েম যান্ত্রিক গোঙ্গানি আর স্টিমের মৃদু সুবাসে ওয়ার্ড ম ম করে। প্রতিবেশী রোগীরা পাশ বদলায়, ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে। দূরে কোন কোন উৎসুক চোখ তাকায়,অন্ধকারে ঠিক ঠাওর না করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। চাচার শ্বাস কষ্ট যায় না। গোঙ্গানির শব্দে আবার চাপা পরে সব। ফাইলপত্র ঘাঁটি চাচার। ব্রঙ্কোজেনিক কারসিনোমা। ওষুধপত্রে আর ঠিক হবার না। শ্বাস কষ্টের এই গোঙ্গানি থামবে না কোনদিন। রাত আর ভোরের এই সন্ধিক্ষণে শ্বাস নিতে হঠাৎ তীব্র অপরাধবোধ হয়। চাচার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঝাপসা হয়ে আসে চোখ । মনে হয় পৃথিবীর এই দীর্ঘ বায়ুমণ্ডল ভেঙ্গেচুড়ে দিয়ে আসি । মাত্র দু মুঠো বাতাস মিটফোর্ড এর এই নড়বড়া ৯ নম্বর সিটে রাত জেগে বসে থাকা লোকটার ফুসফুসে গেলে কি এমন ক্ষতি হত ? কার ভান্ডারে টান পড়ত ? হে ঈশ্বর !! মাঝে মাঝেই রাত বিরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে মনে হয় কেউ একজন জীবনের সমস্ত আয়োজন উপেক্ষা করে কেবল মাত্র এক মুঠো বাতাসের তীব্র আকাঙ্খায় কোথাও রাত জেগে বসে আছে। আর কিছু করতে না পারার ভয়ঙ্কর অসহায়ত্ব নিয়ে কোন একজন কেবল ঝাপসা চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে ।

ইন্টার্নের দিনলিপি-২

ডা. ফৌজিয়া খানম,ব্যাচ-৩৯, ময়মনসিংহ এমসি

হতভাগ্য মানবসেবক আমার পেশাগত জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় ইন্টার্নের এক বছর। কেউ যেন মনে না করেন এ সময় আমি খুব আরামে ছিলাম। এই এক বছরে আমার ৫ কেজি ওজন কমেছিল,ইন্টার্ন শেষ করে যখন বাসায় ফিরেছি মানুষজন আমার চেহারা দেখে আঁতকে উঠত,মনে হত আমি ১০ বছর ঘুমাই না। এই এক বছর দিনে ১৫/১৬ ঘণ্টা দৌড়েছি। গাইনিতে সারারাত কাজ করে সকালেও রয়ে গেছি ডাক্তার কম বলে যদিও নিয়মমতে আমার ঐদিন ছুটি। আমি আর রিমি মেডিসিন ওয়ার্ডে সকাল ৮ টা থেকে টানা রাত ১০ টা পর্যন্ত থাকতাম (এটাও দায়িত্বের বাইরে বাড়তি) বলে দিলীপ স্যার আমাদের দুপুরে খাওয়াতেন, আমি স্টোর কিপারের সাথে তর্ক করে রোগীর জন্য বরাদ্দ ওষুধও কেড়ে আনতাম। একটা ৫ মাসের প্রেগন্যান্ট মেয়ে এত কাজ করতে পারে পলিনকে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না, তানহাকে দেখতাম এডমিশনের দিন ডিউটি টাইমের আগে গিয়ে ওয়ার্ডে বসে থাকত যদি বেশি রোগী আগে চলে আসে, নাইট ডাক্তার একা সামলাতে না পারে, সিনথিয়া সারারাত ওটিতে একটানা ঠাঁয় দাড়িয়ে পরের দিন ১২ টা পর্যন্ত ফলোআপ দিতে থাকত, কাজু সার্জারিতে নিজের প্রেশারের পরও ড্রেসিং এর জিনিসপত্র যোগাড় করে মেডিসিনে আমার এক রোগীকে প্রতিদিন এসে ড্রেসিং করে দিয়ে যেত কারণ রোগীর সামান্য ড্রেসিং এর জিনিস কেনারও সামর্থ্য নেই, মেডিসিন থেকে আবার সার্জারিতে ভর্তি হতে হলে দেরি হয়ে যাবে, আমি, রিমি, নিম্মি ওটিতে কাজের ফাঁকেও তক্কে তক্কে থাকতাম রোগীদের বেঁচে যাওয়া জিনিসগুলো ওয়ার্ড বয়দের হাতে যেন না পড়ে যাতে রোগীরা ফেরত দিয়ে বদলে ওষুধ আনতে পারে, জাভেদ ভাইয়াকে দেখতাম দুদিন পর পর পকেট ফাঁকা করে রোগীকে টাকা দিয়ে দিতে, আলমগির বসে থাকার এক মুহূর্ত সুযোগ পেলেই বসে বসে ইমার্জেন্সি ওষুধের স্লিপ লিখত যাতে পরের রোগী আসলে এক মুহূর্ত দেরিও না হয়,

ছবিটি রানা প্লাজা ট্রাজেডির সময়ে এনাম মেডিকেল কলেজের ওটিতে। সামনের আধো ঘুমন্ত ব্যাক্তিটি এনাম মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টের এসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ আসাদুজ্জামান রিপন এবং পিছনে ডিপার্টমেন্টের আরো কিছু ডাক্তারের। ছবিঃ কামারুদ্দিন মুজাক্কির, ব্যাচ-৬, এনাম এমসি, সাভার

প্রতিটা ওয়ার্ড এ যে যখন যেখানে ছিলাম নিজের পকেটের টাকা আর ফিজিসিয়ান স্যাম্পল মিলিয়ে 'পোর' ফান্ড করেছি, টুম্পা তার নিজের কাপড় রাখার ট্র্যাঙ্কটা মেডিসিন ওয়ার্ডে দিয়ে দিয়েছিল 'পোর' ফান্ডের ওষুধগুলো রাখার জায়গার ব্যবস্থা প্রশাসন করতে ব্যর্থ বলে। কত অজস্র ঘটনা বলব? আমার কাছে কয়েক লক্ষ মানবসেবার সত্যি গল্প আছে, প্রতিটা ইন্টার্ন ডাক্তারের কাছেই আছে। সারাদিন খাটা, রক্ত দরকার হলেই নিজে দেয়া অথবা যোগাড় করা, সাথে লোক নেই বলে রোগীকে নিয়ে পরীক্ষা করতে যাওয়া, দালাল তাড়ানো, 'পোর' ফান্ড করা, হাসপাতালের বরাদ্দ ওষুধ নেই কেন, দিতে হবে বলে সবার সাথে তর্ক করা, কোলস্টমি ব্যাগ, ইউরিন ব্যাগ পরিষ্কার করা, ক্যাথেটার খোলা, রোগীকে ওষুধ বুঝিয়ে দেয়া, নেবুলাইজ করা, নেবুলাইজার নেই অন্য ওয়ার্ড থেকে দৌড়ে নিয়ে আসা এরকম হাজারো বাড়তি কাজ নিজের বরাদ্দ কাজের পাশাপাশি করা বাংলাদেশের সবগুলো পাবলিক হাসপাতালের ৯৯% ইন্টার্ন ডাক্তারদের নিত্যদিনের চিত্র। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে আঁতেল ছাত্রী অথবা সবচেয়ে ফাঁকিবাজ ছাত্র, ভাল, দুষ্ট, নরম, রাগী, ঝগড়াটে, ভদ্র, বিনয়ী, অহংকারী, বিরক্তিকর, হাসিখুশি, সব ধরনের ছেলেমেয়েদের একটাই কমন ব্যাপার ছিল তা হল রোগীর প্রতি ভালোবাসা। পরবর্তিতেই এদের একাংশ দুর্নীতি করবে, একাংশ সেটাকে সমর্থন করবে, একাংশ হতাশ হয়ে এক কোণে পড়ে থাকবে, একাংশ দেশ ছাড়বে অথবা ডাক্তারি ছাড়বে। কেন? সে অন্য আরেক গল্প। কিন্তু ইন্টার্নের সময়ে সবার গল্প এক। হাসপাতালের যাবতীয় অপ্রতুলতা ইন্টার্নেরাই খেটে পোষায়। ডাক্তারির পাশাপাশি সিস্টার, আয়ার, ওয়ার্ড বয়ের কাজ করে। বড় স্যারেরা চেম্বার আর পলিটিক্স নিয়ে ব্যস্ত, কর্মচারীরা ব্যস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে, ওষুধ অপর্যাপ্ত, নোংরা পরিবেশ, টেকনিশিয়ান নেই অথবা পরীক্ষার মেশিন নষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি হেলথ সিস্টেমের যাবতীয় ব্যর্থতার দায় মেটায় ইন্টার্ন সারাদিন পরিশ্রম করে। প্রতিটা সরকারি হাসপাতাল চলে ইন্টার্ন আর অনারারী ডাক্তারদের শ্রমে। বিশ্বাস হচ্ছে না? যে কোন একটা সরকারি হাসপাতালে যে কোন একজন ইন্টার্নের সাথে ২৪ ঘণ্টা কাটিয়ে আসুন, বুঝে যাবেন। দেশের এই বয়সী আর কয়টা ছেলে মেয়ে এভাবে মানবসেবা করে? ১% ও কি? আপনি আমাকে শোনাবেন ডাক্তারের কাজ মানবসেবা। নিঃসন্দেহে চিকিৎসা একটা সেবামূলক পেশা, কিন্তু শুধু চিকিৎসকরা মানবসেবা করবে আর বাকি সব মানুষ বসে বসে বুড়ো আঙ্গুল চিবোবে-এর চাইতে হাস্যকর যুক্তি আর কী হতে পারে। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য নীতির ঠিকমত বাস্তবায়ন নেই, ব্যাঙের ছাতার মত গজানো ওষুধ কোম্পানি, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, অধিকাংশ ক্ষমতাবান ডাক্তার দুর্নীতি করছে তাদের কেউ ধরছে না, সফল ডাক্তারদের একটা বড় অংশ রোগীর সাথে ধমকে কথা বলতে অভ্যস্ত, হেলথ মিনিস্ট্রির মাথা থেকে পা পর্যন্ত দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন, সরকার কি করে? এসব ডাক্তাররা ঠিক করবে? আমি আমার পাশের দুর্নীতিবাজ ডাক্তারকে ধরে পিটাব? যে ডাক্তার ওষুধ কোম্প্যানি বা ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের কাছ থেকে কমিশন খায় তাদেরকে পিটিয়ে ঠিক করার জন্য ডাক্তাররা মিলে একটা দল খুলবো? যারা রোগির সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে ঠিক করব? আমরা ধরে পিটালেই বা বুঝালেই কি দুর্নীতিবাজ ডাক্তাররা সব ভাল হয়ে যাবে? নাকি তার জন্য দরকার একটা ভাল গভার্নেন্সি, আইন প্রয়োগ, বিচার ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন? এসব জায়গায় কি ডাক্তাররা কাজ করছেন? প্রশাসনে কতজন ডাক্তার? আর প্রশাসনে কেউ যদি ডাক্তার হয়েও থাকেন এসব সমস্যার সমাধান করতে না পারাটা তার প্রশাসনিক ব্যর্থতা, ডাক্তারি ব্যর্থতা। ডাক্তারদের দিয়ে কাজ করানোর জন্য যে তাদের আর কিছু না হোক অন্তত একটা নিরাপদ কাজের পরিবেশ দিতে হবে সেটা কর্তৃপক্ষের বুঝার দরকার নেই। হাসপাতালে ডাক্তার লাঞ্ছিত হবে, মার খাবে, মেয়ে ডাক্তারকে বাথরুম থেকে টেনে বের করে লাঞ্ছিত করা হবে, নিয়ম যেটা সেটা করতে বললেও দল বেধে মাস্তানরা এসে পিটাবে আর ডাক্তাররা গা বাচাতে বাধা দিলে, প্রতিবাদ করলে তারা মাস্তান! তাদের আবার ধরে পিটাও? কেন রে বাবা একা ডাক্তারদের এত কিসের দায়? মানবধর্ম? সেটা ডাক্তারের একার সম্পত্তি? তবে যে দেশের শিক্ষিত জনগণ বুঝে না ঢাকা মেডিকেলের মত একটা হাসপাতালে যেখানে সারা দেশের সব খারাপ রোগীরা শেষ মুহূর্তে আসে বাঁচার লড়াইয়ে, যেখানে কয়েক হাজার রোগীর জন্য ডাক্তার গুটিকয়েক, সেখানে ডাক্তারদের জন্য একটা লিফট ফ্রি রাখাটা কতখানি জরুরী। যেখানকার মানুষ বুঝে না নিরাপত্তার খাতিরে গেইট বন্ধ রাখা (ইমারজেন্সি খোলা ছিল) প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখানে ডাক্তারের কিছু করার নেই, যে দেশের মানুষ হাসপাতালে গিয়ে টয়লেটের ফ্লাশ কাজ না করলেও ডাক্তারকে গিয়ে গালি দেয় (আমাকে দিয়েছিল, আমি যে চিকিৎসা দিতে শিখেছি ফ্লাশ ঠিক করতে শিখিনি এত সহজ একটা কথা তাকে ভালভাবে বলেও বুঝাতে পারিনি), যে দেশের মানুষ মনে করে চিকিৎসা নেয়া আমার অধিকার কিন্তু ফি দেয়াটা আমার কর্তব্য না, ডাক্তার কি ভাবে পেট চালাবে সেটা ডাক্তারের মাথাব্যথা, যে দেশের মানুষ ৩ টা ওষুধ দিলে খায় ১ টা, ১০ টা পরামর্শ দিলে শুনে ২ টা অথচ সুস্থ না হলে ডাক্তারের দোষ, যেখানকার বিজ্ঞ জনগোষ্ঠী পত্রিকাকে উঠতে বসতে ১৪ টা গালি দেয় মিথ্যে খবর ছাপানোর জন্য, ব্লগ লিখে পত্রিকার গুষ্টি উদ্ধার করে অথচ ডাক্তারদের সম্পর্কে লেখা প্রতিটা মিথ্যে খবরকে বেদবাক্য মনে করে, যে দেশের মানুষ বড় দুর্নীতিবাজ ডাক্তারদের টিকিটাও ছুঁতে পারেনা অথচ মানুষকে ভালোবেসে কোন রকম প্রত্যাশা ছাড়া কাজ করে যাওয়া ইন্টার্ন ডাক্তারগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অবস্থা করে,সেই দেশের মানুষের জন্য খেটে মরাটাই এখন মূল্যহীন মনে হচ্ছে। আমার এদেরকেও কিছু বলার নেই। এরা কপাল নিয়ে জন্মেছে, ডাক্তার হয়নি। তাই এখন এসি রুমে বসে হাসপাতালে দৌড়ে ঘাম ঝড়িয়ে মানবসেবা করা ইন্টার্ন ডাক্তারদের এদের কাছে অমানুষ, মাস্তান মনে হয়। হ্যাঁ, আমরা সব অমানুষ, না-মানুষ। মানুষের স্বরূপ তো চারপাশে অনেক দেখছি তাই মানুষ হওয়ার সাধ বহু আগে মিটে গেছে। আমি শুধু আমার পরিচিত প্রতিটা বাচ্চাকে বলতে চাই মুচি হও, কাঠমিস্ত্রি হও, কাজের বুয়া হও, অথবা কিছু না হও কিন্তু ডাক্তার হয়ো না। আর যারা ভুলে হয়ে গেছ যদি দুর্নীতি করতে চাও তাহলে থেকে যাও আর নয়ত পারলে পেশা বদলাও নয়ত দেশ। তখন দূর থেকে তুমিও ডাক্তারদের গালি দিয়ে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারবে চাইলে। মানবসেবায় জীবন বিলানো বোধকরি পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দের কাজ, কিন্তু মানুষের জন্য দিনরাত খেটে লাঞ্ছিত হওয়ার কোন অর্থ নেই। একটাই তো জীবন, এভাবে নষ্ট হতে দেয়াটা আসলেই চূড়ান্ত বোকামি।

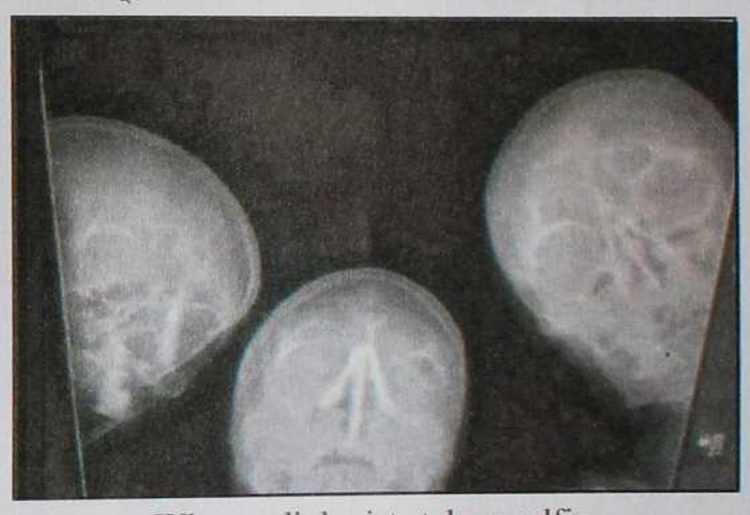

When radiologists take a selfie

আইডেন্টিটি ক্রাইসিস

ডাঃ সৃজন সাহা অনীক, ব্যাচ ১৫, খুলনা এমসি

'ইন্টার্ন শেষ হওয়ার পরপরই অভাব শুরু হয় না, হয় ৩-৪ মাস পর থেকে'- কথাটি আমাকে বলেছিলেন এক ভাই। তখন ক্যাবলা কান্তর মত হাসলেও এখন তা বুঝিতে পারছি। অভাবের সাথে জড়িয়ে আছে নানাবিধ বিড়ম্বনা। এর মধ্যে এক নম্বর হল identity সঙ্কট। কারো সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথে কমন কিছু প্রশ্ন করা শুরু হয়ে যায়-জনৈকঃ তুমি এখন কোথায় আছ ?

আমিঃ আমি এখন আপনার সামনেই আছি।

জনৈকঃ না,বলছিলাম তুমি কোন হাসপাতালে আছ ?

আমিঃ এখনও কোন হাসপাতালে ঢুকিনি ।

জনৈকঃ তাহলে করো কি ? বেকার ? (ভাব দেখে মনে হয় আমার বেকারত্বে আমার থেকে তারই অন্তর পুড়ে যাচ্ছে)

আমিঃ জ্বি হ্যাঁ ।

জনৈকঃ তাইলে কিছু করো। আর কত দিন মা বাবার ঘাড়ে বসে খাবা। (আমার মা বাবার বেকার ছেলের চিন্তায় তার ঘুম হচ্ছে না)

আমিঃ জ্বি চেষ্টা করছি । (রাগে শরীর জ্বলছে। ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলতে পারছি না)

জনৈকঃ তা তুমি কোন বিষয়ে specialist ?

আমিঃ এখনও কোন বিষয়ে specialist হয়ে পারিনি ।

জনৈকঃ ও তার মানে simple MBBS । (অতীব তাচ্ছিল্যের সাথে)

আমিঃ জ্বি হ্যাঁ ।

জনৈকঃ তা আমার একটু পেটে ব্যথা হচ্ছে,কি ওষুধ খাওয়া যায় বলত বাবা (এতক্ষণে বাবা ডাক আসিল)।

আমিঃ জ্বি আমিতো simple MBBS আমার ওষুধে কী আর আপনার সারবে, আপনি ভাল হয় একজন FCPS Medicine specialist এর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনি যে মাপের লোক তাতে একজন Simple MBBS ডাক্তারের ওষুধে আপনার রোগ সারবে না। Simple MBBS ভাইদের কাছে অনুরোধ যারা আপনাদের সম্মান করতে পারবে না, তাদের দয়া করে treatment করবেন না।

'শূণ্য'

ডাঃ সেলিম শাহেদ, ব্যাচ-৩০, শের এ বাংলা এমসি (বরিশাল), আইএমও (মেডিসিন), স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

শ দীর্ঘ উ কার ণ য ফলা= শূণ্য। শূণ্য টাকার বেতনে চাকরি করেছেন কখনো?

পৃথিবী ভাগ হয়ে গেছে দু'ভাগে। এখানেও উত্তরটা দুই প্রকার। একদল বলবেন করেছি বা করছি। আরেক দল বলবেন,করি তবে শূণ্য গুলি নয় অংকের বৃহত্তম সংখ্যার পেছনে থাকে। যাদের বেতনে 'শূণ্য' নয় অংকের বৃহত্তম সংখ্যার পরে থাকে অর্থাৎ যারা কাজ করে টাকা পান তাদের হাতে একটু টাইম আছে? একটু কথা শুনবেন? বাংলাদেশে এই মুহূর্তে কম করে হলেও হাজারের উপরে চিকিৎসক আছেন যারা শূণ্য টাকা বেতনে চাকরি করেন। শূণ্য মানে স্রেফ শূণ্য। এর আগে পরে কোন বৃহত্তম সংখ্যা নেই। হাসপাতালে যে খালা কিংবা মাসী ট্রলি ঠেলেন তার বেতন আছে। বেতনের পাশাপাশি রোগীর লোককে ঠেক দিয়ে কিছু উপরি ইনকামও আছে, যাদের দেয়া ফিনাইলিনের গন্ধে আপনাদের নাক চেপে ধরে রাখতে হয় সেই ওয়ার্ডবয়ও মাস শেষে মাইনে পান, হাসপাতালের সামনে আপনাদের মানতের টাকা খাওয়া ফকিরের ও ইনকাম আছে। শুধু ইনকাম নেই এক প্রকারের চিকিৎসকদের। যাদের প্রকারটা ভেঙ্গে বললে বুঝবেন কিনা জানি না। তাদের প্রকারটা হলো অনারারি প্রকার। তারা চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও 'শূণ্য' টাকা বেতনে চাকরি করেন। একটা ট্রেনিং সার্টিফিকেটের মূলা ঝুলিয়ে এই চিনির বলদগুলোকে দিয়ে হাসপাতালের এমন কোন কাজ নেই যে করানো হয় না। পৃথিবীর এমন কোন দেশ আছে কিনা আমার জানা নেই যেখানে চিকিৎসকের শ্রমকে শূণ্য টাকায় কেনা হয়। সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ বলেই হয়তো সম্ভব। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা কী জানেন? এই শূণ্য টাকার বেতন ভুক্ত অনারারি ডাক্তারদের মাঝে মাঝে কেউ কেউ চাকরী খাওয়ার ভয় দেখান। ন্যাংটাকে বাটপারের ভয়! হাসপাতালে ঢোকার গেটে 'হাসপাতাল'কে পুঁজি করে বেড়ে উঠা ভিক্ষুকের আয় আছে, রোগী ভাগিয়ে ক্লিনিকে ভর্তি করলে 'দালালে'র আয় আছে অথচ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বেতন পান না অনারারি চিকিৎসকরা! এমন কী পেটে ভাতেও না। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা! প্রকৃত অবস্থা। কোন স্যারের চেম্বারে গিয়ে সিরিয়াল পান নি, সেটা দিয়ে প্লিজ সারাদেশের চিকিৎসকদের মূল্যায়ন করবেন না।

অনারারি মেডিকেল অফিসারদের গল্প

ডা প্রীতম দে, ব্যাচ-৬৩, ঢাকা এমসি

কোন একজন মানুষ প্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কিংবা তার থেকেও বেশি সময় শ্রম দিয়ে যাবে কিন্তু বিনিময়ে তাকে কোন সম্মানী দেয়া হবে না-এই পুঁজিবাদী বিশ্বে এমনটাও যে ঘটতে পারে তা হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটিই আমাদের দেশে ঘটে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে এবং আশ্চর্যের বিষয় হল যাদের সাথে ঘটছে তাঁরাও মুখ বুঁজে ব্যাপারটা সহ্য করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত মানুষেরা হয়ত এতক্ষণে বুঝে গেছেন আমি কী বলতে চাইছি। হ্যাঁ, আমি আমাদের দেশের 'অনারারি' প্রথার কথাই বলছি। যদিও নামে অনারারি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন 'অনারারিয়াম' এর দেখা তারা কোন দিনই পাননা। আমাদের দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্ত হতাশাজনক বিষয়গুলোর যদি একটা তালিকা করা হয় তাহলে বোধহয় এই 'অনারারি প্রথা' সেই তালিকার প্রথমদিকেই থাকবে। ফেসবুকে, ব্লগে চিকিৎসকদের হতাশা-বঞ্চনার ব্যাপারগুলো নিয়ে এখন অনেকেই সোচ্চার কিন্তু অনারারি প্রথা'র মত একটা অবাস্তব এবং মধ্যযুগীয় প্রথা নিয়ে অন্তর্জালেও খুব একটা আলোচনা হয় না। অথচ আমাদের চিকিৎসকরা যে ব্যাপারগুলো নিয়ে সমালোচিত হই সেই ব্যাপারগুলোর অনেকগুলোরই উৎস কিন্তু লুকিয়ে আছে এই অবাস্তব সিস্টেমটির জটিল গোলকধাঁধার ভেতরে।

চিকিৎসক এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীরা সবাই এই অনারারি প্রথা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। নন-মেডিকেল মানুষদের জন্য এই সিস্টেমটা আসলে কী তা একটু অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এমবিবিএস পাস করার পর উচ্চতর ডিগ্রী নিতে হলে চিকিৎসকদের ট্রেনিং করতে হয়।উচ্চতর ডিগ্রী মানে এফসিপিএস, এমডি, এমএস প্রভৃতি। কোর্সভেদে ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রতিটা সরকারি হাসপাতালে কিছু ট্রেনিং পোস্ট আছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার, আইএমও এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং পোস্ট। যে সকল চিকিৎসক সরকারি চাকরি করেন, দুই বছর উপজেলায় বা ইউনিয়নে কিংবা গ্রামে থাকার পর তারা এই পোস্টগুলোতে আসেন এবং উচ্চতর ডিগ্রী'র জন্য ট্রেনিং করেন। যারা সরকারি চাকরি করেন না কিংবা সরকারি চাকরি এখনো পাননি তারা ট্রেনিং করার জন্য হাসপাতালগুলোতে কাজ করেন অনাহারি অর্থাৎ অনারারি মেডিকেল অফিসার হিসেবে এবং এদের সংখ্যা নেহাৎ কম না। যে সকল হাসপাতালে ট্রেনিং করা হয়, সেই সব হাসপাতালে ইন্টার্নদের পর এরাই সবচেয়ে বড় ওয়ার্ক ফোর্স। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এদের শ্রমটা পুরোটাই অবৈতনিক। সম্পূর্ণ বিনা বেতনে এরা দিনের পর দিন মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এর থেকে বড় তামাশা আর কী হতে পারে?

কিন্তু শুধু মানবসেবা করলেই তো আর পেট ভরে না। তাই পেটের তাগিদেই এই অনারারিদের কাজ করতে হয় বিভিন্ন ক্লিনিকে এবং শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি এই ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তারদের যে টাকা দেয়া হয় ঢাকা শহরে একজন রিকশাওয়ালা প্রতি ঘণ্টায় তার থেকে বেশি টাকা উপার্জন করে! বিনা বেতনে মানবসেবা করার এই প্রথা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই নেই। উন্নত দেশগুলোর কথা তো বাদই দিলাম,আমাদের পাশ্ববর্তী দেশগুলো যেমন ভারত কিংবা শ্রীলংকাতেও এই রকম বর্বর প্রথা চালু নেই। বিনা বেতনে এই অমানুষিক কষ্ট করার কথা শুনলে ওরা হাসে। ঐ দেশগুলোতে বিভিন্ন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং কোর্সগুলোর জন্য ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। যারা চান্স পায় তাদেরকে সবাইকে কিছু না কিছু টাকা দেয়া হয় জীবন ধারণের জন্য। আমাদের দেশে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব সীমিত পরিসরে এই সুযোগটা চালু হয়েছে অল্প কিছুদিন হল। অন্য সব জায়গাতেই অনারারিরা অনাহারী থেকেই মানব সেবা করে যাচ্ছে এখনো।

দূরবীন : এমবিবিএস করার পর

ডাঃ আনাস খুরশীদ নাবিল, ব্যাচ-৪৮, চট্টগ্রাম এমসি

১) বাংলাদেশে যা যা করতে পারেনঃ

চাকরিঃ সরকারি বিসিএস (২ বছর বাধ্যতামূলক গ্রামে থাকতে হবে), বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্মি মেডিকেল কোর (ক্যাপ্টেন হিসেবে পদায়ন)।

বেসরকারি চাকরিঃ ট্রেনিংসহ-কিছু বেসরকারি হাসপাতালে (BIRDEM, UNITED, Holy Family etc) মেডিকেল অফিসার হিসেবে চাকরি করে নির্দিষ্ট সময় মেয়াদী পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনিং কাউন্ট করিয়ে নেয়া যায়, সাথে বেতন আছে। বিনা বেতনে অনারারী ট্রেনিং।

ট্রেনিং ছাড়াঃ ইনডোর/আউটডোর মেডিকেল অফিসার হিসেবে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিকে চাকরি/খ্যাপ, লেকচারার হিসেবে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে চাকরি।

রিসার্চ ভিত্তিক চাকরিঃ ICDDR.B, BRAC, other NGOs, (পাবলিক হেলথ এ ক্যারিয়ার করতে চাইলে এদিকে যাওয়া যেতে পারে)

অন্যান্যঃ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে চাকরি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন গার্মেন্টস/স্কুলে ডাক্তার হিসেবে চাকরি, কোচিং, টিউশনি, ব্যবসা ইত্যাদি!

২) একাডেমিক ডিগ্রিঃ

FCPS, MCPS, MD/MS (Residency and Non-residency),Diploma (offered by BSMMU: Diploma in Gyane & Obstretics, Cardiology, Ophthalmology, Child health, Anesthesiology, DDV, Forensic Medicine, Dermatology, Pathology, Microbiology, ENT, DCP, DLO, DTCD, Diploma in Orthopaedic Surgery & General Surgery, (DMU), MPH/Public Health, MTM,M.Phil (Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Radiology & Imaging, Community Medicine, PSM, Immunology and Nuclear Medicine), M.Med (Medical Education), PhD, MBA, Bio-medical Engineering.

৩) দেশের বাইরেঃ

লাইসেন্সিং এক্সামিনেশন (রেসিডেন্সি প্রোগামে পড়াশুনা, চাকরি, জিপি প্রাকটিস, সনোগ্রাফি) ঃ

*English Speaking Country: USMLE(USA),PLAB(UK), AMC(Australia), MCCEE, MCCQE (Canada), PRES (Ireland), NZREX (Newzealand), Singapore (MRCP/MRCS করে লাইসেন্সিং পরীক্ষা দেয়া যাবে)

Malaysia (বাংলাদেশের শুধু ৪টা মেডিকেল কলেজ DMC, MMC, CMC, SOMC এর ডাক্তাররা সরাসরি পরীক্ষা দিতে পারবে অন্যরা MRCP/MRCS করে পরীক্ষা দিতে পারবে)

ARDMS (USA) (For Medical Diagonostic Sonographer, DMU করে দেয়া যাবে, ১ বছরের ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, সুপারভাইজারের রেকমেন্ডেশন লেটার লাগবে)

CARDUP (CANADA) (For Medical Diagonostic Sonographer, DMU করে দেয়া যাবে, ১ বছরের ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স লাগবে, সুপারভাইজারের রেকমেন্ডেশন লেটার লাগবে)

* Non-English Speaking Country:

Europe: ভাষা শিখতে হবে

Middle-east: সৌদি আরব, কাতার, ওমান, ইরাক ইত্যাদি (লাইসেন্সিং পরীক্ষা দিতে হয়, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে নিচ্ছে না)। (শুধু মাত্র চাকরির জন্য, বেতন ভালো, ওখানে বসে MRCP/MRCS দেয়া যায়)

Maldives: (১ বছর মেয়াদী চুক্তি, শুধু চাকরি, বর্তমানে লোক নিচ্ছে, বেতন মোটামুটি ভাল, ওখানে বসে USMLE/AMC/PLAB/MRCP প্রিপারেশন নেয়া যায়)

রয়েল কলেজ মেম্বারশিপ/ফেলোশিপ পরীক্ষাঃ

(UK/Ireland)-MRCP(UK), MRCPI, MRCS(Intercollegiate), DOHNS-MRCS(ENT), MRCOG, MRCGP, MRCPCH, MRCPsych, MCEMMFPH(Part A & Part B/OSPHE.) (Publichealth) (http://www.fph.org.uk/exams)

FRCR, FRCA, FRCPath, FRCS, FRCOphth, FRCP

বাংলাদেশ থেকে যেসব বিদেশী পরীক্ষা দেয়া যায়ঃ

USMLE (step1,step 2CK), PLAB(part 1), MRCP UK(part 1, part 2 written)(London, Edinburgh, Glasgow), MRCS (part A, England & Glasgow) (part B OSCE, England), MRCOG (part 1,part 2 written), MRCGP

#রিসার্চ সেক্টরঃ

MSc, MPH, MHA & PhD in USA, Canada

রিকোয়ারমেন্ট- GRE, IELTS/TOEFL (কানাডার ক্ষেত্রে অনেক ইউনিভার্সিটিতে এগুলো কিছুই লাগেনা)

Journal: প্রকাশিত জার্নালে নাম অথবা কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল ।

MSc, MPH & PhD in UK, Australia

রিকোয়ারমেন্ট-IELTS

Scholorships: Erasmas Mundus, DAAD ইত্যাদি অনেক ধরনের স্কলারশিপ বিশেষ করে কানাডা এবং ইউরোপে আছে।

এখান থেকে পথ সিলেক্ট করে সে অনুযায়ী স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন, প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে উত্তর দেবার চেষ্টা করা হবে এবং অন্যরা আশা করি সাহায্য করবেন।

(অনেকেই এমবিবিএস এর পরে দেশে/দেশের বাইরে ক্যারিয়ার করার ব্যাপারে জানতে চেয়ে প্ল্যাটফর্ম গ্রুপে পোস্ট দিয়েছেন। সবার জন্য কমন উত্তর হিসেবে লেখা)।

ব্রাঞ্চে পোস্টগ্রাজুয়েশনের কথা ভাবছেন ?

ডাঃ মেডিকোলিগ্যাল বাপ্পী, ব্যাচ-৪৬, রাজশাহী এমসি

ধীর কিন্তু সার্বক্ষণিক গতিময় একটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে সার্বক্ষণিক এগিয়ে চলেছে চিকিৎসা শাস্ত্র। আর ডিগ্রী না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার অবস্থা নেই প্রথাটি শুরু হয়েছে বেশ আগে থেকেই। এখন সময় সুপার স্পেশালাইজেশনের। প্রতি বছর গণমাধ্যমের সংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মেডিকেল কলেজের সংখ্যাও। এতে প্রতিবছরই ক্রমে দীর্ঘায়িত হচ্ছে বিএমডিসির ডাক্তার তালিকা। অনেকেই হতাশ হচ্ছেন এত ডাক্তারের মাঝে তার অবস্থান কি হবে? ভাবার কোন কারণ নেই। অবস্থান ও আসন কখনো কারো জন্য প্রস্তুত থাকে না এটা দখল করতে হয়। ভাবুন তো বাংলাদেশে মাত্র ১হাজার ডাক্তার আছে আপনি ১০০০তম পর্যায়ে এটা ভালো নাকি বাংলাদেশে ৫০হাজার ডাক্তার আছে আপনি আছেন সেরা ১০এ সেটা ভালো? নিজের অবস্থানকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে ডিগ্রী আপনার সহায়ক হবে অনেক ক্ষেত্রেই যদিও অবস্থান সুদৃঢ় করবে আপনার ডাক্তার রোগী পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা ভালো সেটা। যাই হোক মূল বক্তব্যে ফিরি। চিকিৎসা শাস্ত্রে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি ও অবস এবং শিশু মেডিসিনকে মোটামুটিভাবে প্যারেন্ট সাবজেক্ট ধরা হয়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে রোগ নির্ণয় হচ্ছে ম্যাক্রো থেকে মাইক্রো পর্যায়ে তাই বাড়ছে সুপার স্পেশালাইজেশন চাহিদা। সুপার স্পেশালাইজেশনের জন্য সবাই প্রথমত বেছে নেয় এমএস বা ডিপ্লোমা ডিগ্রী।কিন্তু স্বল্প আসনের কারণে অনেকেরই ভাগ্যে এই দুইটা ডিগ্রী জোটে না। অথচ এফসিপিএস ডিগ্রীও আপনার সেই চাহিদা পূরণে অনেকটাই সহায়ক । চান্স পাবার পর দুই বছর প্যারেন্ট সাবজেক্টে ট্রেনিং করে একটা প্রিলি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এরপর শুরু হয় তিন বছরের স্পেশাল ট্রেনিং । তারপর ফাইনাল পরীক্ষা । শুরুতে আপনাকে সবাই এই ব্যাপারে অনুৎসাহিত করবে বলবে কার এই ডিগ্রী আছে কে এই পর্যন্ত পাশ করেছে? জবাব একটাই ভাই আজ যে পাশ করবে তাকে নিশ্চয় সাহস করে ৫বছর আগে ঢুকতে হয়েছিল। আজকেই যখন আপনি আমাকে ইনহিবিট করছেন তাহলে ঐসময় কে তাকে উৎসাহিত করেছিল? আমরাই পাইওনিয়ার তাই একটু চেষ্টা করে দেখিই না কী হয়?

MRCP: The Story of a Post Graduate Examinee

Dr.Mohammed Jia Uddin Farhad
3rd Batch,BGC Trust Medical College,Chittagong

It occurred to me several times to sit down one day, hold onto a piece of paper and pen and start writing down the course of events of my life from January 2013 to May 2014.Recently I was asked by one of my junior colleagues to write for PLATFORM about my experience, I seized the opportunity and here I am-

My name is Mohammed Jia Uddin Farhad, I graduated from BGC Trust Medical College,Chittagong in the year 2010 and completed internship by 2011, I was given a job at a private hospital in Chittagong as an Emergency medical officer, during duty hours I used to sit and ponder- "what should I do? Which subject should I choose?" These questions were a part of my daily routine life, waking up with these questions and sleeping with these questions banging in the back of my head. I weighed down many options and finally chose Medicine. But which one in Medicine? MD? FCPS? MRCP? Again I was confused. I literally had no one to career guide me, My friends one by one started to join Dilip Sir's coaching and focused on BCS, I personally wanted to join Dilip sir's academy but due to my inborn lazy attitude towards journeying weekly to Dhaka made things quite impossible and staying in Dhaka was not an option because If I left my mother would have had to be alone with my small brother who was at that time appearing for his "O" levels. So leaving to Dhaka was also not an option. Finally I decided not to join sir's academy.I now regret it deeply because more than the coaching I guess I would never be able to hear his taunts, jokes and the medical co-relations which most doctors always talk about him. Again BCS was also not an option for me, I can speak Bangla, English and my native Chittagonian dialect but unfortunately my Bangla writing capability is limited which cause me to drop BCS. It must have been an immature decision but I hung onto it.

In those days I used to Facebook a lot and used to pass loads of times on the internet and that's where I came across MRCP, read reviews of various examinees for many months and felt terrified. The way the whole world says how can one pass this exam? I spent the entire 2012 in this way useless wondering and faulty planning. I was too lazy to start studying. One page of reading took me two weeks! Towards the end of 2012 I firmly decided to glue my back to my seat and prepare for MRCP-1. I just wanted a lot of help but couldn't get any because of my personal issues, I couldn't and I didn't join any coaching center, I purchased the books required after consulting a friend of mine and I was also told that a minimum of 5 months preparation is needed, Ok! So be it. I decided to appear the exam in May 2013.The books I bought were- 1. Oxford handbook of clinical medicine

2. Pastest question bank

3. Easterbrook's text of basic medical sciences

4.Kalra's text of essential revision notes on MRCP.

I had Davidson's 21st at that time so I didn't need to buy that and I honestly told myself that if I needed to succeed then I needed to work very very Hard.

Here is how I prepared for every major system in medicine I started with the anatomy and physiology from Easterbrook and then went onto oxford+davidson's and covered the entire topic and then finally went onto Pastest to solve the questions, I always and will always recommend and choose Pastest for anyone appearing for MRCP because this PASTEST is very tough and frustrating But it has one positive advantage over the others and that is it trains us pretty well as to how to perform on the big day if our questions are set to difficult levels, the questions are never common the clinical scenarios are the same but the exact questions never come in the exam so in this way finishing every topic/chapter took me 12-14 days and in this way one by one I finished the whole of medicine. Readers may ask why did I make the preparation so hard and lengthy? My answer will always be the same "MRCP Tests your residual clinical knowledge so if you directly jump to a topic without covering the essential basics you may not be able to answer the question". One month before the exam I gave off my duty as replaces and struggled hard to finish studying and even finish revising, the most critical issue is these questions are all Single Best Answer types the pattern very recently taken up by FCPS and that's where most examinees fare pretty bad. To answer Single best answer questions one must practice them thoroughly otherwise I can bet you that it is near impossible to answer these questions. Anyways I prayed and prayed to Allah to make things easy for me all the time, I attested my University certificate at my regional British council, opened an account at their website, applied for the exam via online and made the necessary payments via Bankers draft and sent the documents through DHL (online signed application form, attested University certificate and the Bank Draft instruments). I Partnered with a senior Dr.Sazzad bhai and we arrived in Dhaka on 2nd may 2013 and stayed at the BMA Guest house, the situation in front of press club at that time was sinister and dangerous because of the political uprising on May the 5th. It really affected my preparation, my mind was all occupied with what was going on outside. my exam was held on the 7th May 2013 and the day before the exam I didn't study at all, I popped a sleeping pill at night and remember going to bed at 12 am, the total exam was of 6 hours in one single day. Any one of the papers will be tough and in my case the second part was very difficult and it depressed me. I thought I would not be able to make it.I felt bad. I started to compare and recall questions which was helpful for the others but elevated my anxiety and misery because of the mistakes I thought I made. The results were declared on the 6th June 2013 and at that time I was on night shift at High dependency Unit (HDU). I couldn't believe my eyes! I Passed!!! And that too with a good score! I was immensely overjoyed. I was the first from my medical college to appear and crack this exam and I felt that I have opened a new door for the forthcoming students of my medical college.

Euphoria engulfed me which is quite natural never expected to make it in my first go. My friends urged me that I sit the FCPS-1 medicine exam, initially I didn't want to because I had no interest in FCPS and for that I didn't touch a book nor did I read a single line for 2 months at a stretch, My buddies told me that its been a long time since we've been together at least to give them company I should appear this exam. we arrived in Dhaka 2 days before the exam started and we roamed around, ate at famous restaurants, met up with friends and chatted throughout the night and the next day went to appear the exam, passed all the three days of our exam in this fashion of enjoying life 100% and on the last day of our exam and that was also the day we would all leave to Chittagong by train, one of my buddies Dr.Prachy said,

"আমরা সবাই জানি আমরা কেমন পরীক্ষা দিয়েছি, আমাদের মধ্যে সবাই ফেল মারবে নিশ্চিত। যদি ভুলেও কেউ পাশ করে তাঁকে আমরা ট্রেন থেকে ফেলে দিবো"।

we got on the train and I slept off immediately, I thought I dreamt or was dreaming, there was a wave of light sweeping in front of my visual window. I tried to soo it off but it would come again . I felt terribly irritated and woke up. In half sleep I realized that it was my friend Dr. Jahed waving his Samsung smart phone in front of my eyes.

"এই তোর সমস্যা কী? ঘুমাইতেছি দেখতেছোস না"

"ইতারে ধর, জানালা খুল, ফেলে দে ট্রেনের বাইরে, বেটা বলছে পরীক্ষা খুব কঠিন হইছে, ফেল নিশ্চিত, এখন দেখি আমাদের মাঝে সেই পাশ করছেও ও woke up again in a jump start, what! I passed! I passed

FCPS-1! I don't know how this happened. But it happened! Without a single line of studying for 2 months I cleared this exam! This is where I will say my lengthy tiring preparations during MRCP-1 paved the way to help me pass FCPS-1 and of course it was the repeated practice of the Single Best answer questions.

Yes of course I committed some grave mistakes but later on I felt that I did the right thing, I should have joined training as per my seniors advice but instead I enrolled my self in CCD (Certified course on Diabetes). Most of my family members are diabetic so I thought it was necessary to pursue this course which I completed in january 2014, my personal opinion is always to know yourelf first and then listen to what others tell you, I knew one thing for sure and that is I can never study while I'm busy with something else like training etc. So instead I chose to appear for MRCP-II in April 2014 and start preparing right away. This time the preparations were easy for me because I was already exposed to the giant volume of studies in part-1, this is again where I was benefitted. There is no shortcut to success. Studies never ever go in vain. If you work hard today it will reap good results some day later when you least expect it. The preparations were more detailed this time.

I had to study Sonology, echocardiography, CT/MRI Scans, cardiac catheter data, ECG, x-rays, slides, investigation analysis and of course treatments. The books were all the same as before and again I chose Pastest as my question bank and relied on Google a lot for images. it took me 4 months to prepare and 10 days before the exam I attended a mock test held by Sumanta sir's academy for MRCP. The mock test was fruitful it was a two day program and lots of helpful tips, advices and images were provided, I thank Dr.Sumanta kumar Saha sir for his kind efforts and his dedication towards his students, I wish I attended his coaching academy but then again long distance, family issues kept me away from Dhaka always. I met a senior bro Dr.Shabber bhai of Holy family Medical College with whom I partnered the last few days, I can never forget his help and contribution.

My exam was held on the 9th&10th April 2014 and total of 9 hours with 270 questions.90 questions in 3 hours so 2 minutes per question, you gotta be a good and quick reader if you are to analyze these questions in such a short time and the image galleries provided were all high resolution images, such superb clarity! As usual I was again frustrated with the exam because I thought I made silly mistakes, But by the Grace of Almighty Allah I passed MRCP-II Also. I was overjoyed and dumbstruck as like before and looked back into what it cost me. These 3 exams cost me my job, my chamber and lots of time but still in the end I will say Thank you Allah for everything . I will now join training from July with the burden of exams lifted off my head and will give a break to my life before thinking of preparing for the final part MRCP-PACES.

I just wanted to write it out all, I know I may have bored many of the readers for which I sincerely apologize. Please do keep me in your prayers and work hard to polish your career and whenever possible Help those around you because if you lend a helping hand . The Almighty above also lends his Helping hand. Cheers Everyone!

(dr.jiauddin.mj@gmail.com) (Unedited)

রিসার্চ

তন্ময় বিশ্বাস, ব্যাচ-২০, ফরিদপুর এমসি

রাজীব আমার বা আপনার মতই একজন সাধারণ মানুষ। অনেকের মত সেও স্বপ্ন দেখে অনেক বড় ডাক্তার হবার, চিকিৎসাশাস্ত্রে সফলতার সম্ভষ্টির সীমা ছুঁতে চায় সে। শুধুমাত্র নৈমিত্তিকতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কিছু করে দেখাতে চায়, বলতে চায় সেও পারে একজন আদর্শ হতে। কিন্তু সে বাঁধা থাকে কলেজের আইটেম-কার্ডের মধ্যেই,সে বুঝতে পারে না কিভাবে সাধারণ থেকে অনন্য-সাধারণ হওয়া যায়।

ঘটনা ১। রাজীবের মামা বিদেশে থাকেন। এইচএসসি পাশ করার পর উনি চেয়েছিলেন রাজীব বিদেশে ডাক্তারি পড়া শুরু করুক। মামার ইচ্ছায় সে বিদেশে গিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিল। মেডিকেল স্কুলের শিক্ষিকা ভাইভার টেবিলে তাকে প্রশ্ন করেন "তোমার কি কোন পাবলিকেশন নেই?"। সে শুধু এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল, আর মনে মনে ভাবে-'এটা আবার কি জিনিস?' কোন এক কারণে তাকে বিদেশের ওই মেডিকেল স্কুল ভর্তি নেয় না। দেশে এসে সে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে চান্স পায় একটি স্বনামধন্য সরকারী মেডিকেল কলেজে, শুরু হয় মেডিকেল শিক্ষাজীবন।

ঘটনা ২। কলেজ এর ৩য় বর্ষে উঠে সে একবার একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের খবর পায়, যা ছিল শুধুই সারা বিশ্বের মেডিকেল ছাত্রদের নিয়ে। নতুন কিছু জানার উন্মাদনায় সেও ছুটে যায় সেই মিলনমেলায়। সারা পৃথিবী থেকে অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা শিক্ষার্থী তার মত এসে ভিড় করে সেখানে, জানতে পারে অন্যদের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানকে, বুঝতে পারে অন্য দেশের মেডিকেল জ্ঞানচর্চা, শিক্ষার পরিধি ও সুযোগ-সুবিধা। রাজীব প্রথমেই অবাক হয়ে খেয়াল করল, সারা বিশ্বের যেখানে এত অংশগ্রহন বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা তখন এই সম্মেলনের ব্যাপারে অবগত নয়। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হল,একটি সম্মেলনের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই থাকে মেডিকেল বিষয়ক ছোটবড় গবেষণার উপস্থাপন, যেটার সাথে বাংলাদেশী মেডিকেল শিক্ষার্থীরা তাদের কারিকুলামের সংকীর্নতার কারণে হোক আর যে কারণে হোক, পরিচিত নয় বললেই চলে। রাজীব যখন বিদেশী সহপাঠীদের সাথে পরিচিত হয়, তখন সে দেখে তাদের আলোচনার বিষয় হল "কার কয়টি 'পাবলিকেশন'। আসলে সে বারবার এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে আক্ষেপ করে আর ভাবে যখন অন্য দেশের আন্ডার-গ্রাজুয়েটরা তাদের গবেষণাপত্রের (পাবলিকেশনস) সংখ্যা গণনা করে তখন আমরা বিষয়টি নিয়ে একদমই অসচেতন। সে হতাশ হয় এই ভেবে, যে কি বলবে, "আমার কোনই পাবলিকেশন নেই" নাকি বলবে "পাবলিকেশন কি আমি জানতাম না"।

ঘটনা ৩। এমবিবিএস শেষ করার পর রাজীব চিন্তা করে বিদেশ থেকে একটি ডিগ্রি নেয়ার, অন্য দেশ থেকে পড়াশুনা করে এসে তারপর আবার এদেশের মানুষের সেবা করবে। কিন্তু আর দশজনের মত তার পরিবারের সামর্থ্য ছিল না নিজের খরচে বিদেশে পড়বে।তাই চেষ্টার পালাক্রমে 'স্কলারশীপ' বা 'শিক্ষাবৃত্তি' শব্দটার সাথে পরিচিত হয় সে। আবেদন করা শুরু করে, দেশ-বিদেশের অনেক মেডিকেল ভার্সিটিতে যারা স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। এখানে অবাক হয়ে সে দেখে, আবেদনের জন্যে যে সিভি (কারিকুলাম ভিটা) প্রস্তুত করতে হয়, সেটার ফরম্যাটে পাবলিকেশন ও গবেষণার অভিজ্ঞতা নিয়ে উল্লেখ করতে বলা হয়েছে যেটি বাধ্যতামূলক। বেশিরভাগ সদ্য পাশ করা বাংলাদেশী ডাক্তারদের মত তারও এই বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় সে এখানে কিছুই লিখতে পারে না। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে বারবার চেষ্টা করেও স্কলারশিপ পেতে ব্যর্থ হয় সে।

ঘটনা ৪। আশাহত হয়না রাজীব, কারণ আমাদের দেশে পোস্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রিগুলো অনেক স্বয়ংস্বম্পূর্ণ। ভর্তি হয় মেডিকেল ভার্সিটির এমডি প্রোগ্রামে। এই কোর্সের শেষের দিকে এসে সে বুঝতে পারে, এবার তাকে গবেষণা করতেই হবে, বের করতে হবে নিজের গবেষণাপত্র বা থিসিস পেপার, যা এমডি সহ এমএস বা এফসিপিএস কারিকুলামের অংশ। নিজের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ছুটাছুটি শুরু বিভিন্ন মানুষের কাছে, শেষ মুহূর্তে এসে তাকে শিখতে হয় গবেষণার সহজ পদ্ধতিগুলো। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে কোনমতে বের করে নিজের একটি গবেষণাপত্র। যেখানে রাজীব দেখেছিল অন্য দেশের শিক্ষার্থীরা আন্ডারপ্রাজুয়েটে তাদের পাবলিকেশন এর সংখ্যা গুণত, সেখানে পোস্টগ্রাজুয়েট শেষে তার পাবলিকেশন হয় একটি।

ঘটনা ৫। না, গল্প শেষ নয়। এই রাজীবই একদিন সহকারী অধ্যাপক হন। সেখানেও তাঁকে বিভিন্ন সময় বিপাকে পড়তে হয় পর্যাপ্ত গবেষণার অভিজ্ঞতা না থাকায়। পূর্ণ অধ্যাপকের প্রোমোশন থেকে শুরু করে, বিদেশে কোন সেমিনার, কনফারেন্স, বা ট্রেইনিং এ পাবলিকেশন দেখাতে হয় তার। সে বুঝতে পারে অধ্যাপক হতে হলে গবেষণাপত্রের গুরুত্ব আরো বেশি।

গল্পটি প্রতীকী, কিন্তু ডাক্তারদের জীবন থেকে নেয়া। শুধুই এই কয়েকটি ক্ষেত্রে নয়, একটি আদর্শ মেডিকেল ক্যারিয়ারের আনাচে-কানাচে গবেষণা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যেটা বলে শেষ করা যাবে না। সারা বিশ্বে যেখানে গবেষণা দিয়ে মেডিকেল জ্ঞানকে বিচার করছে, সেখানে পাবলিকেশনে আমাদের কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই। পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্রে যত পুরস্কার তার সব কিছুতেই বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। এমন নয় যে, আমাদের মেডিকেল কারিকুলাম ভাল নয়, বরং আমাদের মেডিকেল সেক্টর আধুনিক বিশ্বের সাথে অনেক তাল মিলিয়ে চলে, সেখানে কেন এই একটি বিষয়ে আমরা পিছিয়ে থাকব? শুধু নিজের সফলতার জন্যই নয় বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যই আমাদের মেডিকেল গবেষণার ক্ষেত্রকে পূর্ণতা দেয়া উচিত।

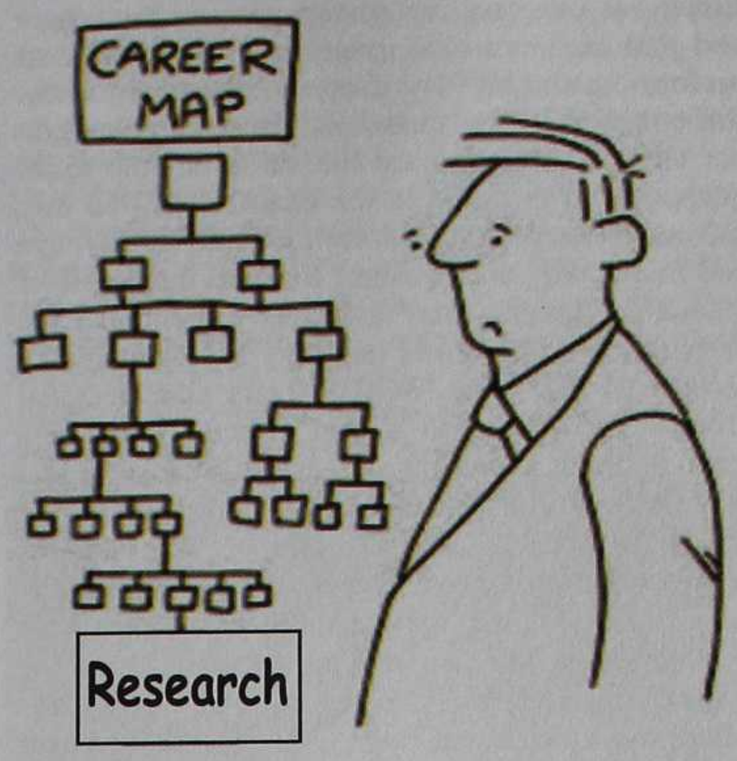

Dear fresh graduates, let us start to think about research!!

Dr Rajat SR Biswas, MD.

Research in medical sector is the most sophisticated and dignified, difficult and hardnut to crack type matter. If we have lack of basics regarding research related matters it will remain a fearful subject for whole of our life.

Actually, foundation of research starts from the learning of biostatistics and epidemiology of Community Medicine at 3rd year and 4th year of MBBS. But unfortunately our foundation gets very poor shape at this stages and our blindness started from here.

To get enter in the post graduation, we need to read some basic definition and only five questions or less are allocated for it and by escaping the whole set of questions, related with statistics and research, some one can get himself admitted! So again, here our blindness deepens.

During doing the training for fellowship or residency we need to submit a dissertation or thesis work. As lacking starts from the 3rd year, many students fail to overcome it and they try to get help from other persons regarding preparing the protocol, data analysis and writing. In different unscientific way they finish their works and then enter in the clinical site, forgetting that as a most painful part and never give his mind on it in future.

Attitude of our seniors also is an important factor regarding making juniors more research mind.

So very few postgraduate doctors become research mind and it is the most unexplored area in our country. But things should not be like that. We have to overcome the problem and we have to enter the most dignified part of the medical science! But how?

While doing training, we have to keep our eyes open and we have take records of interesting cases with their photographs. Most prestigious journal of medical science, The New England Journal of Medicine has a separate option to publish the interesting photographs after editing and peer reviewing. Other journals also do that. During training period, we have to start to submit the photographs in national and international journals. We can prepare case reports of interesting patients and can start to submit in different journals. It will help the researcher to know the difficult online procedure, how to submit, how to write a small case note, how to write the reference in correct form, what are the different parts of a case report, how the reviewers comment on their topics, how plagiarism is avoided, what are the criteria of an article to be published in different journals etc. If someone deal few topics, he then start to find his own way and he will start to think how he should proceed further in future!

During doing PG thesis or dissertation we have to do all the things with honesty. After protocol acceptance we have to start data collection with honesty and we have to maintain it. If we get something, we will record it and if we don't get we should not record. We should not be biased with our premeditated outcome which is the major shortcoming while dealing the data in our country! We will write the thesis works as per honest data analysis. Every fresh researcher should try to publish his/her thesis or dissertation in national or preferable international journal. It may not be accepted in first, second or even third submission but from it we will learn a lot and we can use the experience in future. We have to have the habits of checking online journals regularly. We should keep ourselves up-to-date by reading new informations and for that we need to subscribe different online sites like Medscape, Medline, Pubmed etc.

Bangladesh is passing a transitional period, from where it will start to run faster. We the physicians have to make ourselves ready, so that we do have much energy to run with keeping pace with the others. So, let us be research mind first. (www.rmsbd.org)

Journal News

1. Alhamdulillah finally I have seen my name 'Dr.Sadia Fatema Kabir' as 'Kabir S F' on 'Bangladesh Medical Review'-a journal devoted to medical science published by BMA, Barisal from SBMCH. On this journal I worked on an original article about 'Acute Respiratory Tract Infection among children under five years in a rural community of barisal' and for a rare case report on 'Tuberous sclerosis'. I am really thankful to my mentor Dr.Billah (MBBS,PhD) sir for giving me the opportunity of being a part of the original article. Its really an honour to me. I am also thankful to my beloved respected teachers and senior collaegues of Medicine unit-1 for giving me the chance to work with them on the case report. Here giving the details of journal, vol-52, no-4 issue, oct-dec, 2013. One of my long cherished dreams comes true. I am really very much grateful to the Almighty Allah.

২. গত ১৯ শে মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে চতুর্থ "গ্লোবাল কনফারেন্স অন কমিউনিটি হেলথ" সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে কোডেফ ফাউন্ডেশন তাদের তৃতীয় রিসার্চ পেপার উপস্থাপন করে। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ডাঃ মনজুরুল আলম রিসার্চ পেপারের উপর ওরাল প্রেজেন্টেশন করেন। তাঁর প্রেজেন্টেশন উপস্থিত সম্মানিত অতিথিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। সেমিনারে ডাঃ তায়িব বিন বাদশা ও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কোডেফ ফাউন্ডেশনের আরো একটি রিসার্চ পেপার "বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সাইন্স" এর চতুর্থ "রিজিওনাল পাবলিক হেলথ কনফারেন্স ২০১৪" এর জার্নালে প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, আমাদের আগের দুটি প্রকাশনার খবর "প্ল্যাটফর্ম" এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কোডেফ ফাউন্ডেশন "প্ল্যাটফম"এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছে ডাঃ আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ ট্রেজারার, কোডেফ ফাউন্ডেশন dr.sayeed.nayeem@cohdf.org

৩. এই বছর মে মাসে হয়ে গেল বাংলাদেশ পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রথম এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'Basic research methodology for undergraduate bio-medical students(BRMUG)'। এই ট্রেইনিং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থী গবেষণার মূল বিষয়গুলো জানতে ও শিখতে পারেন। নতুন শিক্ষানবিশ গবেষক তৈরির লক্ষ্যে PHF-BD এবং ICDDR,B এর অভিজ্ঞ গবেষকগণ এখানে প্রশিক্ষণ দেন এবং অনেক মেডিকেল শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন।

বাংলাদেশের নতুন শিক্ষানবিশ গবেষকদের মধ্যে একজন মেডিকেল ৪র্থ বর্ষের ছাত্র তন্ময় বিশ্বাস। এ বছর জানুয়ারীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি জার্নাল "International Journal of Medical Students'-IJMS" এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। এশিয়া থেকে তিনি সহ মাত্র দুইজন এই জার্নালের সম্পাদক প্যানেলের জন্যে নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনি বর্তমানে "Student British Medical Journal" এর রিভিউয়ার এবং ভারতের "Journal of Young Medical Researcher" এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। জানুয়ারিতে তার নিপা ভাইরাসের উপর প্রথম রিসার্চ পেপার আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে জেনেটিক মিউটেশনের উপর একটি কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ এবং হেপাটাইটিস বি এর উপর একটি কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ এর কাজ শেষ হয়। বর্তমানে তিনি আরও পাঁচটি রিসার্চ প্রজেক্টের কাজ শুরু করেছেন। এছাড়া তিনি অনেক আন্তর্জাতিক সোসাইটি ও কনফারেন্সের সাথে জড়িত।

ডেন্টিস্ট ডায়েরী

ডাঃ তৌহিদুর রহমান তৌহিদ, ব্যাচ-৪২, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

আশরাফুল সাহেব, পেশায় ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব! পরিপাটি থাকতে ভালোবাসেন; তবে উপরটা যতটা পরিপাটি মুখের ভেতরটা তথা 'ওরাল হাইজিন' ততটাই বিপরীত! প্রচুর পরিমাণে ধুমপান এবং অসচেতনতায় তাঁর 'ওরাল হাইজিন' লাটে উঠছে! শেষতক তিনি আমার কাছে এসে পৌছেছেন।
"স্কেলিং করাটা জরুরী" মর্মে পরামর্শ দিয়া তাকে দ্রুত আরোগ্য হয়ে যাবেন বলে আশ্বস্ত করলাম। যথারীতি তিনি ব্যবসায়িক পরিভাষা "রেট কত" বলে রিপ্লাই দিলেন!
-স্কেলিং,পলিশিং মিলিয়ে হাজার টাকা মত লাগবে!
-(আঁতকে উঠে) বলেন কী!! সামান্য মুখ পরিস্কারে হাজার টাকা?
-কী সিগারেট খান আপনি?
-গোল্ড লীফ!
-দিন রাতে কয়টা টানেন?
-দশ-পনেরটা!
-সরকারকে কত ভ্যাট দ্যান তাহলে রোজ?
-মানে?
-মানে প্রতিদিন ৫০-৭৫ টাকার সিগারেটে সরকারের কোষাগারে আপনার যায় ১৫% হারে ৭.৫-১২টাকা মত! তাহলে মুখের ভ্যাট কত আসে?
-(কিঞ্চিৎ ইতস্তত ও হতভম্ব!)
-তাহলে মাসিক আসে ২২৫-৩৫০ টাকা আর বাৎসরিক ২৭০০-৪২০০!!
-(কিঞ্চিৎ লজ্জার হাসি)
-তাহলে বৎসর শেষে ধুমপানের ফলে লাটে ওঠা মুখের জন্যেও তো কিছু ভাগে পড়ে,নাকি?
সিগারেট-অ্যালকোহল-তামাক-জর্দ্দা-পান আর গুল,জাতি মশগুল! হিসেব-নিকেশ আটকায় শুধু পরিণতিতে,এখানে-ডক্টরস চেম্বারে!
২। প্রাচীন আমেরিকায় দাঁতের চিকিৎসা দিত "কামার" বা "BLACKSMITH" নামক গোষ্ঠীরা!" মধ্যযুগীয় জার্মানীতে দাঁত ব্যথায় উপশম পেতে মানুষ "গাধা" বা "DONKEY" কে KISS করত!" ১৪৯৮ তে চীনে আবিস্কৃত হওয়া পৃথিবীর প্রথম টুথব্রাশের "ব্রিসল" হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল "শূকরের পশম" বা "HOG'S HAIR!' সভ্যতার বিবর্তনে,কালের পরিক্রমায়,বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মুখ ও দাঁতের চিকিৎসা ও যত্নে এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন! 'তবুও শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে যাচ্ছে সেই আদিম আমলেই! 'অকালে হারাচ্ছে মূল্যবান দাঁত; মুখের ক্যান্সারে ভুগে হারাচ্ছে প্রাণ; অজানা জটিল হৃদরোগের কারণ হিসেবে বয়ে বেড়াচ্ছে "মাড়ির রোগ" বা "PERIODONTAL DISEASE"! আসুন,আমরা "মুখ ও দাঁত" বা ওরাল হেলথ্ সম্পর্কে সচেতন হই অন্যকে সচেতন করি। হ্যাপি "ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে।

অর্থোডোন্টিক চিকিৎসায় রোগিদের করনীয়ঃ

ডাঃ সাজিয়া খানম, বিডিএস, এফসিপিএস (পার্ট-২) অর্থোডোন্টিকস লেকচারার ও ডেন্টাল সার্জন আপডেট ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা

অর্থোডোন্টিক চিকিৎসা সম্পর্কে এখন অনেকেই জানেন। উঁচুনিচু, আঁকাবাঁকা, অসমান ফাঁকা দাঁত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দাঁতের সমস্যার সমধান করা হয় অর্থোডোন্টিক চিকিৎসার মাধ্যমে। এ ছাড়া দাঁতে দাঁত ঘষার সমস্যা, খাবার খেতে অসুবিধা, কথা বলতে অসুবিধা এসব কিছুর সমাধান দেওয়া হয় অর্থোডোন্টিক চিকিৎসার মাধ্যমে। ফিক্সড অর্থোডোন্টিক চিকিৎসায় দাঁতে ব্রেস পরতে হয়। এই ব্রেস দাঁতের সমস্যার ভেদে দুই-আড়াই বছর বা তার বেশী সময়ও পরতে হতে পারে। এসময় রোগীকে তার দাঁত পরিষ্কার করার ব্যাপারে খুবই যত্নশীল হতে হবে। তা না হলে দাঁতের ক্ষয় রোগসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। অর্থোডোন্টিক রোগীদের দাঁতে ডেন্টাল প্লাগের পরিমাণ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় বেড়ে যায়। যেটা সঠিক ভাবে পরিষ্কার করাটা জরুরী। ডেন্টাল প্লাগ বা দাঁতের ক্যারিজ অর্থাৎ দাঁতের ক্ষয় রোগের কারণ। সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণায় দেখা গেছে অর্থো-চিকিৎসা নেওয়া রোগীদের "হোয়াইট স্পট" হচ্ছে। এছাড়া জিঞ্জাইভাল ও পেরিওডোন্টাল সমস্যাতো আছেই। এ সমস্ত সমস্যার সবচেয়ে ফলপ্রসূ সমাধান হচ্ছে স্বাস্থ্যকর ওরাল হাইজিন মেইন্টেইন করা। অর্থাৎ রোগীকে তার মুখের ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে। তার চিকিৎসকেরও এ ব্যাপারে তাকে যথাযথ সাহায্য করতে হবে। চিকিৎসার প্রথম থেকে শুরু করে চিকিৎসাকালীন পুরো সময়টিতে সজাগ থাকতে হবে। রোগীদের একটা রুটিনে চলে আসতে হবে। প্রতিবার খাওয়ার পরে ব্রাশ করতে হবে এবং ফ্লস দিয়ে ফ্লসিং করতে হবে। সাধারণত দুপুরে খাওয়ার পর এবং রাতে ঘুমতে যাওয়ার আগে ফ্লসিং করাটা জরুরী। এতে মাড়ির সমস্যা ও দাঁতের ক্ষয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। যারা আলাদা এপ্লায়েন্স ব্যবহার করেন তাদের প্রতিবার খাওয়ার পর ফ্লস করতে হবে। টুথপেষ্টটি যে ফ্লোরাইড থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা রোগৃদের ইন্টার ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করতে বলি। মুখে ব্রেস ব্যবহার করার কারণে যেসব জায়গায় ফ্লস পৌছায় না সে সব জায়গায় ইন্টার ডেন্টাল ফ্লস সহজে প্রবেশ করিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা হয়। অতিরিক্ত চিনি জাতীয় খাবার এবং চিনি জাতীয় কোমল পানীয় ডেন্টাল প্লাকের অন্যতম কারণ। রোগীদের এগুলো পরিহার করতে হবে। এগুলো খেলে অবশ্যই ব্রাশ, ফ্লস ও মাউথ ওয়াস ব্যবহার করবে।

ডেন্টাল চেয়ার : সেকাল একাল

ফ্রেন্ডলি ফুডঃ লো এসিড কন্টেনিং ফুড-গাজর, শশা, লেটুস, বিট, কলা, আখ, আঙ্গুর, দুধ, মাংস, সিফুড, পাস্তা। তবে সব সময় নরম করে রান্না করে (মাংস মাছ) ছোট ছোট টুকরা করে খাওয়া ভালো। হাই এসিড কন্টেনিং ফুডঃ আপেল, চেরি, কমলা, টমেটো, পিচ, আনারস, আচার, সফট ড্রিংস, ফ্রুট জুস, ভিনেগার দেওয়া সালাদ, বিবিকিও সস, সালসা। কিছু খাবার আছে যা ব্রেসকে লুস করে দিতে ও ভেঙ্গে দিতে পারে। অথবা তার বেঁকে যেতে পারে। ব্যান্ড খুলে আসতে পারে। শক্ত, আঠালো খাবার খাওয়া যাবে না। (বাদাম, চুইংগাম, বরফ, চিপস, চকলেট) নখ কামড়ানো, পেন্সিল কামড়ানো। ব্রেসেস খুলে গেলে, ব্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হলে এগুলোর জন্য এক্সট্রা ট্রিটমেন্ট ও টাইম লাগে। ব্রেস ভেঙ্গে গেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে। মনে রাখতে হবে একটু সতর্ক হলে সমস্যা এড়িয়ে আপনিও পেতে পারেন সুস্থ্য ও সুন্দর দাঁত, সুন্দর হাসি যা আপনার ব্যক্তিত্বকে করবে আকর্ষণীয়। আপনি থাকবেন আত্মবিশ্বাসী। ক্লোরোহেক্সিডিন মাউথ ওয়াস, ফ্লোরাইড যে সব দাঁত ক্ষতিগস্ত হতে শুরু করেছে তার জন্য ০.৫ পারসেন্ট সোডিয়াম ফ্লোরাইড মাউথ ওয়াস, ফ্লোরাইড পেষ্ট অথবা ২% ফ্লোরাইড রিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

দাঁতের চিকিৎসা এবং কিছু কথা।

ডাঃ মো:মোখলেছুর রহমান শোয়েব, ব্যাচ-৪৪, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

দাঁত ও মুখের চিকিৎসায় বর্তমানে এক মূর্তিমান আতংকের নাম হাতুড়ে দন্ত্য চিকিৎসক। যারা বিভিন্নভাবে সমাজের মানুষকে প্রতারিত করে বিপুল টাকা আয় করছে অন্যদিকে চিকিৎসার নামে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে মুখের ক্যান্সারসহ অন্যান্য জীবনঘাতী রোগব্যধির দিকে। একজন ডাক্তার হিসেবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সতর্ক করা আমার দায়িত্ব হিসেবে মনে করি। মূলত আমরা সাধারণত অবচেতনভাবে সচেতন। যার ফলে সচেতনভাবেই আমরা প্রতারণার শিকার হচ্ছি। প্রতারণার কবল থেকে বাঁচতে হলে প্রথমেই আমাদের চিনতে হবে কে প্রতারণা করছে? আমি খুব কাছ থেকে এরকম কিছু ভুয়া ডাক্তার দেখেছি যাদের কর্মকাণ্ড যথারীতি ভয়াবহ। আসুন আমরা জেনে নেই আসলে এরা কারা? রাস্তার অলিতে গলিতে অনেক সময় বিস্তৃত হাসি দিয়ে দাঁতের ছবিসহ সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। যেখানে বড় বড় করে লেখা থাকে "এখানে দাঁতের যাবতীয় সব চিকিৎসা করা হয়" সাথে আরো লেখা থাকে,"নাক কান ফোঁড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে"।
ডিএমডিটি, ডিডিএ, সিডিএস, ডিডিটিসহ আরো নানান ধরনের অজানা ডিগ্রী জুড়ে দেয়া থাকে ডাক্তারের নামের সাথে। যেখানে একমাত্র বিডিএস (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ডিগ্রী ব্যতীত অন্য কারোরই দাঁতের চিকিৎসা দেবার নীতিগত কিংবা আইনগত কোনো অনুমতি নেই। শুধুমাত্র বিডিএস ডিগ্রী কি জিনিস এটা না জানার কারণেই অনেক শিক্ষিত সচেতন মানুষও ভুল করে এসব ভুয়া ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়ে আর্থিক ক্ষতিসহ মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে নিজেদের জীবন। দাঁতের চিকিৎসায় একজন রেজিস্টার্ড ডেন্টিস্টের দক্ষতা যেমন জরুরি তেমন জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির জীবানুমুক্ত করণ। সাধারণত একজন ডেন্টিস্ট যে জ্ঞান অর্জন করে তার ধারে কাছে একজন হাতুড়ে দন্ত চিকিৎসকের যাওয়া সম্ভব নয়। এসব হাতুড়ে চিকিৎসকদের শিক্ষার দৌড় সর্বোচ্চ এসএসসি পর্যন্ত, অনেকের হয়তো তাও নেই। এরা বিভিন্ন সময়ে হয়তো কোনো ডেন্টিস্টের চেম্বারে কিংবা ডেন্টাল কলেজে ডাক্তারদের যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেবার কাজ করেছে। তারপর কোনো ধরনের বৈষয়িক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেয় শুধুমাত্র চোখের আন্দাজকে পুঁজি করে নিজেই একটা চেম্বার দিয়ে দাঁতের ডাক্তার সেজে বসে থাকে। সাত-পাঁচ বুঝিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে রোগীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়াটাই যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেসব জিনিসপত্র শুধুমাত্র একবার রোগীর মুখে ব্যবহার করেই ফেলে দিতে হয় সেগুলোও পানি দিয়ে ধুয়ে বারবার ব্যবহার করছে এসব ভুয়া হাতুড়ে ডাক্তাররা। তাছাড়া যেসব যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্তকরণের মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহার করা যায় সেগুলোই

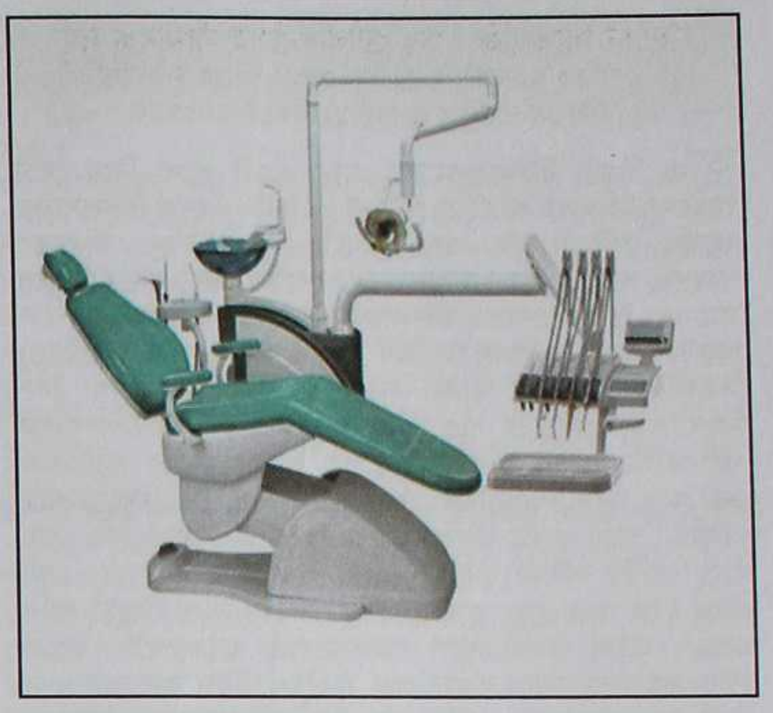

যথার্থ জীবানুমুক্ত না করেই রোগীর মুখে সর্বদাই ব্যবহার করে যাচ্ছে এসব ডাক্তার নামধারী অসাধুচক্র। যার ফলে একজন থেকে অন্য জনে সহজেই ছড়িয়ে পড়ছে হেপাটাইটিস, জন্ডিস, এইড্স সহ আরো অন্যান্য জীবনঘাতী রোগের জীবাণু। এতে করে সামান্য সচেতনতার অভাবে এসব ভুয়া চিকিৎসকের চিকিৎসা নিয়ে অনেকেই মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। সুতরাং দাঁত ও মুখের বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক এবং সঠিক চিকিৎসা পেতে হলে একজন বিডিএস ডাক্তারের কাছে গিয়ে চিকিৎসা নিন। দাঁত ও মুখের চিকিৎসায় একজন বিডিএস ডাক্তারই বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। বিডিএস ডাক্তার ব্যতীত অন্য কাউকে দাঁতের চিকিৎসক ভেবে প্রতারিত হবেন না।

সকল ডেন্টিস্টই ডাক্তার, কিন্তু সকল ডাক্তার ডেন্টিস্ট নয়

ডাঃ সামিয়া ইসলাম সোমা, ব্যাচ-৪৫, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ

সারা বিশ্বে dentistry যেখানে এক নাম্বার পেশা হিসেবে গণ্য হয়,আমাদের দেশে সেখানে এক জন ডেন্টাল স্টুডেন্টকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত অনেকে প্রশ্ন করেন-'তুমি কি S.S.C. পাশ করে সরাসরি এই course এ ভর্তি হয়েছ? "চার বছর ধরে, চারটা prof দাও, শুধু দাঁত নিয়ে এত কি পড়?' ঢাকা ডেন্টাল কলেজ-সরকারী নাকি? এটা আবার কোথায়? 'তাদেরকে বলছি, হ্যাঁ আমরাই সেই হতভাগা ডেন্টিস্ট নামক ডাক্তার যারা ৪ বছরে ৪ টা প্রফ পাশ করার জন্য অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, যারা আপনার মুখ ও দাঁতের মত ছোট জিনিসের চিকিৎসা করার জন্য মেডিকেলের+ডেন্টালের বইগুলো পড়ে, যেখানে মিলি মিটারের হিসাব কেউ ধরেই না, একজন ডেন্টিস্ট সেই মিলি মিটার নিয়ে কাজ করেন। তিন রাত ব্যথায় কাতর কোন আন্টি এসে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হওয়ার পরে যখন বলেন-"তিন তিনটা বাচ্চার জন্ম দিছি, কিন্তু দাঁতের ব্যথার মত এত কষ্ট পাইনি"। তিনিই তখন বুঝেন ডেন্টিস্টের মর্যাদা। বিয়ের পিড়িতে বসে লাজুক হাসিমুখে কোন তরুণী/নতুন চাকরিতে প্রবেশ করা বসের সামনে তৈলাক্ত হাসিমুখে কোন তরুণ যখন বলেন- "আঁকাবাঁকা দাঁতগুলো সোজা হয়ে গেছে, এখন আমি প্রাণখুলে হাসতে পারি"- তিনিই বুঝেন ডেন্টিস্টের মর্যাদা। ছোট্ট বাচ্চারা ডেন্টিস্টকে ভয় পায়, তার পরেও কোন বাচ্চা যখন বলে- "আমি বড় হয়ে ডেন্টিস্ট হতে চাই"। তখন ভাল লাগে। ষাটোর্ধ কোন বৃদ্ধ চাচা যখন বলেন, "আহ, আলগা দাঁত লাগায় নিয়ে কতদিন পরে মাংস দিয়ে ভাত খাইলাম"। তিনিই বুঝেন দাঁতের ডাক্তার কি। দীর্ঘদিন মুখের ক্যান্সারে ভোগা কোন মানুষ যখন চিকিৎসা নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন। তিনিই বুঝেন, Who is dentist।

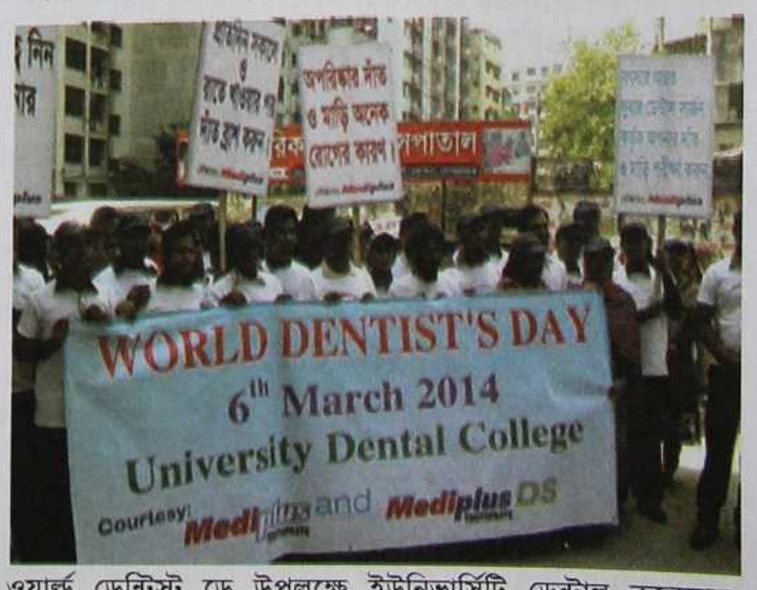

ওয়ার্ল্ড ডেন্টিস্ট ডে উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীদের শোভাযাত্রা

হিস্টোপ্যাথলজি : শুধু রোগনির্ণয়েই সীমাবদ্ধ নয়

ডাঃ সৌমিত্র চক্রবর্তী, সম্পাদক,হেলথ-জিরো টু ইনফিনিটি
এমডি রেসিডেন্ট (প্যাথলজি), বিএসএমএমইউ

আজ লিখছি চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন একটি শাখা নিয়ে যেটা আমজনতার কাছে পরিচিততো নয়ই, এমনকি অনেক চিকিৎসকের কাছেও যেটি অস্পষ্ট। অথচ শাখাটি যে খুব নতুন, তা নয়। প্রয়োগও যথেষ্ট। জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নে শাখাটির গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রের এই শাখাটির নাম হিস্টোপ্যাথলজি।

হিস্টোপ্যাথলজির আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় 'কোষকলার (tissue) বিকারবিদ্যা'। অর্থাৎ বিভিন্ন অসুখে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় কিংবা শারীরবৃত্তীয় যে পরিবর্তনগুলো ঘটে তার সাথে কোষকলার পরিবর্তনের সম্পর্ক স্থাপন করাই এর কাজ। কালের পরিক্রমায় এটা আর হিস্টোপ্যাথলজির একমাত্র কাজ নয়, সে ব্যাপারে পরে আসছি। আগে একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি। ধরা যাক, রোগীর লসিকা গ্রন্থি (lymph node) ফুলে গেছে। সেই সাথে তার আছে জ্বর, প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে। সাথে কিছুটা কাশি আছে। এটুকু তথ্য পেলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো চিকিৎসক সবার আগে যক্ষার কথা ভাববেন। কিন্তু আসলেই যক্ষা কিনা তা নিশ্চিত হতে হলে বেশ কিছু পরীক্ষা করা প্রয়োজন। রক্তের রুটিন পরীক্ষা এবং বুকের এক্সরে থেকে কিছুটা হদিস মিলবে,এমটি টেস্টও খানিকটা সাক্ষ্য দিতে পারে, কাশির সাথে যদি কফ (sputum) বের হয় তখন সেখানে যক্ষার জীবাণু খুঁজে দেখা যেতে পারে। তবে ওই লসিকা গ্রন্থি কেন ফুলেছে তা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে গেলে হিস্টোপ্যাথলজির বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে রোগীর বর্তমান চিকিৎসক রোগীর ওই ফুলে ওঠা লসিকা গ্রন্থি কেটে পাঠাবেন আরেকজন চিকিৎসকের কাছে। সেই চিকিৎসক হলেন হিস্টোপ্যাথলজিস্ট। তিনি তখন সেই লসিকা গ্রন্থিটি অণুবীক্ষণের নিচে পরীক্ষা করে বলবেন, ঘটনা আসলে কী। যক্ষাতো নাও হতে পারে, যদি লিম্ফোমা (এক ধরনের ক্যান্সার) হয়? তখন তো পুরো ব্যাপারটাই পাল্টে যাবে! যক্ষার চিকিৎসা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে লিম্ফোমার চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

অনেক সময়ই এমন হয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও রোগের কোনো কূল-কিনারা করতে পারছেন না, সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও এমন কিছু পাচ্ছেন না, যা তাকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে চিকিৎসা শুরু করতে সহায়তা করতে পারে। এটা কিন্তু ঐ বিশেষজ্ঞের অদক্ষতা নয়, বরং প্রকৃতি যে কত বিচিত্র হতে পারে, তার প্রমাণ। এরকম ক্ষেত্রে যদি কোনো কোষকলা পরীক্ষা করে রোগের সুরাহা করার কোনো সম্ভাবনা থাকে তখনই ডাক পড়ে হিস্টোপ্যাথলজিস্টের। তাই হিস্টোপ্যাথলজিস্টকে বলা হয় 'কনসালট্যান্ট অব দ্যা কনসালট্যান্টস'। চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য শাখার বিশেষজ্ঞের ক্লায়েন্ট হলো রোগী, কেননা রোগীরা সরাসরি ওই বিশেষজ্ঞের চেম্বারে যায়। কিন্তু একজন হিস্টোপ্যাথলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ক্লায়েন্ট হলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য শাখার বিশেষজ্ঞরা, কেননা তাঁরা যখন বিশেষজ্ঞ মতামত চান তখনই কেবল রোগী বা রোগীর কোষকলার নমুনা হিস্টোপ্যাথলজিস্টের কাছে যায়। এজন্য হিস্টোপ্যাথলজিস্টকে মেডিসিন-সার্জারি-গাইনির প্রায় সমস্ত রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয়, কারণ তাকে মূলত জবাবদিহি করতে হয় একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে, যার কাছ থেকে রোগী বা তার কোষকলা তার কাছে পরীক্ষার জন্য এসেছে। তাই হিস্টোপ্যাথলজিস্টের কাছে পাঠানোর সময় রোগীর যাবতীয় ইতিহাস, আগের পরীক্ষার রিপোর্টসমূহ এবং চিকিৎসার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কেননা একজন হিস্টোপ্যাথলজিস্ট সেখান থেকে রোগীর রোগনির্ণয় শুরু করেন, যেখানে অন্যরা থেমে গিয়েছেন। তাই আগের সমস্ত ঘটনা জানাটা সঠিক রোগনির্ণয়ের পূর্বশর্ত। ব্যাপারটা এমন নয় যে, আগের রিপোর্ট বা ইতিহাস জানা থাকলে হিস্টোপ্যাথলজিস্ট biased হয়ে যাবেন। বরং তা না জানা থাকলে রোগীর ভোগান্তি বাড়বে বৈ কমবে না। চিকিৎসকের চেম্বারে আস্ত রোগীটা যায়, কিন্তু হিস্টোপ্যাথলজিস্টের কাছে আসে স্রেফ তার দেহের টুকরো! এমনকি অনেক চিকিৎসকের ধারণা, অণুবীক্ষণের নিচে দেখলে সব রোগ ফিলিপস বাতির মতো ফকফকা হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। হিস্টোপ্যাথলজির মানসম্পন্ন পাঠ্যবইগুলোতে বলা হয়েছে, রোগীর রোগের এবং চিকিৎসার পূর্ণ বিবরণ না পাওয়া গেলে একজন হিস্টোপ্যাথলজিস্টের অধিকার আছে রিপোর্ট স্থগিত রাখার, এমনকি চাইলে তিনি রোগীর টিস্যু-নমুনা গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। বাংলাদেশে হিস্টোপ্যাথলজিস্টদের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয়,তা মোটামুটিভাবে পরীক্ষাগার এবং শ্রেণীকক্ষে সীমাবদ্ধ। তবে বহির্বিশ্বে চিত্রটি এমন নয়। সেখানে শুধু রোগনির্ণয় এবং পাঠদান কিংবা গবেষণা মাত্র নয়,হিস্টোপ্যাথলজিস্টের দায়িত্ব পুলিশি তদন্তে মেডিকেল এক্সপার্ট হিসেবে ময়নাতদন্ত করা ও মতামত দেওয়া (medicolegal autopsy) থেকে শুরু করে হাসপাতালে রোগী মারা গেলে তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানপূর্বক (medical autopsy) চিকিৎসায় কোনো গাফিলতি ছিল কি না-তার সুলুক সন্ধান করা পর্যন্ত বিস্তৃত। হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবাদাতাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যে ক্লিনিক্যাল অডিট হয়, সেখানে হিস্টোপ্যাথলজিস্ট বিশেষজ্ঞ মতামত দেন। মোটকথা, হিস্টোপ্যাথলজিস্টের দায়িত্ব শুধু রোগনির্ণয়কারী (diagnostitian) থেকে বিস্তৃত হয়ে চিকিৎসাসেবার মান নিয়ন্ত্রকের (quality controller) পর্যায়ে চলে যায়। অবশ্য যদি শুধু রোগ নির্ণয়ের কথা ধরা যায়, সেদিক থেকেও হিস্টোপ্যাথলজিস্টদের কাছে চিকিৎসকদের প্রত্যাশাও বাড়ছে। উন্নত বিশ্বে একজন কনসালট্যান্ট যখন তার কোনো রোগীর ব্যাপারে হিস্টোপ্যাথলজিস্টের পরামর্শ নিচ্ছেন, তখন আর শুধু রোগের নাম (diagnosis) জেনে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, সেই রোগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাগ (classification) থেকে শুরু করে রোগটির সম্ভাব্য পরিণতি (prognostication) প্রতিটি রোগীর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা-পরিকল্পনার (individualized/targeted Therapy) কথা আশা করছেন হিস্টোপ্যাথলজিস্টের রিপোর্টে। অর্থাৎ হিস্টোপ্যাথলজি আর কেবল paraclinical বিষয় নয়, বরং Clinical বিষয় হয়ে উঠেছে। কেননা, কোন চিকিৎসা কোন রোগীর জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, সেটাও বলে দিতে হচ্ছে হিস্টোপ্যাথলজিস্টকেই। হিস্টোপ্যাথলজিস্টের দায়িত্বের এতো বিস্তৃতি ঘটার কারণে এখন উন্নত বিশ্বে এই শাখাটির অনেক উপশাখা (subspeciality) সৃষ্টি হয়েছে। যেমন: Dermatopathology, Neuropathology, Forensic Pathology ইত্যাদি। অত দূরে যাই কেন, আমাদের দেশেও মাত্র কয়েক দশক আগে Hematology (রক্তরোগবিদ্যা) হিস্টোপ্যাথলজির Allied Subject ছিল, এখন রীতিমতো পৃথক একটি ক্লিনিক্যাল বিষয়।

হিস্টোপ্যাথলজিস্ট হতে চান? খুব ভালো কথা। কারণ এই পেশাটি যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের সাথে সময় কাটানো, গবেষণা বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়, যেটা চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্য অনেক শাখায় খুব মুশকিল। বাংলাদেশে দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করা যায়: MD এবং FCPS। হিস্টোপ্যাথলজিস্ট হতে চাইলে এর অন্তত একটি অর্জন করাই যথেষ্ট। বর্তমানে MD ডিগ্রিটি বাংলাদেশে দিয়ে থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও এটি হিস্টোপ্যাথলজির উপরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, তবু ঐতিহাসিক কারণে এর নাম এখনো MD in Pathology; যদিও হওয়া উচিত ছিল MD in Histopathology। এই MD in Pathology রেসিডেন্সি কোর্সের মেয়াদ চার বছর। আর এবিষয়ে BCPS কর্তৃক প্রদত্ত FCPS ডিগ্রিটি অবশ্য FCPS in Histopathology হিসেবে পরিচিত এবং এর পাঠ্যক্রম রেসিডেন্সি কোর্সের অনুরূপ। হিস্টোপ্যাথলজিতে বাংলাদেশে প্রাপ্ত ডিগ্রিগুলো ভারত, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কমবেশি স্বীকৃত এবং সেসব দেশে হিস্টোপ্যাথলজিস্টের চাহিদাও কম নয়। তবে পৃথিবীর সব দেশে সমানভাবে স্বীকৃত ডিগ্রিগুলোর একটি হলো FRCPath, যেটি বিলেতের Royal College of Pathologist দিয়ে থাকে।

অফট্র্যাক

Dr. Irfan Alam, Batch-46,
CMC, OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY SPECIALIST

শেষ একটা মাস গেছে অসাধারণ ব্যস্ততায়। ব্যাংকক ট্রিপের পর সন্ধানী কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলনে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে। মাঝে একটা দিনের বিশ্রাম; ক্লান্তি কাটানোর জন্য কক্সবাজার শামিম-টুটুল-রিয়াসাত-আনসারদের সাথে। কক্সবাজার থেকে সবাই ফিরলো চট্টগ্রামে আর আমি বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এক্সরের কনসালটেন্ট EHS Advisor হিসেবে একটা পার্টটাইম প্রজেক্টে ঢাকায়। বন্ধুদের বাস যখন চট্টগ্রামের পথে তখন হঠাৎ করেই মনে হলো আলাদা গন্তব্যের ব্যাপারটা কেমন যেন সিম্বলিক। "So, Irfanul; What made you choose this uncertain course over a secured career in clinical track?"

"The versatility of it's own kind, i guess. And the challenge of achieving success & perfection at any level"-আমার সোজা উত্তর ছিলো GlaxoSmithKline এর OHS Director এর প্রশ্নের। ব্যস, হয়ে গেলো। সবকিছুর ঠিক থাকলে, আগামী মাসে জয়েন করতে যাচ্ছি GSK Bangladesh এ Occupational Health & Safety Specialist হিসেবে। গ্লোবাল অপরচুনিটি আর লং টার্ম বেনিফিট হিসেব করলে GSK বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ব্র্যান্ডের একটা। কিন্তু? প্রশ্ন থেকে যায়, আমার অস্থিরতায় ভরা ট্র্যাক রেকর্ড হিসেবে রাখলে। ইন্টার্ন করার সময়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সার্জারিতে ক্যারিয়ার করব। সার্জারী ইউনিট-০৩ তে আমাকে নিয়েছিলেনও স্যারেরা। কিন্তু হঠাৎ করেই একটা টার্ন সুরেলাকণ্ঠী তাহমিনা শফিকের ফোন কলে সব ওলটপালট। সান্তোস বাংলাদেশ ও ইন্টারভিউ দিতে ঢাকায় গেলাম। ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেক ধরনের প্র্যাকটিকাল ম্যানেজমেন্ট সিনারিও ফেস করতে হয়েছিল। দেখলাম সন্ধানীতে কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সবটাই এখানে প্রযোজ্য। আমার আত্মবিশ্বাস দেখে সান্তোসের International Advisor টেরি মারটিনসেন জিজ্ঞেস করলে, "How did you prepare Yourself for this interview?" আমি হাতের ফোল্ডারটা দেখিয়ে উত্তর দিলাম, "Nothing special, I went to the market, bought this folder, then put all my certificates here & just came in." এই উত্তরে যা বুঝাতে চেয়েছিলাম সেটা হলো এই ইন্টারভিউ'র জন্য আমার প্রিপারেশান লাগে না।

এই উত্তরে হতভম্ব টেরি এরপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "It's a pleasure to meet you, sir." এভাবেই পথচলা শুরু EHS এ। এক বছর কাজ করেছি Santos Banglsdesh Drilling Campaign ২০১১-১২। আক্ষরিক অর্থেই বহুজাতিক (প্রায় ৯-১০ জাতির) একটা দলের কোর মেম্বার হিসেবে। প্রতিদিনই এখানে নতুন অভিজ্ঞতা, প্রতিদিনই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ, নতুন করে কিছু শেখা আর নিজের মান আরো একটু উঁচুতে নিয়ে যাওয়া। আমাদের প্রজেক্ট EHXZ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্যে সান্তোসের CEO Global Execellence Award জিতে ২০১২ সালে। এরপর সান্তোসের সাঙ্গু অপারেশন্সে ইউ.কের WGPSN এ। মজার ব্যাপার হচ্ছে সাঙ্গু অপারেশন্সের EHS টিমে সি.এম.সিয়ান ছিলেন তিনজন। আমি নিজে (৪৬তম), জীবনময় দা (৩১তম) আদীব ভাই (২৮তম)। আদীব ভাই এখন WGPSN Avi Woodside এর পার্থ প্রজেক্টে EHS হিসেবে আছে মাঝে Occupatiojnal Safety & Health এর গ্লোবাল কোয়ালিফিকাশান NEHOSH IGC শেষ করেছি। এই সাবজেক্টটা আমাদের দেশে একবারেই নতুন বলা যায়। অকুপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নত বিশ্বে চর্চিত হয় বহু আগে থেকেই। এর সাথে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট একীভূত থাকে-একসাথে বলা হয় এনভায়রনমেন্ট, হেলথ এন্ড সেফটি। কখনো কখনো এর সাথে সিকিউরিটি অথবা সাসটেইনিবিলিটি যোগ করা হয়।

আমরা এখানকার মাল্টি ডাইমেনশনাল একটা টিমের কোর ম্যানেজমেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকি। এর বাইরেও যে কোন রকম মেডিকেল ইমার্জেন্সিতে ফার্ষ্ট রেসপন্স টিমের লিডার হিসেবে কাজ করতে হয়। এটা নর্মাল ক্লিনিক্যাল ট্রাকের চাইতে তাই অনেকটাই আলাদা। অফশোর অপারেশান্স সব সময় তার নিজস্ব স্বকীয়তার কারণেই খুব ঝুঁকিপূর্ণ এবং আলাদা গুরুত্ব বহন করে।

২০১১-১২ সান্তোস বাংলাদেশ ড্রিলিং প্রজেক্টে কাজ করা সময় প্রথম ব্যাংকক যাই BOSIET(Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training) করতে। এই ট্রেনিং অফশোর প্রজেক্টে কাজ করার অন্যতম পূর্বশর্ত বলেই বিবেচিত হয়। ব্যাংককের নাইটলাইফ স্বভাবতই অসাধারণ আর বর্ণিল। কিন্তু রাত ২-৩টা পযর্ন্ত ঘুরাঘুরির পরে ঠিক ভোর ০৬টায় ব্রেকফাষ্ট আসলে আনন্দদায়ক মনে হয় না। তার উপর মাথা হ্যাং হয়ে ছিলো সারাদিনের শিডিউল শুনে আগে থেকেই। সকাল ০৭টায় HUET (Helicopter Underwater Escape Training) এর থিওরিটিক্যাল পার্ট। ইন্সট্রাকটর এক ইন্দোনেশিয়ান নেভি কম্যান্ডো। ব্যাটার ক্লাশে ঢুকে দেখি ফার্ষ্ট বেঞ্চ ছাড়া আর কোন সিট ফাঁকা নাই। কি আর করা. বসেই পড়লাম সামনের সারিতে। শুরুতে পরিচয় পর্ব। এরপর HUET আর এর বেসিক প্রিন্সপাল নিয়ে আলোচনা শুরু হতে না হতেই আমি. "ঘ্র..." দুনিয়াদারি ভেঙ্গে আমার চোখে ঘুম নামছে। কিছুক্ষণ পরেই ইন্সট্রাকটর হুঙ্কার ছাড়ল, "জেন্টলম্যান, প্লিজ হ্যাভ আ কফি ব্রেক"। ডাবল কফি সাবড়ে আসার পরেও সেই একই দশা। অবস্থা বেগতিক দেখে আমাকে পানিশমেন্ট দিয়ে সবার আগেই পাঠিয়ে দিল পুল এক্সারসাইজে। সব মিলিয়ে মোট ০৮টা এক্সারসাইজ। পুলের পানির তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি। নামতেই আমার চোখ থেকে ঘুম উধাও। একটা চপারের প্রোটোটাইপ পুলের উপর আছে যেটা মোটর অপারেটেড এবং দরকারমত ৩৬০ ডিগ্রি ক্যাপসাইজের সিনারিও রান করা যায়। এসকেপ ব্রিদিং সিষ্টেম একটিভেট করতে শিখিয়ে দেয়া হল। এসকেপ ব্রিদিং সিষ্টেম মূলত নিজের এক্সহেলড কনজিউম করে পানির নিচে ১০-১৫ মিনিট বেঁচে থাকার একটা যন্ত্র। বলে দেয়া হল, চাইলেও কেউ মরতে পারবে না; দুইজন ডাইভার সব সময় পাশে থাকবে এবং সম্পূর্ণ শাস্তি (!) নিশ্চিত করতে। যতক্ষণ না পুরোপুরি নিখুঁতভাবে শেষ হচ্ছে করতেই হবে। শেষের দিকে যথেষ্ঠ পানি খাওয়ার পরে অনুরোধ করেছিলাম, এই বারের মতন ছাড়া যায় কিনা বিবেচনা করতে। ব্যাটারা উত্তর দিলো ছাড়তে পারবে কিন্তু HUET সার্টিফিকেট দিবে না। ২ ঘন্টা পর যখন পুল উঠালাম তখন আমি চোখে ঘোলা দেখছিলাম, হাঁটতে জোর পাচ্ছিলাম না। কিন্তু জীবনে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা ছিলো সেটি। সব কিছু বাদ দিলেও একটা প্রশ্ন যেটার উত্তর আমাকে সবচে বেশি দিতে হয়। সেটা হচ্ছে কেন ডাক্তারী ছেড়ে এই ট্র্যাকে। সন্ধানী করার সময় থেকেই আমার ভালো লাগতো এডমিনিসট্রেটিভ কাজকর্ম করতে; মানুষ জনকে দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করতে; প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে-সর্বোপরি পলিসি মেকিং এন্ড পলিসি ম্যানেজমেন্টে আমার উৎসাহ ছিলো সবচেয়ে বেশি সেটাই আমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলা এই ইন্ডাষ্ট্রিতে ভিত্তি গড়তে; নিজেকে একজন Health & safety Professional হিসেবে গড়ে তুলতে। যারা আমার মত এই গ্লোবাল সাবজেক্টে ক্যারিয়ার করতে চান তাদের একটা জিনিস জেনে রাখা খুব প্রয়োজন। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন ভালো ক্লিনিশিয়ানের প্রয়োজনীয়তা বা গ্রহণযোগ্যতা অনেক অনেক বেশি। পুরোপুরি নন ক্লিনিক্যাল এবং অফট্র্যাকের এই পেশার আসতে চাইতে শুরু সাহস থাকলে কাজ হবে না। যেটা প্রয়োজন হবে সেটা পুরোপুরি দু:সাহস। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও ভবিষৎ সম্ভাবনা বিবেচনা করলে এই সাজেক্টের সম্ভবনা খুবই ভালো। একটা ড্র-ব্যাক আছে যেটা না বলে পারছি না। আপনার অনট্র্যাকের বন্ধুরা পোষ্টগ্রাজুয়েশন শেষ করে অ্যাসিষ্ট্যান্ট-অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হবেন তখন আপনি হয়তো EHS Advisor/ Manager হিসেবে কিউবা, সেন্ট্রাল আফ্রিকা কিংবা অষ্ট্রেলিয়ায় অফশোর কোন অপারেশান্সে কাজ করছেন। কেউ যদি যথেষ্ঠ পরিমাণে হোমসিক হয়ে থাকেন বা গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানোর চ্যালেঞ্জ এক্সেপ্ট করতে না পারেন তবে এমুখো না হওয়াই ভালো। MPH বা মাষ্টার্স ইন পাবলিক হেলথ নি:সন্দেহ একটি ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড এই ট্র্যাকে আসার জন্য। কাজগুলো মূলত অন জব ট্রেনিং এর উপর নিভরর্শীল। EHS Management System এ মূলত স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন ইন্ডাষ্টিয়াল প্ল্যান্টে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গঃ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ডাঃ এম আমির হোসেন, নিউরোলজি বিভাগ,বিএসএমএমইউ

স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাঝে মধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয় আমার। নীতিনির্ধারকগণ আমাদের সুন্দর সুন্দর কথা বলে নসিহত করে থাকেন। 'সেবার মানসিকতা নিয়ে আপনাদের কাজ করে যেতে হবে' এই কথাটি তাঁরা প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু এই কথাটির মানে আসলে কী? মহামান্যগণের শ্রুতি মধুর এই কথা শুনে আমরা কি পরবর্তী দিন থেকে সেবামূলক মানসিকতায় আপ্লুত হতে থাকবো? রোগীদের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে দৈনিক ২০ ঘন্টা সার্ভিস দিতে থাকবো? আসলে 'সেবার মানসিকতা' কল্পিত রোম্যান্টিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেবা প্রদানের পদ্ধতি যদি আধুনিক ও যুগোপযোগী না হয় সেবার মানও যুগোপযোগী হবে না।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসক রয়েছেন। শতকরা আশি ভাগ লোকের চিকিৎসা দেন গ্রাম-চিকিৎসক, ডিপ্লোমা চিকিৎসক, বংশগত চিকিৎসক (যাদের দাদা-বাবা-ছেলে সবাই চিকিৎসক), হোমিও চিকিৎসক, আয়ুর্বেদি চিকিৎসক ও ওষুধের দোকানদারগণ। বাকি বিশ ভাগ লোকের চিকিৎসা দেন এমবিবিএস/বিডিএস ডিগ্রিধারী গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকগণ। আবার এই বিশ ভাগ লোকের অনেকেই পূর্বোক্ত তথাকথিত চিকিৎসকগণ দ্বারা ম্যাল-ট্রিটমেন্ট পেয়ে থাকেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরপরেও এ দেশের অনেক এমবিবিএস চিকিৎসক বেকার জীবন অতিবাহিত করছেন কিংবা স্বল্প বেতনে কোন ক্লিনিকে কাজ করছেন। যে দেশে চিকিৎসকের এতো ঘাটতি সে দেশে মেধার এই অপচয় কেন? কী এর কারণ? চিকিৎসকেরা গ্রামে যেতে চান না কেন?

বাংলাদেশে বর্তমানে যা জরুরী তা হলো, কে কতটুকু চিকিৎসা দিবে তা নির্ধারণ করা বিষয়ক একটি নীতিমালা করা। সামান্য সর্দি-জ্বরের কারণেই কেউ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, আবার কেউ কেউ দোকান থেকেই বিনা প্রেসক্রিপশনে ওষুধ কিনে খান। এর কোনটিই ঠিক নয়। চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় "রেফারেল পদ্ধতি" খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি-বেসরকারি দুটো পদ্ধতি রেখেই রেফারেল পদ্ধতি চালু করা যায়। একজন রেজিস্টার্ড গ্রাম চিকিৎসক কিংবা ডিপ্লোমা চিকিৎসক কিংবা গ্রাজুয়েট চিকিৎসক কতোদূর পর্যন্ত রোগীকে চিকিৎসা দিতে পারবেন তা নির্ধারণ করতে হবে সবার আগে। প্রয়োজন মতো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে রেফার করে চিকিৎসা দিতে হবে। ইমারজেন্সি চিকিৎসার জন্য থাকবে ইমারজেন্সি সিস্টেম।

প্যারাসিটামল, ওআরএস ইত্যাদি প্রাথমিক ওষুধগুলো ছাড়া বাকি ওষুধ রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি হওয়া অনুচিত। তা করলে ওষুধের অপব্যবহারও বন্ধ হবে।

সরকারি চিকিৎসকগণ সরকারি হাসপাতালেই প্র্যাকটিস করা উচিৎ। এবং তাঁদের প্রতিটি রোগী দেখা স্বাপেক্ষে ও অন্যান্য সার্ভিসের জন্য ফি দিতে হবে। সেই ফি রোগীকেই পরিশোধ করতে হবে কিংবা বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন অতি-দরিদ্র) রাষ্ট্র পরিশোধ করবে। প্রাইভেট চিকিৎসকগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন। প্রাইভেট ডায়াগনোস্টিকের চেম্বারগুলো সকাল-সন্ধ্যা দুই শিফটে চালু রাখতে হবে। বাংলাদেশের মতো অধিক জনসংখ্যার দেশে একই স্থাপনা দুই শিফট ব্যবহারের কনসেপ্ট চালু করতে হবে। এতে করে অপ্রয়োজনীয় স্থাপনা তৈরি হ্রাস পাবে।

একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকগণের জন্য হাসপাতালেই রাউন্ড, রোগী দেখা, ছাত্র পড়ানো বাবদ ভাল সম্মানী পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ইন্সটিটিউশনাল প্রাকটিসের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। শিক্ষকগণ যদি কেবল জেনারেল প্র্যাকটিসেই ব্যস্ত থাকেন তবে শিক্ষকতা ও গবেষণার গুণগত মান ব্যাহত হয়। আরও স্পেশালাইজড ইন্সটিটিউট গড়ে তুলতে হবে বিশেষায়িত সেবা প্রদানের জন্য।

রেফারেল পদ্ধতি, রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি নিয়ন্ত্রণ, ইন্সটিটিউশনাল প্র্যাকটিস এবং সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবা প্রদান পদ্ধতির যুগোপযোগী নীতিমালা করলে এমনিতেই সেবার মান উন্নত হবে। সকল শ্রেণীর চিকিৎসক স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভালো অবস্থানে থাকবেন এবং রোগীরাও হয়রানির শিকার না হয়ে সঠিক সেবা পাবেন।

মহামান্যগণ শুধু সেবার মানসিকতা উন্নয়নের ছবক না দিয়ে সেবা প্রদান পদ্ধতি উন্নয়নের পরিকল্পনা হাতে নিলে দেশ-জাতি-চিকিৎসকসহ সবার উন্নয়ন হবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস।

fRaNkLy SpEaKiNg 2

ডাঃ জুবায়ের মাহমুদ খান, ব্যাচ-৪৫, রাজশাহী এমসি,
সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ফরিদপুর, পাবনা

ঢাকায় একটা ট্রেনিং এ এসেছিলাম। আজ কর্মস্থলে যাওয়ার কথা ছিলো কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত যাওয়া হয় নাই। শুনলাম আমার কর্মস্থলের পরিস্থিতিও গরম। বাইরে তাপদাহ আর ভেতরে আত্মার শবদাহ একসাথে চলছে। এর ফাঁকেই উপজেলার সরকারী হাসপাতালকে কিভাবে নিরাপদ কর্মস্থল করা সম্ভব তাই ভেবে দেখলাম,

১. সরকারী স্বাস্থ্যসেবার প্রাণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো। এগুলোর গেট সর্বদা বন্ধ রাখতে হবে এবং তিন শিফটে একসঙ্গে চারজন করে সশস্ত্র আনসার পালাক্রমে পাহারায় থাকবে। তারা রোগী এবং রোগীর সাথে দুইজন করে লোক ঢুকতে দেবে। এবং তারা কর্তব্যরত **EMO** এর অর্ডার পালনে বাধ্য থাকবে। ২. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোর ক্যাম্পাস একটা তথাকথিত দেয়াল দ্বারা ঘেরা থাকে। যে অংশে পুকুর থাকে তার পাশের দেয়ালে মানবসৃষ্ট একটি ফুটো তৈরি করে আশে পাশের মানুষ সেই ফোঁকর গলে কখনো গোসল করে, কখনো বাচ্চার পায়খানা করা ত্যানা (ছোট কাপড়) পরিস্কার করে। এইসব অযাচিত ফুটো বন্ধ করতে হবে।

৩. দেয়ালগুলো এতটাই নিচু যে পাঁচফুটি বাঙালীরাও ঘাড় উঁচু করে দেখতে পারে যে ভিতরে কি হচ্ছে। দেয়ালগুলো উঁচু করতে হবে।

৪. ইমারজেন্সি রুমে একটা ইসিজি মেশিন, একটা নেবুলাইজার, একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার, কিছু স্যালাইন, স্যালাইন দেয়ার নল, ক্যানুলা, মাইক্রোপোর, সেলাই করার সুতা, গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, সিরিঞ্জ, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, লোকাল অজ্ঞানের ওষুধ, ক্যাথেটার, প্রেশারের ওষুধ, ডাইইউরেটিকস, **MI** এর ওষুধ, নেবুলাইজ করার সলিউশন ইত্যাদি সম্পূর্ণরুপে থাকতে হবে। কোনটা আছে, কোনটা নাই, কোনটা কাজ করে না, কোনটা উপরে ওয়ার্ডে আছে ইত্যাদি সমস্যা পরিপূর্ণভাবে দূর করতে হবে।

৫. প্রতিটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুইটি করে সচল **Ambulance** থাকতে হবে এবং এগুলো জেলা সদরে রোগী রেফারে নিয়োজিত থাকবে। উপজেলার **Ambulance** নিয়ে বিভাগীয় হাসপাতালে যাওয়া যাবে না, এই নিয়ম থাকা লাগবে।

৬. ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসারদের ডিউটি আওয়ার চার শিফটে করতে হবে। ৮টা থেকে ১:৩০, ১:৩০টা থেকে ৬:৩০, ৬:৩০টা থেকে রাত ১২টা, রাত ১২টা থেকে সকাল ৮টা

৭. ইমারজেন্সী রুম কিংবা ওয়ার্ডে একটা ইমারজেন্সী বাটন থাকবে। যেটা চাপলে নিরাপত্তা প্রহরীদের কক্ষগুলোতে ঘন্টা বাজবে।

৮. প্রত্যেক ডাক্তারের জন্য একজন করে ব্যক্তিগত পিয়ন দিতে হবে। পিয়নের বাড়ি হতে হবে ঐ এলাকায়।

৯. প্রত্যেক মেডিকেল অফিসারের কিংবা **Assistant Surgeon** এর ক্যাম্পাসের ভেতরে অসদাচরণের জন্য ততক্ষণাৎ সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা থাকা লাগবে। **UHFPO** ও **RMO** দের এই জরিমানার অংক সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার এবং **UHFPO** এর হাতে তিন দিন জেল দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।

১০. ওয়ার্ডে রোগীর ভিজিটরদের পাঁচ টাকার ভিজিটিং কার্ড কিনতে হবে। ভিজিটরের নির্ধারিত সময় থাকবে বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। একজন রোগীর সর্বোচ্চ দুইজন ভিজিটর **Allow** করা হবে।

১১. যতক্ষণ ভিজিটিং আওয়ার থাকবে ততক্ষণ ভিজিটিং কর্নার নামে এক জায়গা থাকবে যেখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা ভিজিটররা রোগী সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানবে। অনেকে হয়তো ভাবছেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি কি না!

Frankly Speaking,স্বপ্নই দেখছি। এই অদ্ভুত সিস্টেমের দেশে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেও সান্ত্বনা পেতে হয়!

মেডিকেল কলেজে সপ্তাহে ৬ দিন ক্লাস কতটা যৌক্তিক?

রজত দাশগুপ্ত, ব্যাচ-৬৬, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হবার। আমার মামা ডাক্তার। আমার খালা ডাক্তার। তাদেরকে মানুষ যেভাবে সম্মান করত একটা জিনিসই ভাবতাম সমাজে আর্থিক এবং সামাজিকভাবে সচ্ছল হতে গেলে চিকিৎসক হতে হবে। একজন চিকিৎসক সৎ ভাবে জীবন যাপন করেও সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারেন। অবশ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি যেভাবে প্রবেশ করেছে সে ক্ষেত্রে এই পেশার ভিতরেও প্রভাব পড়েছে। ছোটবেলা থেকে শুনতাম এখানে অনেক পড়া। কথাটা সত্য। ব্যাপারটা মেনেও নিতে হবে। কারণ আপনি এমন পেশায় প্রবেশ করছেন যেখানে সামান্য ভুল মানে সারাজীবনের কান্না। এই জন্য বাইরে যে কোন দেশে চিকিৎসকের বেতন অত্যন্ত বেশী। কিন্তু বাংলাদেশে জুনিয়র চিকিৎসকদের বেতন অত্যন্ত কম। সেই তুলনায় তাদের কর্মঘণ্টা অযৌক্তিকভাবে অনেক বেশী। অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রায়ই ইউরোপ-আমেরিকার কর্মঘণ্টার উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিকৃত তথ্য দিয়ে আমাদের পশুর মত খাটান। সরকারী খাতে এর কারণ জনস্বল্পতা,কখনো বা কর্তৃত্বপরায়ণতা। বেসরকারী খাতে এর কারণ কম ডাক্তার দিয়ে চালিয়ে বেশি মুনাফা। বস্তুত ইউরোপের সব দেশে রুটিন কর্মঘণ্টা সপ্তাহে ৩৫-৪০ ঘণ্টা এবং ৪০% ওভারটাইম দিয়ে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টা। অথচ বাংলাদেশে সর্বনিম্ন ৪৮ ঘণ্টা করানো হয় বেসরকারী খাতে, যেটা আসলে শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশের শ্রম-আইনে নির্ধারিত কর্মঘণ্টা! আমেরিকায় রেসিডেন্সি সপ্তাহে ৮০ ঘণ্টা হলেও পরবর্তীতে চাকরীগুলো সবই ৪০ ঘণ্টার,এর বেশি হলে ওভারটাইম। আরও শুনতাম এখানে ছুটি নেই। থাকলেও অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম। আসলে বছরে দুটো ঈদ, দুর্গাপূজা এবং সরকারী ছুটির দিনগুলো ছাড়া এখানে আর কোন ছুটি নেই। দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আম কাঁঠালেরও ছুটি আছে। এখানে একেকটা পেশাগত পরীক্ষার পর ভাগ্য নেহায়েত ভালো না থাকলে এক দুই সপ্তাহের বেশি ছুটি পাওয়া যায় না। আজকে সে বিষয়েই দৃষ্টিপাত করতে এই লেখার অবতারণা। বর্তমানে মেডিকেল কলেজগুলোতে রুটিন অনুযায়ী সপ্তাহে ছয়দিন ক্লাস করা লাগে। শুধু শুক্রবার বন্ধ। অন্যান্য মেডিকেল কলেজে কী হয় জানি না আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজের রুটিনটা বলি। ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত টানা ক্লাস। থার্ড থেকে ফিফথ ইয়ারে সকাল ৭ টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত টানা ক্লাস মাঝে ১১ টা থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত গ্যাপ। এরপর সন্ধ্যায় ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত ওয়ার্ড। এইভাবে চলে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার। শুক্রবার বন্ধ। অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলোতেও মোটামুটি একই রুটিন। এই রুটিন অনুযায়ী একজন ছাত্রকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ড করে শুক্রবার পড়াশুনা করে শনিবার আইটেম দিতে হচ্ছে। এরপর শুরু হয় আবার ছয়দিনের চক্র।

১। এর ফলে কোন সৃজনশীল চর্চা না বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে স্টুডেন্টরা সময় দিতে পারে না। ফলে নিভে যায় অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিভা। জীবন্মৃতের মতো তাদের গা ভাসিয়ে দিতে হয় গড্ডলিকা প্রবাহে।

২। শুক্রবার কোন জরুরি কাজে বাসায় যেতে হলেও আটকে যায় তারা।

৩। দেখে যখন অন্য প্রতিষ্ঠানের বন্ধুরা দুইদিন ছুটি পেয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তারপর ভালো সিজিপিএ পেয়ে বের হচ্ছে আর ভালো বেতনে চাকরি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে টানা পড়াশুনা করে কারণে অকারণে ফেল হয় আর বের হয়ে ড্রাইভারের চেয়েও কম বেতনের চাকরী পেয়ে শুরু হয় মানসিক সমস্যা।

৪। অনেকে মনে করেন মেডিকেল স্টুডেন্টরা সারাক্ষণ লেখাপড়া করবে। কিন্তু শুধু লেখাপড়ার ভিতরেই জীবন অতিক্রম করলে বিষয়টা যে একঘেয়ে এবং ভীতিকর হয়ে যায় তা বলাবাহুল্য। প্রফেশনে ভালো করতে হলে জ্ঞানের বিকল্প নেই। কিন্তু এই রুটিনে সেটা হয়ে যায় একঘেয়েমিপূর্ণ।

৫। অনেকে বলতে পারেন সিনিয়ররাও এইরকম রুটিন পার করে এসেছেন তাই জুনিয়রদেরকেও এই রুটিন ফলো করতে হবে। কিন্তু পরিবর্তন অগ্রজদেরকেই নিতে হবে।

৬। একইভাবে সপ্তাহে ছয়দিন কর্মদিবসও যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখতে হবে। ছয়দিন স্টেশনে থেকে পড়াশুনা করা কতটুকু সম্ভব তা ভেবে দেখা উচিৎ। কিন্তু ছাত্র হিসেবে আমার মনে হয় ছয়দিনের জায়গাতে পাঁচদিন একাডেমিক কাজে ব্যবহার হয় অনেক বাস্তবসম্মত। দরকার হলে প্রতিদিন এক ঘণ্টা বেশি ক্লাস হল। কিন্তু দুইদিন ছুটি পাওয়া দেহ এবং মনের জন্য অনেক জরুরি। যেমন বুয়েটেও সপ্তাহে ৫ দিন নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস হয়। তবে টানা ক্লাস হয় না। মাঝে বিরতি থাকে। এরপর তারা দুইদিন সপ্তাহে ছুটি পায়। এর ভিতর তারা এক্সট্রা কারিকুলার কাজ, জিআরই প্রস্তুতি ইত্যাদি নিয়ে থাকে।

৭। এইভাবে ক্লাস যখন একঘেয়েমি পূর্ণ হয়ে যায় তখন শুরু হয় ক্লাস ফাঁকি দেওয়া। এর ফলে সরাসরি ক্ষতি হয় ছাত্রের পরোক্ষ ক্ষতি হয় দেশের।

৮। অনেকে উন্নত দেশের উদাহরণ টানবেন। যে বিলেতের সাথে আমাদের মেডিকেল শিক্ষার কারিকুলামের মিল সেখানকার ইম্পেরিয়াল কলেজের রুটিনঃ http://www3.imperial.ac.uk/ugprospectus/studentprofiles/mervyn/schedule একটু দেখে নিন আর মিলিয়ে নিন আমাদের নিজেদের সাথে। ভারত বাদে পৃথিবীর প্রায় কোন দেশেই মেডিকেল কলেজে ৬দিন কর্মদিবস নেই। আমেরিকায় সপ্তাহে ৫ দিন ক্লাস, ২ দিন ছুটি।

৯। জরুরী সার্ভিসের অংশ হিসেবে হাসপাতালের আউটডোরের মতো মেডিকেল কলেজ ছয়দিন খোলা রাখা অর্থহীন। কারণ সেখানে একাডেমিক কাজ হয়। বেশী দরকার মেডিকেল কলেজের প্যাথোলজি বিভাগ ছয়দিন খোলা রাখা। দরকার হলে দুই শিফটে কাজ দিয়ে প্যাথোলজি বিভাগ বৃহস্পতিবার রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা রাখা যেতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় দুপুর দুইটার পর অনেক জরুরী পুয়োজনে রোগীরা প্যাথোলজি বিভাগে এসে ফিরে যায়। আউটডোর ৫ দিন ৯টা-৫টা পর্যন্ত খোলা রাখাই উন্নত দেশগুলোর রীতি। কিন্তু এটা করলে চেম্বারে রোগী কমে যাবে বলে হয়ত ডাক্তাররাই এ নিয়মে রাজি হবেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে এই রীতি পাল্টানোর চেষ্টা করা উচিত।ইংল্যান্ডে ইমারজেন্সি বা ইনডোর ৭ দিনই খোলা থাকলেও ডাক্তারদের রুটিন কর্মঘণ্টা অধিকাংশ হাসপাতালেই ৪০-৪৮ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ৯টা-৫টা সপ্তাহে ৫ দিন রুটিন, রোটেশন অনুযায়ী নাইট এবং উইকেন্ড ডিউটি- এই হচ্ছে সেখানকার প্যাটার্ন। এর মাঝে অবশ্যই আছে ওভারটাইম যার জন্য বেসিকের ৪০% হারে পে করা হয়।

১০। অনেক চিকিৎসক(সবাই না)নিজেদের দুর্ব্যবহারের কথা উঠলেই ছাত্রজীবনের প্রেশার,ছুটির অভাবের কথা বলে।এটা যেন তারা বলতে না পারে,সেজন্যে রাষ্ট্রের উচিত তাদের রুটিন কর্মঘণ্টা ও সাপ্তাহিক ছুটির পরিমাণ অন্য পেশা ও অন্য বিষয়ের ছাত্রদের অনুরূপ করা। ১ দিন ছুটি বাড়িয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কর্মঘণ্টা করা হলে চিকিৎসকরা দুর্ব্যবহারের পেছনে এই যুক্তি আর দেখাতে পারবেন না।

১১। ইম্পেরিয়াল কলেজের রুটিনে দেখুন- রাতে ওয়ার্ড নেই। সকালেই শেষ। দুই বেলা ওয়ার্ড সময়ের অপচয়। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে সকালের ওয়ার্ডই যথেষ্ট।

১২। দুইদিন ছুটি দিলে সপ্তাহের শেষে স্টেশন লিভ করা যাবে,কাজেই ফাঁকি বা অঘোষিত ছুটির পরিমাণ কমবে। অফিস-টাইম ৮টা থেকে আড়াইটার পরিবর্তে ৮টা-৪টা করা উচিত।

১৩। অনেকেই কারিকুলাম শেষ না হবার অজুহাত দেবেন, সেটা অযৌক্তিক। কারণ এই সিস্টেমে কর্মঘণ্টা সপ্তাহে ১ ঘণ্টা বাড়ছে। কমছে না।

১৪। আমাদের দেশেই এখন NIPSOM, CME, IPH, DG Health, Divisional Director's Office সপ্তাহে ৬ দিন এর বদলে ৫ দিন ৯টা-৫টা চলছে। খুব ভালো ভাবেই কাজ চলছে। মেডিকেল কলেজ শাখাও ৫ দিন ৮টা-৪টা খোলা রাখাই যথেষ্ট।

তাই আমার প্রস্তাবনা মেডিকেল কলেজে সপ্তাহে দুইদিন ছুটি দেওয়া হোক। দরকার হলে সকাল আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া যেতে পারে।তাহলে সৃজনশীল চেতনার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। আর কেউ মানসিক রোগে আক্রান্ত হবে না। নিভে যাবে না সম্ভাবনার আলো। উইকেন্ডে চাইলে ঘুরে আসা যাবে লাউয়াছড়ার বন কিংবা বান্দরবানের পাহাড়। হলে মন না বসলে দুদিনের ছুটিতে ঘুরে আসা যাবে বাড়ি থেকে,দেখে আসা যাবে অসুস্থ মা-বাবাকে। বৃস্পতিবার রাতের পরীক্ষার ক্লান্তি কাটিয়ে দেবে শুক্রবারের বিশ্রাম, মুভি, মিউজিক, বই- আবার শনিবারে ফ্রেশ মনে নেয়া যাবে রবিবার সকালের ৩-৪টে আইটেমের প্রস্তুতি। কেবল ঘরের লাঞ্চ আর চেম্বারের ধান্দায় আটটা-আড়াইটা ৬ দিনের কর্মসপ্তাহ অর্থহীন, ক্লান্তিকর,ক্ষতিকর এবং ফাঁকির অন্যতম কারণ।

প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপ

ডাঃ হাসান মাহমুদ ইকবাল, ব্যাচ-৩৮, চট্টগ্রাম এমসি,
ওএসডি-ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা

প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরিপে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা থেকে লিখছি। মনোহরগঞ্জ কুমিল্লা জেলার পশ্চাতপদ একটি উপজেলা। ১১ টা ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। বেশির ভাগ মানুষ দরিদ্র ও অশিক্ষিত। এখানে জরিপ কার্যক্রমে এসে প্রতিদিন নতুন নতুন অনেক অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে যেন সঞ্চারিত হচ্ছে। একেকটা ইউনিয়ন এ কমপক্ষে ২০০ থেকে ৩০০ জন করে প্রতিবন্ধী মানুষ বসবাস করছে। এদের সবাই জীবন ধারণের নূন্যতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পরিবারের সদস্যরা তাদের নিয়ে হতাশ। আমাদের জরিপে আসার সংবাদে সবাই তীব্র প্রতিযোগিতাতে মেতেছে নিজেদের প্রতিবন্ধী হিসেবে প্রমাণ করতে, উদ্দেশ্য তাতে যদি ভাতা বা কোন ধরনের সাহায্য মেলে। অনেকে প্রতিবন্ধী নয় তবুও তারা প্রতিবন্ধী হতে চায়, চরম দারিদ্র তাদের জীবনকে টেনে নিতে দিচ্ছে না। জীবন ধারণের মৌলিক সুবিধা বঞ্চিত প্রতিবন্ধীদের নিয়ে অতীতে কোন কাজ হয়নি, তাদের কোন পরিসংখ্যানও নেই, আর সেজন্য পুনর্বাসন বলতে তেমন কোন সুবিধাও প্রান্তিক পর্যায়ে অনুপস্থিত। একটি ইউনিয়নে ভাতা পায় ২/৩ জন, যা প্রয়োজনের তুলনায় হাস্যকর। গত একমাস ধরে প্রতিদিন তাদের কাছে এসে একবার করে মন খারাপ হচ্ছে। শহরে বসে বসে আমরা যারা ভাবছি আমরা এখন অনেক উন্নত একটি দেশ তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা এখনও শ্রেণী বিভাজিত অসম অর্থনীতির একটা বৈষম্যপূর্ণ দেশ। চরম দরিদ্রশ্রেণীর মানুষদের মাঝে কাজ করতে গিয়ে আমাদের অর্থনীতির অন্তঃসার শুণ্যতাই আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তবুও সরকারকে ধন্যবাদ জানাই দেরিতে হলেও তারা প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫,১৭,২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম-সুযোগ ও অধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, পিতৃ-মাতৃহীন বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের তফসিলের অংশে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বেকার, অসহায় ও বৃদ্ধ প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অস্বচ্ছল দুস্থ প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও তাদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে সারা দেশে প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম রাষ্ট্র পরিচালনা করছে যদিও এটা প্রয়োজনের তুলনাতে একেবারেই অপ্রতুল। তাই এখন সময় এসেছে এই সমস্যাটি নিয়ে নতুন করে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে চিন্তাভাবনা করার।

ইনজুরি সার্টিফিকেট কড়চা

ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যাচ-৩৯ ময়মনসিংহ এমসি, সহকারী রেজিস্টার, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ, মিটফোর্ড হাসপাতাল।

তখন পাংশা চাকুরি করি। একদিন সকালে ইমার্জেন্সি রুমে বসে ডিউটি করছি। এমন সময় এক মারামারির রোগী আসলো। রোগীর ইনজুরি তেমন মারাত্মক না। ভর্তি না হলেও চলে। কিন্তু এই কথা মারামারির রোগীকে বললে ওরা মারামারি করে যত না শরীরে ব্যথা পায় তার চেয়ে বেশি মনে ব্যথা পায়। আমাদের হৃদয়হীনতা দেখে ওরা সপ্ত আসমান থেকে পড়ে যাবার ভান করে। যাই হোক রোগীকে সপ্ত আসমান থেকে ফেলে আর ইনজুরি বাড়াতে চাই না। রোগীকে ভর্তির জন্য চিকিৎসা দিচ্ছি। এক বৃদ্ধ লোক সম্ভবত রোগীর বাবা আমার সামনে চেয়ারে বসা। আমাকে বললেন, 'ডাক্তার সাহেব, একটু টাইট কইরা লেইখেন'। উনার কথা শুনে আমি টাইট হয়ে বসলাম। আমার টাইট হয়ে বসায় উনি তেমন একটা আশ্বস্ত হতে পারলেন বলে মনে হয় না। আমাকে আবার বললেন, 'টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা কইরেন না'। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার পাশে এসিস্ট্যান্ট-এর দিকে তাকালাম। তবে ততক্ষণে আমার বুদ্ধি খুলতে শুরু করেছে। চাচা মিয়া টাকা দিয়ে আমাকে ইনজুরিটা যেন বাড়ায়ে লিখি সেই অফার দিচ্ছে। আমি বললাম, 'চাচা, আমি যদি এখন আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ইনজুরিটা বাড়ায়ে লিখি; ওই যে দরজাটা দেখছেন এইটা পার হয়েই আপনি মনে মনে বলবেন; 'শালার ডাক্তার। টাকা দিলে সব পাওয়া যায়'। চাচা অপ্রস্তুত হেসে বললো; 'না না বাজান, কি বলেন? এইডা বলমু কেন?' আমি বললাম, 'যদি বলে থাকেন। ভুল তো আর বলা হবে না। আমি যদি টাকা নিয়ে এখন আপনার মনের মতো সার্টিফিফিকেট দিয়ে দেই আপনি তো বলতেই পারেন শালার ডাক্তার টাকা নিয়ে সব পারে। আপনার তো সেই কথা বলার অধিকার আছে।' চাচা বিব্রতকর হাসি হাসলো। আমি বললাম, 'আমি আপনার ছেলেকে খুব ভালোভাবে দেখছি। যা পাইছি তা-ই দিবো। টাকা লাগবে না। মামলা করবেন তো। মামলা মোকদ্দমায় অনেক টাকা খরচ হবে। টাকা জমান। আর কখনো এই ধরনের আবদার করবেন না। চাচা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে আমার সামনে থেকে উঠে গেলো। জানি দরজা পার হয়েই হয়তো মনে মনে একটা বকা দিবে- শালা কসাই ডাক্তার। কারো উপকার করতে চায় না। কিন্তু আমি মনে মনে সন্তুষ্ট। আমার বিবেকের কাছে ক্লিয়ার। পাংশা দীর্ঘ আড়াই বছরের উপর চাকুরি করছি। অনেক সার্টিফিকেট দিয়েছি। কিন্তু কোন সার্টিফিকেট কারো মন মতো দিতে হয় নাই। আমি যা পেয়েছি তা-ই দিয়েছি। এই ব্যাপারে আমি আমার UHFPO শফিউদ্দীন পাতা স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ। উনি সবসময় আমাদের এই ব্যাপারে সাপোর্ট দিয়ে গিয়েছেন। শুধু আমার না; পাংশায় আমার কোন কলিগের কখনো শুনি নাই সার্টিফিকেট নিয়ে ঝামেলা হতে। কিন্তু নারায়নগঞ্জের পাঁচ মাসের চাকুরিতেই সার্টিফকেট নিয়ে যেই ঝামেলায় পড়েছি ওই কাহিনী আর না বলি। তবে একটা ব্যাপার খুব ভালো লাগছে নতুন চাকুরি হওয়া নবীন চিকিৎসকেরা এই ব্যাপারে খুব সৎ। সার্টিফিকেট দেয়ার ক্ষেত্রে নতুন ডাক্তারদের পরামর্শঃ ১। ইনজুরি সবসময় নিজে রোগী দেখে নিজের হাতে লিখবেন। মেডিকেল এসিসট্যান্টের উপর ভরসা করে ছেড়ে দিবেন না। এনাটমিক্যাল ল্যান্ড মার্ক অনুযায়ী ইনজুরির বর্ণনা করবেন। ইনজুরি বোঝার জন্য ফরেনসিক বইটাতে একটু চোখে বুলিয়ে নিলে দোষের হবে না; আদতে ভালোই হবে। ২। গ্রিভিয়াস হার্টের আটটা পয়েন্ট ঠোটস্থ রাখবেন। প্রয়োজনে ইমার্জেন্সি রুমে টাঙ্গিয়ে রাখতে পারেন। তাতে সমস্যা হলে ইমার্জেন্সি রুমে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারেন। আর কখনো কোন সমস্যা হলে হাসপাতালের সিনিয়রদের সাহায্য/পরামর্শ নিবেন। মনে রাখবেন অভিজ্ঞতার দাম সবসময়ই বেশি। ৩। কাউকে কখনো যদি গ্রিভিয়াস ইনজুরির সার্টিফিকেট দেন তাহলে সার্টিফিকেটের এক কপি অবশ্যই ফটোকপি করে আপনার কাছে রেখে দিবেন। আর কী কারণে দিয়েছেন তারও এক কপি ফটোকপি করে আপনার কাছে রেখে দিবেন; যেমন এক্সরে ফাইন্ডিং বা এক্সরে রিপোর্ট ইত্যাদি। ৪। পার্টি যদি ঝামেলার মনে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি সার্টিফিকেট ফটোকপি করে ফাইন্ডিংসহ আপনার কাছে রেখে দিবেন। সার্টিফিকেট কিন্তু আপনার অজান্তে বদল হয়ে যেতে পারে। ৫। থানা হেলথ কমপ্লেক্সে সার্টিফিকেট যখন দিবেন প্রথম থেকেই হার্ডলাইনে থাকবেন যে আপনি কারো কথায় কারো মন মতো সার্টিফিকেট দিবেন না। অনেকটা বাসর রাতে বিড়াল মারার মতো। আপনাকে ভুল পথে চালানোর মত লোকের অভাব হবে না। মেডিকেল এসিসট্যান্ট বা ইমার্জেন্সি রুমের মামাগুলিও আপনাকে ভুল পথে ডাইভার্ট করতে চাইতে পারে। কারণ ওদের আর্থিক লাভ আছে। আপনি যদি প্রথমেই নড়বড়ে হয়ে যান প্রতিটা সার্টিফিকেট দেয়ার সময়েই আপনাকে জ্বালাবে। আর যদি প্রথমেই আপনার কঠোর অবস্থান ক্লিয়ার করতে পারেন তাহলে অন্য সময় আপনাকে জ্বালাবে না। বরং পার্টির লোককে বুঝাবে এই স্যার টাকা খেয়ে সার্টিফিকেট দেয় না। উটকো ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবেন। ৬। থানা থেকে সার্টিফিকেট চেয়ে চিঠি আসলে যত তাড়াতাড়ি পারেন সার্টিফিকেট দিয়ে দিবেন। যত দেরি করবেন তদবিরের চান্স তত বাড়বে। সার্টিফিকেট লিখে একবার পাঠিয়ে দিতে পারলে আপনি নিশ্চিন্ত। আর কোন তদবিরে কাজ হবে না। ৭। রোড ট্রাফিক এক্সিডেন্টের রোগীদের ফাইন্ডিংও লিখে রাখবেন। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজে লাগে না বা কেউ মামলা করে না। কিন্তু যদি মামলা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার কাছে ইনজুরি সার্টিফিকেট চাইতে পারে। আমি নিজেই এই ভোগান্তির শিকার। ৮। কোন মারামারির রোগী রেফার করলেও আপনি তার কি ইনজুরি পেলেন অবশ্যই লিখে রাখবেন। সার্টিফিকেট হয়তো আপনাকেই দিতে হতে পারে।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কথকতা

ডাঃ নাজনীন রহমান, ব্যাচ-৪২, চট্টগ্রাম এমসি,
৫৯তম ব্যাচ, স্পেশাল ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, এনএপিডি

সরকারী চাকুরীতে যোগ দিয়ে হাল হকিকত বুঝে উঠার আগেই নীলক্ষেত এর জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি থেকে ২১শে নভেম্বর,২০১৩ ফোন পাই। ফোনের ওপাশ থেকে স্বাস্থ্য ক্যাডার হিসেবে বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হয়েছি বলে জানানো হল। যখন খবরটা ফোনে পাই, হাসব না কাঁদব-এই অবস্থা। যাই হোক, ২৩ নভেম্বর ,২০১৩ হেলেদুলে বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম। একটু ভিন্ন স্টাইলে সংবর্ধনাও পেলাম। ভিন্ন এই অর্থে, কিছুদিন আগেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও মর্যাদার বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডার হিসেবে যোগদান করেছি। ঐ যোগদান আর এই যোগদানের পার্থক্য করতে করতেই দিন কেটে গেল। রেজিস্ট্রেশন হলো-ডরমিটরীতে রুম পেলাম। সমন জারি হলো, রাতে ডরমিটরীতেই থাকতে হবে। অনেক দিন পর ঢাকায় ফিরে ভাবলাম, যাক এবার কিছুদিন ফ্যামিলির সাথে থাকা হবে-মনটা একটু খারাপই হল। কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। বলে দিলো, ভোরবেলা পিটি ক্লাস। সবাই লক্ষী ছেলে মেয়েদের মতো সাদা সাদা স্কুল ড্রেস পড়ে রেডি। ছোটদের মতো লাফানো। কারও মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি। কেউ বা চরম ভাবলেশহীন। আমাদের সময় অবরোধ চলছিল। তাই রক্ষা-প্রতিদিন হাঁটতে যাওয়ার নিয়ম। খুব কম দিনই তা করতে হয়েছে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। প্রথম দিনই ৬৮ জনকে দুই ব্যাচে ভাগ করা হল। উদ্দেশ্য, আরো ইনটেনসিভ কেয়ার। আমি ৫৯ তম ব্যাচে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। প্রথম দিন অরিয়েন্টেশনে আমাদের ডিজি স্যারের বক্তব্য এমনই ভাবগম্ভীর ছিল যে, মনে হলো শ্বাস ফেলতেও অনুমতি লাগবে। ভাল লাগলো, তিনি সবার সমস্যা শুনতে চাইলেন এবং তা মেটানোর চেষ্টা করলেন। আমরা তো এখন অন্যদের সমস্যায় কর্ণপাত করি না। উনি বললেন যে সরকারী অফিস সম্পর্কে আপনাদের সবার একটাই ধারণা আছে যে-এখানে দুর্নীতি হয়, দীর্ঘসূত্রিতা হয়। কিন্তু আমি গর্ব করে বলতে পারি- এটা বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী অফিস যেখানে দূর্নীতির ছিঁটেফোটা নাই, করা সম্ভব যে কোন কাজ সর্বোচ্চ দ্রুততায় করা হয়। নিয়মের ভেতরে থাকলে আপনাদের যে কোন আবদার মেনে নেয়া হবে, কিন্তু নিয়মের ব্যত্যয় হলে সর্বোচ্চ তিরস্কার, কঠিন সাজা দিতে আমি একটুও পিছপা হব না। শুনে ঐদিন হাসি পেয়েছিল-ভাবলাম যত গর্জে তত বর্ষে না। কিন্তু এই ২ মাসে পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম যে স্যার একটুও অত্যুক্তি করেন নাই এবং এটাও বুঝলাম যে যদি আমাদের প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের মাথা ঠিক থাকে তবে সেই প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চলবেই। বিশাল এক রুটিন ধরিয়ে দেয়া হল আমাদের হাতে যা দেখলে মনে হবে প্রতিটা পদক্ষেপই সময়ে গোণা। ভোর ৫টায় পিটির জন্যে উঠা,৮ টায় সকালের নাস্তা, তারপর ক্লাশ, ১১টায় আবার নাস্তা,২ টায় দুপুরের খাবার, ৪.২০ এ গেমস,৬ টায় লাইব্রেরী,সপ্তাহে ২ দিন আবার এক্সটেনশন ক্লাশ। প্রচন্ড মেজাজ খারাপ করে ক্লাশ রুমে গেলাম। প্রথমেই পরিচয় পর্ব এবং বরফ গলার শুরু। এই জিনিসটা আমার ভাল লেগেছে-নিজের সহপাঠীকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আমাদের সবার ভেতরের দূরত্ব কমে গেল। একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করলাম ক্লাসে কেউ কেউ ছাড়া সবাই ঘুমায়। ট্রেইনারদের সবাই খুব ভাল। সবাই পড়ান,কিন্তু কেউ পড়তে বলেন না। এর মাঝেই অনেক নতুন কিছু শেখার সুযোগ হয়। প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখেছি। কেবিনেট সেক্রেটারি, সিএসপি অফিসার, বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের সচিব, ডিজি স্যার একেএম আব্দুল আউয়াল মজুমদার স্যারদের মত উচ্চ পর্যায়ের মানুষদের পাশাপাশি ডঃ মোঃ ইব্রাহীম, ডঃ ইফতেখারুজ্জামান, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, বদিউল আলম মজুমদার, ডঃ ইব্রাহীম খালেদ স্যারদের মত জনপ্রিয় কিন্তু নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য আমাদের কাছে ছিল একটা বড় পাওনা। আমরা আরও জনপ্রিয় লোকদের আনতে অনুরোধ করতাম-কিন্তু ডিজি স্যার বলতেন এখানে যারা সততার ব্যাপারে প্রশ্নাতীত শুধু তাঁরাই আসার যোগ্য। এত সবার মাঝে ইলেকশন কমিশনের সচিব সাদিক স্যার আমাদের মনের পটে থাকবে সারা জীবন। এতো ঝামেলার চাকুরী, তারপর এতো বড় অফিসার-কিন্তু উনার রসবোধ আসলেই অনন্য। আর সবচেয়ে উপভোগ্য ছিল ডাক্তারদের পাওয়া-না পাওয়া নিয়ে উনাদের সাথে আমাদের বচসা। পুরো ব্যাচকে ভাগ করে বিভিন্ন কমিটি করা হল। মেস কমিটি,পাবলিকেশন কমিটি,স্পোর্টস কমিটি,কালচারাল কমিটি,এনভায়রনমেন্ট ও ডিসিপ্লিনারী কমিটি,ট্যুর কমিটি। প্রত্যেকটার কার্যক্ষেত্র নির্ধারণ করা। প্রতিটি কমিটিতে সবাই সদস্য। একজন সহকারী দলনেতা আর একজন দলনেতা। মনে হতে পারে,পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। আসলে তা না। থাকলে তো ভাল। কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে,পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন এবং আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা। ডাক্তারদের সবাই বইয়ের পোকা মনে করে ভুল করতে পারে। তারা আসলেই অন্য জগতের মানুষ। এতো বহুমাত্রিক প্রতিভা কেমন করে কারো থাকে,তা আমার বোধগম্য হয় না। সময়ের সাথে মানুষের খাপ খাওয়ানো নতুন কিছু না। তাই প্রথমে খুব কষ্টকর মনে হলেও এক সময়ে আর খারাপ লাগে না। এই ২ টা মাস এতো টাইট শিডিউলের মাঝেও এই ডাক্তাররাই নিজেরা বাজার করে ভুড়িভোজ করিয়েছেন সবাইকে, নিজেরা রক্তিম সূর্যোদয় নামে দেয়ালিকা এবং সংবর্তিকা নামে স্যুভেনির প্রকাশ করেছেন। গাছ লাগিয়েছেন, শীতার্তদের সাহায্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে, বিশেষ দিবসে শোভাযাত্রা করেছেন,তিন তিনটা জমকালো মেস নাইট উপহার দিয়েছেন যেখানে নিজেরাই গায়ক, নায়ক, কবি, নৃত্যশিল্পী, জাদুশিল্পী,যা ডিজি স্যারকে বাধ্য করেছে বলতে যে ডাক্তাররা আসলেই সেরার সেরা। ডিজি অ্যাওয়ার্ড নামে একটা অ্যাওয়ার্ড আছে, যা অল-রাউন্ডারদের জন্য বরাদ্দ। প্রতি ব্যাচে ৩ টা করে দেওয়ার রীতি আছে। ১ম,২য় আর ৩য়। আরেকটা খেলাধুলায়,আরেকটা কালচারাল পারফরম্যান্স এ। এই অ্যাওয়ার্ড যার নামে তিনি আমাদের ডিজি স্যার। এই দুই মাসে আমার যা মনে হয়েছে, তিনি খুবই তড়িৎকর্মা একজন লোক। আমাদের প্রতিটি বিষয়ে উনার ছিল সজাগ দৃষ্টি। এই অ্যাওয়ার্ড আশ্চর্যজনকভাবে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। এর জন্য দেখা যায়,অনেকে এমন কিছু করে ফেলেন যে, বুঝতে পারার আগেই তা হারিয়ে ফেলেন। আসলে বরাবরের মত যারা বেশি লেখাপড়া করে তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তাই যত যাই করা হোক না কেন,পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর ধারীরাই ১ম ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়ে থাকে। খেলাধুলার সুযোগ থাকাটা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার চেয়ে মজাটাই আসল। মাসে ৪ টা কালচারাল প্রোগ্রাম করার রীতি থাকলেও আমরা ৩টা করতে পেরেছিলাম। মজার ব্যাপার হলো, এখানে আন্তঃব্যাচ প্রতিযোগিতা চলে। আমাদের যা হয়েছিল,আমরা সবাই মিলে একটা ভাল কিছু উপহার দিতে চেয়েছিলাম। ফলশ্রুতিতে রেজাল্টে "সেরা" বলে আখ্যায়িতও হয়েছিলাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কোন কাজ Confined থাকত না, সঞ্চারিত হয়ে যেত। প্রকাশনা কমিটির দায়িত্ব ছিল ব্যাচের পক্ষ থেকে লেখা সম্বলিত স্যুভেনির। এর চেয়ে বড় কষ্ট হলো সবার কাছ থেকে materials collection। আমরা আমাদের ব্যাচ থেকে দেয়ালিকা প্রকাশ (১৬ ই ডিসেম্বরে) করেছিলাম,যা ছিল পুরোপুরি হস্তশিল্প। এতসব দায়িত্ব, ক্লাস এর ফাঁকে! এই দায়িত্বগুলো না থাকলে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া দৃঢ় হতো না। মেস কমিটির আপু-ভাইয়ারা সারা মাস জুড়ে পালা করে মেন্যু বানানো এবং বাজার করা ও তদারকি সব করেছেন সফলতার সাথে। স্পোর্টস কমিটি আর ট্যুর কমিটি হলো আরও active ট্যুর কমিটির অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা দেশব্যাপী অবরোধের মাঝেও কক্সবাজার সেন্টমার্টিনের অবারিত সৌন্দর্য অবলোকন করেছি। আসলে ইচ্ছা আর পরিশ্রমের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। খুব কাছ থেকে কিছু ভাল মানুষদের দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিক্ত অভিজ্ঞতা যে ছিল না, তা নয়। তবে শিক্ষা হল তিক্ততাকে পাত্তা না দিয়ে অন্য সব কিছুই পজিটিভ নেয়া। প্রতিটি trainer এত dedicated! তাওহীদ স্যার কখনও না বলেন না।নাজমা ম্যাডামের সাথে কথা বলতে অদ্ভুত শান্তি লাগে। বাংলাদেশে usuall খুবই কম সরকারি অফিসে কেউ ভাল ব্যাবহার করতে চায়। সেখানে এখানকার প্রতিটি মানুষ সুন্দর ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই আমরা কেমন যেন ফ্যামিলি হয়ে গেলাম। প্রতিটি কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্যের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রচণ্ড শৃঙ্খলার মধ্যেও আনন্দ খুঁজে নেয়া। অনেক বিখ্যাত মানুষের দেখা পেলাম Guest lecturer হিসেবে। সবার কাছেই কিছু না কিছু শিখেছি। এত শেখার ফাঁকে ক্লাস, পরীক্ষা, পিটি, টার্ম পেপার, বুক রিভিউ, লুডু, টিটি, ক্যারাম, ব্যাডমিন্টন, নাচ, গান, নাটক, বৃক্ষরোপণ, দেয়ালিকা, স্যুভেনির সব কিছুর ফাঁকে ১টা দিন করে যখন ২ টা মাস কেটে গেল-তখন অদ্ভুত লাগছিল যে, এই মানুষগুলোকে বড়ই আপন লাগছে, দেখলেই কান্না আসছে, কষ্ট লাগছে। আমি জানতাম সবার এমন লাগছে। জানতাম-পৃথিবী গোল। আবার দেখা হবে। কিন্তু কী জানি হারিয়ে যাচ্ছিল। আসলে অদ্ভুত মায়ার বাঁধনে বাঁধা আমরা। মানুষের এতো কাছাকাছি যারা থাকে, তারা খুব খারাপ মানুষ হতে পারে না। আমাদের এই মায়ায় কোন স্বার্থ নেই। বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এই মায়ার বাঁধনে সহায়ক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে যেমন করে আমরা নিজেদের অনুভব করেছি, কর্মক্ষেত্রে এর সুযোগ নেই। নিজেদের আত্মবিশ্বাস আর একতাই প্রতিকূল অবস্থার সাথে লড়াই করার একমাত্র ঢাল।

বাস্তব জীবনটা আসলে কঠিন। চাকুরী ক্ষেত্রে ডাক্তারদের আরো বেহাল দশা। তবে নিজেদের প্রশিক্ষণটা কোথায় কাজে লাগবে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে জীবনে চলার পথের কোন শিক্ষাই বৃথা যায় না। অভিজ্ঞতা অনেক বড় সম্পদ। কষ্ট লাগে, যখন দেখি, ডাক্তারদের সবাই অবমাননা করে নির্দ্বিধায়। এত বড় সম্পদ এই কম্যুনিটি। এই ডাক্তার জাতির অন্তর্গত মানুষগুলো সব করতে পারে। কিন্তু শুধু নীতির নামে উল্টাপাল্টা নিয়মের বেড়াজালে তাদের আবদ্ধ করে জিম্মি করে রাখা হয়। তৈরী হয়ে আছি, জানি কিছু করতে পারব, কিন্তু কেউই সাপোর্ট দেয় না, শুধু ভয় দেখায়। পানি না দিলে যেমন গাছ বাড়ে না, তেমনি সুযোগ না দিলে গঠনমূলক কিছু হবে না।

শুভেচ্ছা বাণী

অধ্যাপক ডাঃ একে জোয়ার্দার, ইউনিভার্সিটি ডেন্টাল কলেজ, ঢাকা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিয়োজিত ছাত্র-ছাত্রীদেরদের প্রয়াস এই প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটর্ফমের প্রথম প্রকাশিত কপির সৌজন্য সংখ্যাটি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পড়েছি আর অভিভূত হয়েছি। আর তুলনা করেছি সেকাল-একাল। এ কথা স্বীকার্য, এরা এদের শিক্ষা জীবনে চলমান অসঙ্গতিগুলো কত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে; আবার তা কাগজের পাতায় অকপটে তুলে ধরতে পারে। এদের লেখনী-হাতের প্রশংসা না করে পারা যায় না। কি রম্যরচনা, কি সমালোচনা, কি গল্প অথবা ছড়া-কবিতা সবখানেই মুন্সীয়ানার ছাপ! যেন মনে হয় এরা এক এক জন আগামী দিনের যাযাবর-অবধূত-নীহার-জীবনানন্দ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী মানেই সময়ের ঘানি নিগড়ে পিষ্ট কোনও প্রাণী। তার মাঝেও ওরা সাহিত্য চর্চা আর সাংবাদিকতার ছবক নিচ্ছে নিপুণ ভাবে-অবাক হবারই কথা! প্ল্যাটফর্মের যাত্রী সমাবেশে আছে মেডিকেল-ডেন্টালের ছাত্র-ছাত্রী আর তরুণ ডাক্তার। এরা যেন একই পরিবারের সদস্য। এই ভাবেই এরা পাচ্ছে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির শিক্ষা-"আমরা একে অপরের", আর এই ব্রত নিয়েই চিকিৎসা সেবা পৌছে দেবে সমাজের সকল স্তরে। চিকিৎসা বিজ্ঞান যে শিল্প-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সমাহার, তার প্রমাণ এই প্ল্যাটর্ফমে'র গেট-আপ যা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। আমি প্ল্যাটফর্মের প্রাণ "কনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবিদের" উত্তরোত্তর উৎকর্ষ কামনা করি। প্ল্যাটফর্ম দীর্ঘজীবি হোক।

Breaking Bad News!!

Dr. Sarwar Alam, Chairman, Dept of Oncology, BSMMU

Bad news can be defined as any information that adversely alters patient's expectations for the future. Its basic format is the basis for subsequent discussions at various points during the patient's disease trajectory. Breaking bad news generally causes distress to both the patient and the newsgiver. It is necessary to be prepared for a strong emotional reactions eg, tears, anger. Telling the patient and family together avoids difficulties and mistrust. It also gives the opportunity for mutual support. Oncologists give bad news hundreds of times during course of his career and it can be highly stressful. In a large survey of Oncologists, 20% reported anxiety and strong emotions when they had to tell a patient that his or her condition would lead to death. In a more detailed study of 73 physicians, 42% indicated that although the stress often peaks during the encounter, the stress from a bad news encounter can last for hours-even upto 3 or more days afterward. The principle of breaking bad news is gradual deliberation of the truth within the context of confined support and encouragement almost always leading to enhanced hope of a patient indicate directly or indirectly that he does not wish to regard her illness as fatal, it is wrong to force the truth on him. In some cases, patients want to know more about their condition. Sometimes it is necessary to use some questions to find out his extension of query. If the patients wants more information:

- Give a 'warning shotÕ before stating the diagnosis eg, 'tests indicate that we could be dealing with something serious'.
- Tailor the information to the patient's perceived needs, sometimes using a series of euphemisms, eg, 'some abnormal cells'; 'a kind of tumor', or simply 'a mass'-as a way of moving gently but definitely towards the explicit use of the word "cancer" .
- Stop if the patient indicates that they have heard enough. After giving bad news, try to offer some good news, but not before finding out how patient feels about the bad news. Good news might include:
- Information about possible further anticancer treatment
- They still have a future despite the cancer being incurable
- There is still be good times ahead despite progressive illness
- There is much that can be done to relieve pain and other distressing symptoms

In summary-

1 Locations of counselling: Get the physical surroundings privately
2 Find out what patient knows
3 Find out what the patient wants to know
4 Share information:
- Use open questions to facilitate the expression
- Do not give false hope
- Do not give more information than is wanted
- Do not be afraid of silence
- Check back to ensure that the message has been taken in
- Make sure you are answering the question being asked
- Try to get the patient to come to their own conclusion

5 Allow the expression of strong emotions eg tear, anger
6 Arrange to meet again to deal with any 'matter arising'.

আমার নাম্বারটি সেভ করে রাখুন ।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ সিরাজুল হক, ইউরোলজি বিভাগ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ,
ব্যাচ-১৯, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

অপারেশন থিয়েটার শুধু কি সুমসাম নীরবতা, গভীর নিমগ্নতা, সনিপুণ দক্ষতা, চাপকে কাজে রুপান্তরতা এবং শেষে সফলতার জায়গা নাকি একটি পবিত্র মন্দির যেখানে প্রার্থনার চেয়েও গভীরে গিয়ে জীবনকে মৃত্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হয়। এখানে ঢুকলেই মাস্ক, ক্যাপ, গাউন এবং গ্লাভস পড়ে আমরা ভিন গৃহের দেবদূতের মত হয়ে যাই। আচ্ছা ওগুলো কেন পরি ক্যাপ-মাথার চুল রোগীর পেটে না পড়ার জন্য। মাস্ক কেউ কাউকে না চিনে ফেলার জন্য, নাকি চেহারার অভিব্যক্তি ঢাকবার জন্য-আর বাকিগুলো সংক্রমণরোধী। আসলে মনকেই বেঁধে ফেলতে হয় আগে ওগুলো তো বাইরের। অপারেশনে দাঁড়ালে একেবারে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোগের পূজোয় সঁপে দিতে হয়, ঢেলে দিতে হয় পুরোপুরিভাবে-একটাই চাওয়া। গভীর থেকে গভীরে যাওয়ার একাগ্রতা। সে যেন ভাল হয়।

সেদিন থিয়েটারে খুব ব্যস্ততা, সবগুলোতে কাজ চলছে। একটি থেকে করুণ, দুর্বল আর্তনাদ ক্ষণে ক্ষণে হচ্ছে শুনে ঢুকে দেখি একজন সার্জন এক যুবতির মাথায় সেলাই দিচ্ছে। যখনি সুঁই ফোঁটায় চিৎকার দিয়ে উঠে, বের করলে চুপ করে। দুই ওয়ার্ড বয় হাত পা চেপে ধরেছে। দেখে মধ্যযুগীয় চিত্র চোখে ভেসে উঠল ।

ঃ কি তালুকদার, এত চেঁচাচ্ছে কেন? এনেস্থেশিয়া দাওনি।

ঃ লোকাল দিয়েছিতো স্যার, কোন কাজ হচ্ছে না। তাছাড়া সেলাইতো দেবো, তিন চারটি। এর কোন লোকজনও নেই। ইমারজেন্সি থেকে সোজা ওটিতে পাঠিয়ে আমাকে কল দিয়েছে, বেশ ব্লিডিং হচ্ছিল তো?
অভ্যাসবসত পালসে হাত দিয়ে দেখি পাইনা, হাতের পাতাগুলো সাদাসাদা লাগে। ছোঁড়াছুড়িও থামছে না।
ঃ ব্লাড প্রেসার মেপেছ, কত?

ঃ নাহ, এই প্রেসার মেশিনটা আনোতো।

ঃ করছ কি? এ তো শকে মনে হয়?। মেশিন আনিয়ে মেপে দেখি -পাইনা। সন্দেহ হওয়াতে মনিটর আনিয়ে দেখি, পালস অনেক দ্রুত এবং দুর্বল, প্রেসার ৬০ এর দিকে, অক্সিজেন ৮০ এর নিচে। পেটে হাত দিয়ে দেখি বাঁ'পাশ খাবলে গেছে। মন চাইল একটা চিৎকার দিতে! 'হায়রে কোথায় আমার এ বি সি ডি ই'! কিন্তু থিয়েটার এমন একটি জায়গা যেখানে সঠিক কাজই চাপের মাঝে বের করতে হয়। তাড়াতাড়ি দুটো চ্যানেল দিয়ে হাতে চেপে স্যালাইন ঢুকাতে দিয়ে, অক্সিজেন লাগিয়ে রক্তের ব্যবস্থায় মনযোগি হলাম। ভাগ্যিস ব্লাড ব্যাঙ্কে ঐ গ্রুপের দু'বোতল রক্ত মজুত ছিল, যা অন্য অপেক্ষমান রোগীরটাই তাড়াতাড়ি এনে চালিয়ে দিয়ে ইতিহাস নিয়ে জানলাম; মেয়েটি রিক্সা করে আসার সময় একটি বাস পাশে দিয়ে ধাক্কা দিলে সে ছিটকে রাস্তার পাশে ড্রেনে পড়ে যায়। রিক্সাওয়ালা উঠলেও সে ঐখানে পড়ে থাকে। অনেক লোকজন জমলেও যুবতি মেয়ে বলে কেউ হাত লাগায় না। অনেকক্ষণ পর এক দাড়িওয়ালা বুড়া ভ্যান গাড়ীর চালক পাঁজাকোলা করে তাঁর ভ্যানে করে নিয়ে এসে ইমারজেন্সিতে রেখে যায়। তার ব্যাগটি কেউ নিয়ে যায় তবে মোবাইল ফোনের ছোট ব্যাগটি গলায় বাধা আছে, পানি ঢুকাতে অচল হয়ে আছে। তবে নাম ঠিকানা রেশমা নিজেই বলে দিয়েছে, বাপকে জানানো হয়েছে, পথে আছে। স্যালাইন, রক্ত যাওয়াতে মনিটরে একটু উন্নতির আভাস মিললে জরুরি পরীক্ষাগুলো করানোর জন্যে পাঠালে আল্ট্রাসনোগ্রাফিস্ট নিজেই ফোন করে-'স্যার, পেটের মধ্যেতো অনেক রক্ত। লিভার, ডান পাশের কিডনি ভাল আছে। রক্তের আড়ালে বাম পাশের কিডনি ঢেকে আছে বলে বুঝতে পারছিনা।'
ঃস্প্লিন ঠিক আছে? মেজেন্ট্রি" ।

ঃ সেটাও তো স্পষ্ট নয়। তবে মুত্রথলি ঠিক আছে। ক্রিয়েটিনিন ঠিক থাকাতে ইমারজেন্সি আইভিইউ করে দেখা গেল, বাম কিডনি আস্পষ্ট। এখন ক্যাথেটার দিয়েও রক্ত বেরোচ্ছে। ঐ অবস্থায় সিটি স্ক্যান করালে আরো স্পষ্ট ভাবে গ্রেড ৫ কিডনি ইঞ্জুরি এবং ক্ষত বিক্ষত স্প্লিন নিশ্চিত হওয়া যায়। থিয়েটারে আনতে আনতে ব্লিডিং এর কারণে সে আবার শকে চলে যায়, আবার রক্ত দিলে একটু উন্নতি হয়। জরুরী ভাবে অপারেশনের প্রয়োজন কিন্তু অস্ত্রোপচারের সম্মতি দেবার মত কেউ নেই। তার বাপকে ফোন দিলে পথে আছে জানায় "স্যার আপনি যা ভাল মনে করেন করে ফেলুন, দরকার হলে আমার হয়ে আপনি স্বাক্ষর করে দিন "কান্না জড়িত স্বর লুকোল না। রেশমা সাবালক হওয়াতে তার স্বাক্ষর নিয়েও অপারেশন করা যায়, কিন্তু সম্মতি লাগবে দুটো ঃ প্রথমটি জীবন মরণের সম্মতি-যাকে আমরা নাম দিয়েছি "রিস্ক বন্ড "। অপরটি অঙ্গহানীর সম্মতি যেখানে স্বজ্ঞানে তার একটি কিডনি কেটে ফেলার কথা লেখা থাকবে । অপারেশনের ঠিক আগে আমাদের মনে পুরো অপারেশন প্রক্রিয়াটার ছক ভেসে উঠে, একটু চ্যালেঞ্জ, একটু স্ট্রেস-বাকিটা ভাবনা ভেলায় বিচরণ। চ্যালেঞ্জ ভাব ধরে রাখতে পারলে খুব সুন্দর অপারেশন, স্ট্রেস জয়ী হলে হযবরল। তাই মনকে ঠাণ্ডা রাখার সেই পুরনো পদ্ধতি 'নিজেকে ব্যস্ত রাখ, কথামালা, গান আর রাগ দেখিয়ে'। ভাবলাম আর একজন সার্জন সাথে রাখলে স্ট্রেস কম হবে, দুজনের মগজ দিয়ে কাজটা করা যাবে। সত্যি একটু কুল কুল ভাব আসছে।

রেশমার বাপ স্কুল শিক্ষক হওয়াতে আসার সাথে সাথে অস্ত্রোপচারের সম্মতি ফরমে সই দিয়ে দিলেন । 'স্যার আমার মেয়েটারে বাঁচান, ওর কয়দিন পরই বিয়ে হবার কথা'-বলে আমার দুহাত জড়িয়ে কিছুক্ষণ ডুকরে কেঁদে দিলে চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

এ সমস্ত বড় কাজে ডাঃ আনোয়ার আমার প্রথম পছন্দ,আমি স্ট্রেসে গেলে সে চ্যালেঞ্জে থাকে।দুজনের ভাল বোঝাপড়া। আর এনেস্থেটিস্ট ডাঃ রহমান-যে পিয়ানোর ছন্দের মতো আঙ্গু টিপে সুর তুলে আর আমরা গেয়ে যাই। গভীর রাতে অনেক বোতল রক্ত হাতে নিয়ে পেট খুলে দেখি পরিস্তিতি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও খারাপ। শুধু রক্ত আর রক্ত, এনেস্থেটিস্ট ডোপামিন দিয়ে দিল। সাকারের শব্দ ছাড়া কিছু শোনা যায় না, কোথেকে এত রক্ত মপ দিয়ে চেপে চেপে বাম কিডনির পেডিকেলে যেতেই ফিনকি দিয়ে উঠল, কিডনি কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। কিডনি ফেলে দেবার পর স্প্লিন এর রক্ত ছুটল; ওটাও ফেলে দেয়া লাগল। নার্স এসে কপালের ঘাম মুছে দিল। এনেস্থেটিস্ট হাত তুলে ভি চিহ্ন দেখালেন।

পরের দিন আই সি ইউ তে দেখতে গেলে দেখি রেশমা বসে আছে, ক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টি দিয়ে-অনেক নল শরীরে। বলে "স্যার ভাল আছেন?" উল্টো আমাকে-জিতিয়ে না হারিয়ে। আসলে যারা যৌবনে তারা তাড়াতাড়িই আঘাত থেকে সেরে উঠে। তারাই জিতে।

কেবিনে নিয়ে আসার পর সে জানায়, সে এবার এমবিএ পরিক্ষার্থী, ঢাকায় যাবার জন্য রিক্সা করে বাস স্টেশনে যাবার সময় এই দুর্ঘটনা তাকে যেতে দিল না। ইন্টারনেটে একটি কিডনি ফেলে দিলে কি হয় সে জেনেছে কিছুই হয় না। স্প্লিন ফেলে দিলে কি হয় কিছুই হয় না বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে খুব দ্রুত ভাল হয়ে উঠতে লাগল, সব নল খুলে পায়ে হেঁটে হেঁটে কেবিনে বিচরণ করত। হাসপাতালের পোশাক ফেলে সেলোয়ার কামিজও ওড়নাতে পরী পরী লাগত। একদিন রেশমাকে দেখে কেবিনের বাইরে এসে দেখি টি শার্ট, জিন্স কেডস পড়া একটি খোঁচা খোঁচা দাড়ির ছেলে দাড়িয়ে আছে। আমাকে সালাম দিল;

ঃ তুমি কে রে বাবা ? এখানে ঘুরাঘুরি করছ?

ঃ আমি ফয়সাল,রেশমার বন্ধু ।

ঃ চল আমার রুমে যাই, এতদিন আসো নাই যে ?

ঃ পরীক্ষা ছিলতো তাই আসতে দেরি হয়ছে। স্যার,ওর অবস্থা কেমন? শুনেছি একটি কিডনি নাকি ফেলে দিয়েছেন।

ঃ হ্যা,ফেলে দিয়েছি, আর একটিতো আছে। ওটা দিয়ে স্বাভাবিক চলতে পারবে। তা তুমি এত প্রশ্ন কেন করছ?
ঃ আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছেতো তাই।

পরের কয় দিন ফয়সালকে আর দেখি না। রেশমার বাপকে জিজ্ঞেস করলে কেঁদে দিলেন "স্যার ও কিডনি ফেলে দেওয়া মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেনা"। তাই চলে গেছে ।

রেশমা ভাল হয়ে চলে যাবার সময় ওর নাম্বারটি আমাকে দিয়ে বলল "আমার নাম্বারটি সেভ করে রাখুন "। যদি ও সে কোনদিন ফোন করেনি।

ডায়াগনস্টিক সেন্টার

ডাঃ যায়নুদ্দীন সানি, সহকারী অধ্যাপক (রেস্পিরেটরি মেডিসিন), রংপুর এমসি

'চিকিৎসা ব্যবস্থাটা যে ডাক্তারদের হাত থেকে ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে, এই ব্যাপারে কিছু লেখেন জনৈক সিনিয়র প্রফেসর বললেন। মনের কোণে একটু আশা এমন একটা লেখা ছাপা হওয়ার পর থেকেই এই ব্যাপারে একটা শুদ্ধি অভিযান শুরু হবে। কিংবা নিদেনপক্ষে ডাক্তারদের অসহায়ত্ব পাঠকরা বুঝতে পারবেন। সত্যিই কি তাই? বাস্তবে এমনটা বোধহয় হয় না। ডাক্তারদের গালি দিয়ে লেখা যত বেশী সুপাঠ্য হয় এবং পাঠকরা মজা করে পড়েন, ডাক্তারদের কষ্টের কথা ততটাই বিরক্তিকর হয়,'কেন যে এসব আজে বাজে লেখা ছাপে বুঝি না'।

চিকিৎসকদের মধ্যে কিছু আছেন যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন না। কিছু আছেন অফিস শেষে বিকেলে প্রাইভেট চেম্বারে বসেন রোগী দেখবার জন্য। কিছু আছেন ইনভেস্টিগেশানের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জড়িত। যারা রোগী দেখার সঙ্গে জড়িত, খুব মোটা দাগে দুভাগে ভাগ করা যায়, জেনারেল প্র্যাক্টিশনার এবং স্পেশালিষ্ট। প্রথমোক্ত ডাক্তারগণ সব ধরনের রোগীই দেখেন, দ্বিতীয় গ্রুপ নির্দিষ্ট কিছু। অন্ততঃ তাই হওয়ার কথা।

কোন এক সময় ডাক্তাররা নিজের ভাড়া নেয়া চেম্বারে বসতেন। এখনো কেউ কেউ বসেন, তবে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই বদলেছে। দেশের আনাচে কানাচে প্রচুর ডায়াগনস্টিক সেন্টার হওয়াতে, এবং তাঁরা ডাক্তারের চেম্বার করবার জন্য বিনা ভাড়ায় একটি রুম ছেড়ে দেয়ায়, এখন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা আর নিজস্ব ভাড়া করা চেম্বারে আগ্রহী হন না। শুধু শুধু পকেটের পয়সা খরচ করে বাড়ী ভাড়া নিয়ে চেম্বার করার দরকার কি? এছাড়া চেম্বারের জন্য চেয়ার টেবিল, অপেক্ষমান রোগীদের বসবার জন্য একরাশ চেয়ার, এসির বিল। উপরি পাওনা হিসেবে এলাকার মাস্তানদের আবদার। বিশেষ করে বড় বড় শহরগুলোতে খুব দৃষ্টি নন্দন করে ডায়াগনস্টিক সেন্টার কিংবা হাসপাতাল তৈরি করে, শহরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদেরকে অনুরোধ করা হয়, সেখানে চেম্বার করার জন্য। যার নাম যশ বেশী, তাঁকে অনুরোধের সঙ্গে প্রণামীও দিতে চায় অনেকে। কখনো সার্বক্ষণিক গাড়ী, কখনো নগদ। চেম্বারের এ সি র বিল থেকে শুরু করে রুম ঠিকঠাক রাখা, দরজায় সার্বক্ষণিক একজন অ্যাটেনডেন্ট সব খরচ ডায়াগনস্টিকের মালিকের। সেই মালিকের স্বার্থ? একটাই, ডাক্তার সাহেব যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা লিখবেন, সেগুলো করানোর জন্য রোগী আবার কোথায় যাবে, এই ভেবে যদি এখানেই করে। কখনো রোগী চক্ষু লজ্জার খাতিরে করেন। কখনো মার্কেটিং এর লোকজন এসে ছোঁ মেরে কাগজটা হাত থেকে নিয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাজ সারা। এছাড়াও থাকে ভয় দেখানো, স্যার অন্য কোন ল্যাবের রিপোর্ট দেখেন না। কখনো কনসেশানের টোপ দেয়া হয়। শুরুর দিকে ব্যাপারটা এমন ছিল। ডাক্তারদের ইচ্ছাই প্রধান। তিনি চাইলে বসবেন। তাই তাঁকে চাওয়ানোর জন্য চেষ্টার অন্ত থাকত না। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। এবার ডাক্তাররা সুযোগ চান কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বসার। নতুন কোথাও এসেছেন? সঙ্গে তো সম্বল আপনার ডিগ্রী আর পদ (সরকারী ডাক্তার)। খুব ভাগ্যবান হলে কনসালটেন্ট, অধ্যাপক কিংবা অধ্যাপকের সহকারী কিংবা সহযোগী। অন্য যেকোনো জেলা শহরের চেয়ে ঢাকার পরিস্থিতি অনেক বেশী ভয়ানক। ভারী পদের অধিকারী না হলে ভালো ব্র্যান্ডের কোন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সুযোগই পাবেন না। 'এখন তো জায়গা ফাঁকা নেই, হলে অবশ্যই আপনাকে জানাব। ফোন নম্বর তো আছেই আপনার'। নয়ত বলবে 'উত্তরায় বা পুরান ঢাকায় যে ব্রাঞ্চ আছে ওখানে ব্যবস্থা করে দিই?' ধানমন্ডি এলাকায় সুযোগ, 'সোনার হরিণ'। যদি হঠাৎ (যদিও সম্ভাবনা কম) জায়গা পান তখন আপনার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হবে। আপনি কয়জন রোগী পাচ্ছেন। আপনার হাসপাতাল থেকে কয়জন রোগী আপনি ভাগিয়ে আনতে পারছেন। হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া কয়জন রোগীকে, পরবর্তী সাক্ষাতের নাম করে নিজের প্রাইভেট চেম্বারে আনতে পারছেন। পারলে ভালো, আপাতত থাকতে দেয়া হবে। এবার আপনার পরবর্তী পরীক্ষা। আপনি কি পরিমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা দিচ্ছেন। প্রতিমাসে আপনার রেফারেন্সে কত টাকার ইনভেস্টিগেশান এর যোগান হচ্ছে। প্রথমে হয়তো কিছুদিন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। কিন্তু এভাবেই চলতে থাকলে সামনে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সমুহ বিপদ। অচিরেই আপনার রুমের এসি নষ্ট হবে। দারুণ গরমে রুমে বসে সিদ্ধ হতে হবে। বহু নালিশের পরে একদিন লোক আসবে মেরামত করতে এবং ঠিক হবে না। এরপর ঠিক করার নাম করে এসি খুলে নিয়ে যাবে। আপনার দরজায় যে আটেন্ডেন্ট ছেলেটা আছে সে হঠাৎ করে ছুটি নেবে এবং সময়মত আসবে না। আপনি চেম্বারে আছেন কি না নতুন আসা রোগীরা জানতেই পারবে না। নিচে রিসেপশানেও বলে রাখা হবে 'অসহযোগ আন্দোলনে' যোগ দিতে। 'রোগী কম' কিংবা 'ইনভেস্টিগেশান কম' দুটোই এখানে গর্হিত অপরাধ। শাস্তি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আপনি সহ্য করতে না পেরে যেদিনই আপনি ওখানে বসা বন্ধ করবেন, সেদিনই এসি ঠিক হবে। নতুন আরেকজন ডাক্তার যিনি কিছুদিন ধরে ধর্ণা দিচ্ছিলেন, তাঁকে এবার সুযোগ দেয়া হবে। তিনি আপনার রাস্তায় হাঁটলে, আপনার পরিণতি। অন্যথায় সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বেশী ইনভেস্টিগেশান দিলে, তাকে রোগীও দেয়া হবে। যেসব রোগী কিছু না বুঝে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এসেছে ডাক্তার দেখাতে, তাদেরকে এই নতুন ডাক্তারের প্রশংসায় মুগ্ধ করা হবে। সময়ের সঙ্গে একজন ডাক্তারের পসার বাড়লে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে।

এবার ডায়াগনস্টিক সেন্টার আপনাকে বড় একটা রুম দিবে, বিভিন্ন প্রণোদনা দিবে। আপনার লেখা ইনভেস্টিগেশানের কারণে হওয়া আয় এর একটি অংশও আপনাকে কমিশন হিসেবে অফার করা হবে। নিতেও পারেন, নাও নিতে পারেন। তিন মাসের আগে আপনার সিরিয়াল নাই, এমন হলে আপনি ভাগের পরিমাণ বাড়াতে বলতে পারেন। মাসিক বন্দোবস্তেও যেতে পারেন। বেশী নীতিবান হতে চাইলে নিবেন না। তবে কখনই ভাববেন না রোগীর কাছে কম নেয়া হবে না। আপনার জন্য বরাদ্দ কমিশনের টাকা রোগীর বিল থেকে বাদ দেয়া হবে না। পুরো টাকাটা মালিক পকেটে পুরবে। রোগীর কোন উপকার হবে না। আর নিলে খুব বেশী ক্ষতি নেই।কি আর হবে? বড়জোর পত্রিকায় একটু লেখালেখি হবে, 'ডাক্তাররা কসাই হয়ে গেছে' 'কমিশন বাণিজ্য করছে'। সে তো লিখবেই, সেটাই তো তাঁর ব্যবসা। মুখরোচক কিছু না লিখলে পত্রিকা কেউ কিনবে কেন? এসব লেখা তো বছরের পর বছর লেখা হচ্ছে। কিছু হয়েছে তাতে? কোন ভয় পাবেন না। গায়ে তো মাখবেনই না। বিবেক একটু কিন্তু কিন্তু করতে পারে। সে কিছুদিন করবে। এরপর বিবেকও ক্লান্ত হয়ে ঘুমাবে। ব্যাস আপনাকে আর বাঁধা দেয়ার কেউ নেই। আপনি তখন মুক্ত, স্বাধীন। প্রাণ খুলে দুর্নীতি করুন।

Think Big And Then Think Bigger

ডাঃ জাকির হোসেন হাবিব, সহযোগী অধ্যাপক (মাইক্রোবায়োলজি), স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

১) ডাঃ নাবিলার (ফাইনাল প্রফ জানুয়ারী ২০১৪ সালে ষষ্ঠ স্থান অধিকারী) সঙ্গে গত পরশু সকালে দেখা। আমি গত কয়েকদিন থেকে মনের মধ্যে উঁকি দেয়া প্রশ্নটার উত্তর সংগ্রহে তৎপর হলাম। আপনার ভবিষ্যত প্ল্যান কি অর্থাৎ আপনি কি বিষয়ে পড়াশুনা করতে চান? কিছুটা অনিশ্চিত ভঙ্গীতে সে মেডিসিন এবং মেডিসিনের দু'টি সাব স্পেশালিটির কথা বললো। তারপর বলটা আমার কোর্টে ঠেলে দিয়ে বললো, 'স্যার, আপনার কোন পরামর্শ আছে এ বিষয়ে'।

'না, নেই এ মুহূর্তে। তবে কিছু চিন্তা করলে ভবিষ্যতে আপনাকে জানাব'।

২) তখন আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে। আমার স্ত্রী ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার। তার সঙ্গে টুকটাক বেড়াতে যাই। বসুন্ধরা সিনেপ্লেক্স না থাকায় মধুমিতাই তখন ছিল ছবি দেখার একটি প্রিয় জায়গা। তো মধুমিতাতে যাই আর যেখানেই যাই কিছুক্ষণ পর পরই আমি ঘড়িতে সময় দেখতাম। আমার স্ত্রী প্রথম প্রথম কিছু না বললেও একসময় ঠিকই জিজ্ঞেস করে বসলো, এত ঘন ঘন ঘড়ি দেখছো যে, কোন জরুরী কাজ আছে নাকি? আমি একটু বিব্রত হলাম। বিষয়টা আসলে তা নয়। আমি তখন আইসিডিডিআর, বিতে চাকরি করি। প্রতিদিন নয়টা পাঁচটা অফিস করার সময় আমাকে অসংখ্য রোগীকে ফলো আপ দিতে হতো, চিকিৎসা দিতে বা পরিবর্তন করতে হতো। এই প্রতিটা কাজেই আমাকে দিনের পাশাপাশি সময়ের ও উল্লেখ করতে হত। বারে বারে ঘড়ি দেখতে দেখতে একসময় তা অভ্যাসে কিংবা বদভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। অফিসের বাইরেও ঘন ঘন ঘড়ি দেখতাম। সে এক সময় ছিল। ক্লিনিক্যাল ফেলো হিসেবে তখন আমাদের নামে রোগী আসতো। রোগী রিসিভ করে, তার হিস্ট্রি লিখে, তার জন্য আনুষঙ্গিক ইনভেস্টিগেশন লিখে, রক্ত টেনে নিয়ে সিস্টারের হাতে ধরিয়ে দেয়া পর্যন্ত সবই করতে হতো। কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই। শুধু সেখানেই শেষ নয়, এই রোগী যদি মারা যেত কিংবা রেফার্ড করতে হত তবে পরদিন মর্নিং সেশনে সেই রোগীর চিকিৎসার আদ্যপান্ত নিয়ে উপস্থাপনা করে রুমের দেশি-বিদেশি সব সায়েন্টিস্টদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে জবাবদিহি করতে হত (পুরো সেশনটাই হতো ইংরেজীতে)।

সেখানকার প্রতিটি বিষয় খুব স্পেসিফিক ছিল। রোগীকে খাবার স্যালাইন থেকে আইভি স্যালাইন দেয়াই হোক আর এন্টিবায়োটিক পরিবর্তন করাই হোক, প্রতিটি বিষয় ছিল নির্দিষ্ট প্রটোকলের আওতায়, রোগীর ফলো আপ দিয়ে, সেখানে সেই যুক্তি উপস্থাপন করেই করতে হত। ইচ্ছে হলো আর চিকিৎসা পরিবর্তন করে ফেললাম, এন্টিবায়োটিক পরিবর্তন করে ফেললাম তেমনটি হবার অবকাশ নেই। আইসিডিডিআর,বিতে কাজ করার সেই বছর দুয়েকের অভিজ্ঞতা আমার সমস্ত চিকিৎসক জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আমাকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে চিন্তাভাবনা করতে শিখিয়েছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই শিক্ষা আমি আমার মেডিকেল লাইফে বা শিশু হাসপাতালে অনারারী করতে যেয়ে পাই নি।

৩) তখন আমি আমার এম ফিল থিসিসের কারণে নিয়মিত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যাতায়াত করি। একদিন সেখানকার মাইক্রোবায়োলজির তুষার স্যার আমাকে জানালেন সেখানে এক জাপানী গবেষক আসছেন কালাজ্বর ও পিকেডিএল (PKDL) নিয়ে কাজ করতে। সপ্তাহ খানেক থাকবেন। আমি যেন সম্ভব হলে সে সময়টা থাকি।আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোক বোধহয় মাইক্রোবায়োলজির বড় কোন প্রফেসর। কিন্তু তাঁর মুখোমুখি হয়ে জানলাম তিনি মোটেও একজন ডাক্তার নন। তিনি একজন মলিকুলার ইমিউনলোজিস্ট (Molecular immunologist) এই জাতীয় একটা বিষয় যে থাকতে পারে তা আমার আগে ধারণায় ছিল না। যাই হোক সাতটা দিন সেই জাপানী ভদ্রলোক তুষার স্যারের কল্যাণে ফুলবাড়িয়া থেকে আসা অসংখ্য কালাজ্বর ও পিকেডিএল (PKDL) রোগী দেখলেন এবং তাদের বিভিন্ন স্যাম্পল সংগ্রহ করলেন।

তিনি ফুলবাড়িয়া গেলেন এবং Sand fly এর আবাসস্থল স্বচক্ষে দেখে বিভিন্ন স্যাম্পল সংগ্রহ করলেন। এই যে সাতদিন ধরে তিনি এত কষ্ট করলেন অথচ তার দেশ জাপানে কালাজ্বর আছে বলে জানা নেই। তবে কেন? আমার প্রশ্নের জবাবে তুষার স্যার খেদোক্তি করে বললেন, এই স্যাম্পল দিয়ে কালচার করে তারা বছরের পর বছর গবেষণা করবে। তার পরে হয়তো আমাদের কাছেই কোটি টাকার ঔষধ আর রিএজেন্ট বিক্রি করবে।

৪) There is a single light of science, and to brighten it anywhere is to brighten it everywhere-Isaac Asimov

আমাদের বাবা-মা কিংবা আমরা নিজেরাও যখন মেডিকেলে পড়তে আসি তখন ভবিষ্যতের স্বচ্ছল জীবনের পাশাপাশি মানবতার সেবার কথাটা মাথায় রাখি। আর কে না জানে একজন মরণাপন্ন, একজন বিপন্ন রোগীর মুখে হাসি ফোটানোর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে? আর তাই আমরা সবাই ক্লিনিশিয়ান হতে চাই-রোগীর চোখে, তার পরিবারের সবার চোখে ঈশ্বরের পরের স্থানটি নিতে চাই।

কিন্তু আমরা কি চিন্তা করে দেখেছি একজন ক্লিনিশিয়ান তার সমস্ত জীবনে কতজন রুগীকে সেবা দিতে পারেন অথচ এক একটি নতুন আবষ্কার কত লক্ষ কোটি মানুষকে নতুন জীবন দিতে পারে। বেশী দূর যেতে হবে না আমি শুধুমাত্র ওরস্যালাইনের কথা চিন্তা করতে বলবো। তা সারাবিশ্বে ডাইরিয়া আর কলেরার চিকিৎসায় কি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে,বাঁচিয়েছে কত লক্ষ কোটি মানুষের জীবন। সলিমুল্লাহতে যারা চান্স পেয়েছে, পড়তে এসেছে তাদের সবাইকেই আমি মেধাবী মনে করি। আমি বিশ্বাস করি তাদের সবারই বড় কিছু করার, বড় কিছু হবার মত মেধা আছে। কিন্তু জীবনে বড় কিছু হবার,বড় কিছু করার জন্য শুধু মেধাটুকুই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে অধ্যবসায়, পরিশ্রম, একাগ্রতা প্রয়োজন। আর নাবিলা বা তার মত যারা রয়েছে তাদের এই সব গুণাবলী রয়েছে আর তাই তাদেরকে আমি শুধু মেধাবী বলবো না, বলবো Gifted. আমি জানি শুধু নাবিলা কিংবা তার মত যারা বোর্ডের পরীক্ষায় অসামান্য সফলতা দেখায় তাদের বাইরেও অনেকেই এই Gifted তালিকায় রয়েছে।তাদের সংখ্যাও এই মেডিকেল ক্যাম্পাসে নেহায়েত কম নয়। তাদেরকে বলবো যেহেতু আপনারা Gifted তাই আপনাদের উপর দায়িত্বও বড়। শুধু বড় ক্লিনিশিয়ান হয়ে দিনকাবারি রোগী দেখার চিন্তা না করে আরো বড় পরিসরে চিন্তা করুন, আন্তর্জাতিক পরিসরে চিন্তা করুন। চিকিৎসা গবেষণার মাধ্যমে অসংখ্য পীড়িতের কষ্ট লাঘবের কথা চিন্তা করুন। আর এই চিন্তার পরিধি বড় করতে সামর্থ্যবান কেউ যদি দেশের বাইরে উন্নত বিশ্বে পড়ালেখা করতে যান, অথবা স্কলারশীপ সংগ্রহের মাধ্যমেও বাইরের দুনিয়া থেকে শিক্ষা নিয়ে আসতে পারেন তবে তা আপনার চোখ খুলে দিতে পারে। একটি আন্তর্জাতিক মানের ভাল প্রতিষ্ঠানে কাজ করা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিতে পারে। অনেক বড় পরিসরে চিন্তাভাবনার খোরাক জোগাতে পারে, এক বিরল সম্ভবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। সবশেষে নাবিলাসহ সকল তরুণ ডাক্তার আর আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদের সকলের উদ্দেশ্যে কয়েকটা ধার করা বাণী দিয়ে শেষ করতে চাই-

'However "big" you're thinking right now, it's probably too small.It's important to have big dreams for your future. After all, failing to plan is planning to fail. So if you can't think big about your future, you're not going to have a very big future. Big, of course, means a dream that takes you farther than where you are today. Success can be defined in many ways, and I'm not telling you how to define it. I'm simply saying to take your definition of success and raise the bar on it.'

লিন্ডাও ঃ নোবেল জয়ীদের সাথে তরুণ গবেষকদের সম্মেলন

ডাঃ আবু সাদাত মোঃ নুরুননবী, এমফিল (এনাটমি), [illegible] সহকারী অধ্যাপক (এনাটমি) ওএসডি এবং রিসার্চ ফেলো, সেন্টার অব [illegible] ল, ক্যাথোলিক বিশ্ববিদ্যালয় লুভেন, বেলজিয়াম

প্রতি বছর জুন মাসের শেষে জার্মানির লিন্ডাও শহরে বসে তরুণ গবেষক আর নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীদের মিলন মেলা। এককে বছর এককে বিষয়ের ওপর এই সম্মেলন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ২০১১ সালের ৬১তম মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার, যার বিষয় ছিল মেডিসিন এবং ফিজিওলজি। লিন্ডাও কর্তৃপক্ষ থাকা খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করে, কিন্তু যাতায়াত খরচ নিজেকে জোগাড় করতে হয়। প্রাথমিক আবেদন করতে হয়ঃ http://www.lindau-bangladesh.org/index.php-এ ওয়েব সাইটে। এখানে মনোনীত হবার পর লিন্ডাও মূল ওয়েব সাইটে গিয়ে আবার আবেদন করতে হয়। সারা বিশ্বের হাজার হাজার তরুণ গবেষকের মধ্য হতে প্রায় পাঁচশত জনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হয়। সেবার দেখলাম বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত চার জনের মধ্যে আমিই একমাত্র চিকিৎসক, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রভাষক। বাকিরা সব প্রাণরসায়ন কিংবা জীন প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষক কিংবা ছাত্র। তার মানে দাঁড়াল চিকিৎসকদের লিন্ডাও বিষয়ে ধারণাই নেই, অথবা গবেষণা ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা। আরেকটি বিমাতাসুলভ ব্যাপার চোখে পড়ল যে, যারা বাংলাদেশ থেকে গিয়েছেন তাদের ভ্রমণ খরচ দিয়েছে বাংলাদেশ একাডেমি অফ সাইন্সেস (BAS); যদিও আমি আবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমাকে তারা না কি খুঁজে পাননি! আমাকে সে সময় যেতে হয়েছিল অর্থ ধার করে। লিন্ডাও শহরে সেই মিটিং-এর স্মৃতি থেকে কিছু কথা বলি। বিভিন্ন দেশের অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা কত উন্নত গবেষণা করছে, আমাদের সেখানে শোনা ছাড়া বলার কিছু ছিলনা; আমি আমার দু'একটা গবেষণার কথা সাহস করে বলে ফেলায় তারা একটু আগ্রহ দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমি জানি আমাকে আরও কত পথ পেরোতে হবে। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা নিয়ে ধারণা দিলেন, গবেষণার ভবিষ্যৎ কিংবা ভবিষ্যতের বিজ্ঞান নিয়ে কথা বললেন। এখনকার চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূল গবেষণাগুলো কী হতে পারে তার রূপরেখা পেলাম। আমার সুযোগ হল মূল নোবেল পদক হাতে নিয়ে ছবি তোলার (জাপানী বংশোদ্ভূত মার্কিন গবেষক ডঃ নেগিশি এর সৌজন্যে, যিনি এক ধরণের প্রোটিন আবিষ্কারের জন্য এটি পেয়েছিলেন)। লিন্ডাও নামের ছোট্ট শহরটির চোখ জুড়ানো প্রকৃতি আর মাইনাউ দ্বীপে জাহাজে ভ্রমণের স্মৃতি এখনো সুখানুভূতি জাগায়। বিশাল থিয়েটারে বসে অর্কেস্ট্রা শোনা কিংবা টসকানা পার্কে লেকের (লেকের তিন ধারে জার্মানি, অস্ট্রিয়া আর সুইজারল্যান্ড) পাশে বসে রাতের খাবার (এরা সূর্যাস্তের পূর্বেই খেতে শুরু করে) খুব মনের ভেতরে দাগ কেটেছিল। আর শিখেছি কী করে গবেষণার কাজটাকে সফলতার সাথে জীবনঘনিষ্ঠ করে এগিয়ে নিতে পারা যায়! লিন্ডাও সম্পর্কে আগ্রহীরা http://www.lindau-nobel.org/-এ ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখতে পারেন।

সাক্ষাৎকার

ফুসফুসে ক্যান্সার আক্রান্ত রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ৩৭ তম ব্যাচের ডাঃ শম্পা বিশ্বাসের কথা আমরা জানি । ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসক শম্পা বিশ্বাসের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে কিভাবে তাঁর সহকর্মী অগ্রজ-অনুজেরা এক অবিশ্বাস্য SUCCESS STORY'র জন্ম দিয়েছেন সে গল্প শুনতে "প্ল্যাটফর্ম" থেকে আমরা মুখোমুখি হই শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ফাতেমা আশরাফ ম্যাডামের (গাইনী ও অবস্ বিভাগ, শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)। সন্তানতুল্য চিকিৎসক শম্পা বিশ্বাসের জন্য কাজ করতে গিয়ে জীবনের যে সরল অথচ সার্বজনীন শিক্ষা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন সে সম্পর্কে প্রফেসর ফাতেমা আশরাফ ম্যাডামের আলাপচারিতা ধারাবাহিকভাবে "প্ল্যাটফর্ম" এ প্রকাশিত হবে-এই প্রত্যাশায় ভবিষ্যতে কোন চিকিৎসকের অনুরূপ প্রয়োজনে আমরাও যেন এগিয়ে আসতে পারি।

প্ল্যাটফর্মঃ ডাঃ শম্পার কোন বিষয়টি তাঁর চিকিৎসা তহবিল সংগ্রহে আপনাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে?

➡প্রফেসর ফাতেমাঃ চিকিৎসক হিসেবে রোগীর চিকিৎসা করা আমাদের কাজ। কিন্তু একজন চিকিৎসক যখন অসুস্থ হন বিশেষ করে যেখানে তাঁর সামনে মৃত্যুর মত ঝুঁকি থাকে তখন তা অবশ্যই অন্য একজন চিকিৎসককে নাড়া দিবে। ডাঃ শম্পা বিশ্বাস নবীন, মানুষকে সেবা দেবার জন্য তাঁর সমস্ত জীবনটা পড়ে আছে। এছাড়া মানুষের প্রতি ও খুব COMMITTED,ওর বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

প্ল্যাটফর্মঃ এর শুরুটা সম্পর্কে বলবেন কী?

➡প্রফেসর ফাতেমাঃ ডাঃ শম্পা আমাকে মার্চের ৬-৭ তারিখের দিকে ফোন করে জানায় সে ফুসফুসে ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং পার্শ্ববর্তি দেশের ভেলোর থেকে কিছুটা চিকিৎসা নিয়ে এসেছে । এ বিষয়ে সে আমার সাথে কথা বলতে চায়। ডাঃ শম্পা বিশ্বাস আমার জুনিয়র কলিগ, আমরা একই মেডিকেলর ছাত্রী আমি তাঁকে চেম্বারে আসতে বলি। চেম্বারে তাঁর কাছে জানতে পারি, সে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এবং বর্তমান চাকুরিস্থল(২৭ তম বিসিএস) ও দেশের বাড়ি মাগুরা থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে ইতিমধ্যে ব্যয়বহুল কেমো থেরাপি এবং তারপর রেডিও থেরাপির কোর্স শেষ করেছে। এরপর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁকে অপারেশনের কথা বললে মধ্যবিত্ত পরিবারের ডাঃ শম্পা অপারেশনের জন্য অর্থিক সংকটে পড়ে । এর এক পর্যায়ে সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে অপারেশনের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ।

প্ল্যাটফর্মঃ একজন চিকিৎসকের জন্য এত বড় অংকের অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নেয়া চিকিৎসক সমাজে সম্ভবত এবারই প্রথম । ম্যাডাম কী কারণে আপনি এ দায়িত্ব নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন?

➡প্রফেসর ফাতেমাঃ ডাঃ শম্পা প্রথম এসে আমাকে যখন তাঁর প্রয়োজনের কথা জানায় এটা ছিল তাঁর বাঁচা মরার সাথে জড়িত বিষয়। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করি টাকা যোগাড় করা একটা সমস্যা হলেও আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আমাদেরকে ভাবতে হবে একটা না একটা রাস্তা অবশ্যই আছে এবং সবার সহযোগিতা আমাদের নিতে হবে, এখানে লজ্জা করলে হবে না-কে কী বলবে বা কে কী মনে করবে। শম্পা আমাদের বিশাল DOCTOR'S COMMUNITY'র একজন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজের একজন, বৃহত্তর যশোরের একজন সুতরাং সবাই মিলে চেষ্টা করলে ২০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ খুব কঠিন কিছু হবে না।

প্ল্যাটফর্মঃ এখন অনেক চিকিৎসকই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। দু-একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এভাবে সকল চিকিৎসক সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এসেছেন এমনটা দেখা যায় না, এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন।

➡প্রফেসর ফাতেমাঃ এক্ষেত্রে আমি বলবো কাউকে না কাউকে উদ্যোগী হতে হয়, যে কোন কাজে সবাইকে সম্পৃক্ত করা গেলে এবং লেগে থাকলে সবাই মিলে যে কোন সমস্যা দূর করা সম্ভব।

প্ল্যাটফর্মঃ "এরকম সমস্যা নিয়ে তো অনেকেই আসে, আমি কতজনকে দিবো"-কারো কারো মনে প্রশ্ন আসে। ম্যাডাম এ ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন?

➡প্রফেসর ফাতেমাঃ আমি মনে করি-কেন আমি দিবো না? আমিতো প্রতিদিন বাজার করি, খাই, খরচ করি, ফেলে দেই-ওখানে আমার দু-তিন হাজার টাকা খরচ হয় তাহলে কী আমার ব্যাগে নতুন করে টাকা ঢুকে না? আমাকে রিসাইকেলিং করে এ খরচটা করতে হয় না মানুষ হয়ত ছয় মাসে একবার আমার কাছে উপস্থিত হবে, ছয় মাস আগে যদি আমি একটা এক-দুহাজার টাকার অনুদান দিয়ে থাকি তাহলে কি আমি আবার দিতে পারবনা? আমার যেটুকু সামর্থ্যে কুলায় আমি সেটুকু দিব, কিন্তু আমি ভাবব না যে আমি একবার খরচ করেছি আবার কেন খরচ করবো? বারবার এভাবে সাহায্য করাটা জীবনের একটা অংশ যদি এভাবে আমরা ভেবে নেই তাহলে দেয়া সম্ভব।

(ডাঃ শম্পা বিশ্বাসের তহবিল সংগ্রহের সাথে জড়িত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, শুভানুধ্যায়ীদের কথা এবং তাঁর বর্তমান অবস্থা নিয়ে এ সাক্ষাৎকার প্ল্যাটফর্মের পরবর্তি সংখ্যায় সমাপ্য)

Counseling: Bann words

Dr. Sunjida Shahriah, M. Phil (anatomy with histology);Diploma in counseling & Neurolinguistic programme, Associate professor (Anatomy), ZHSWMCH. Counselor & psychotherapist at BCR Pain therapy & Well being center

Couple of time unawarely we use some words that limit our thinking process. They are not bad words. But we Bann it because it limit our thought at the psychological level. Thus it limits our capacities to change. The ways we talk it reflect on our thinking. The question is how words mould our thinking process?

Common Bann words:

Bann	Sentence	What psychological message it give
Trying	Im trying to do it	" It's a cope out from committing to some thing " So it will not work out " We do it only to be nice to some one but to do
More/ Little bit	Im doing more /little bit	" Very unspecific e.g. one can be pregnant or not. none can be more/little bit pregnant " If you say more/little bit then say more/little bit than what? Specify it
But	You are beautiful but today you are looking bad	" What you said before but is lost " Its focusing what you said after but
Always/ Never/ every body/ nobody/ Any body/ No one/ Every one	-Always she misunderstood me. -Nobody understood me -Every body do this to me -I'll Never trust a boy/girl again -I'll never love anybody again -no one/ every one likes me	" It's a generalization. " Every body/nobody means whom are they? Never/ always means what events? " Is it true to happen it Always/Never /every body/nobody/Anybody? " How can same thing can happen all the time " How can every one like/ dislike a person throughout the year? " No specification is there " Instead of generalization use specific action what you dislike/like in that person/event " Be specific about what you are looking for

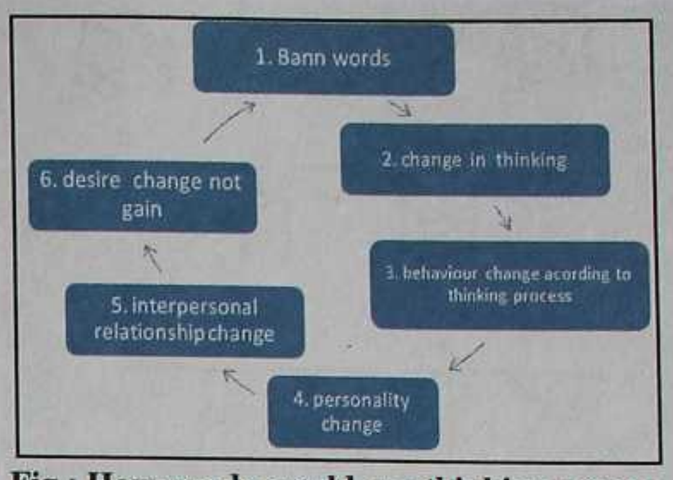

Fig : How words mould our thinking process

রক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা ॥ এক ॥

ডাঃ এআরএম সাইফুদ্দিন একরাম, মোনাশ ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া। সাবেক প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান মেডিসিন বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

রক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার আসল কাজ শরীরের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন এবং পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেওয়া। এ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে কোষ-কলা কয়েক মিনিটের মধ্যে মরে যায়। রক্ত পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যমণি হৃদপিণ্ড। সর্বদা স্পন্দনশীল বিস্ময়কর এই রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রটি মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বয়স যখন পাঁচ সপ্তাহ, তখনই গড়ে উঠতে শুরু করে। ভ্রূণের বয়স ৮ থেকে ৯ সপ্তাহ হলে এটি পুরো দমে কাজ শুরু করে দেয়। আর তা চলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। বুকের ঠিক মাঝখানে দুই ফুসফুসের মধ্যে হৃদপিণ্ডের অবস্থান। এটা কলার মোচার মতো দেখতে। এর সরু দিকের বেশির ভাগ অংশ বুকের বাম দিকে থাকে। আকারে এটি একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মুষ্টি বদ্ধ হাতের সমান। লম্বায় ১০ সেন্টি মিটার, আর গড়পড়তা ওজন ২৭০ গ্রাম। হৃদপিণ্ড আসলে পেশীবহুল ফাঁপা অঙ্গ। কিন্তু এর পেশীর বৈশিষ্ট্য শরীরের আর সব ঐচ্ছিক কিংবা অনৈচ্ছিক পেশী থেকে একেবারেই আলাদা। হৃদপিণ্ডের তিনটি স্তর রয়েছে। হৃদ পেশীর বাইরে পাতলা পর্দার মতো আস্তরণকে পেরিকার্ডিয়াম বলে। পেরিকার্ডিয়াম হৃদপিণ্ডকে শুধু চাদরের মতো ঢেকেই রাখে না, এর সুরক্ষা এবং বিশেষ আকার সংরক্ষণে সাহায্য করে। পেরিকার্ডিয়ামের নীচে মূল হৃদপেশী বা মায়োকার্ডিয়াম অবস্থিত। এটা পুরু এবং স্বতঃ সংকোচন প্রসারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। মায়োকার্ডিয়ামের ভেতরের আবরণীকে এন্ডোকার্ডিয়াম বলা হয়। হৃদপিণ্ড আসলে একই সমান্তরালে কার্যরত দুটি পাম্প বিশেষ। ডান দিকের পাম্প একটি অলিন্দ একটি নিলয় সমন্বয়ে গঠিত। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে এসে জমা হয়। ডান অলিন্দ আর নিলয়ের মাঝখানে যে কপাটিকা থাকে তার নাম ট্রাইকাস্পিড ভাল্ব। এর মধ্য দিয়ে রক্ত ডান নিলয়ে যায়। ডান নিলয় থেকে পরিশোধনের জন্য রক্ত ফুসফুসে যায়। ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বাম দিকের পাম্প ব্যবস্থায় আসে। বাম দিকের পাম্প বাম অলিন্দ এবং বাম নিলয় সমন্বয়ে গঠিত। বাম অলিন্দ থেকে মাইট্রাল ভাল্বের সাহায্যে রক্ত বাম নিলয়ে আসে। এখান থেকে রক্ত সবেগে মহাধমনী দিয়ে বের হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। হৃদপিণ্ড প্রতিনিয়ত তার কাজ করে চলেছে এবং এভাবে সমস্ত শরীরে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করছে। কিন্তু হৃদপিণ্ডের কার্য-ক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য হৃদপেশীর পুষ্টি ও অক্সিজেনের রক্ত প্রয়োজন রয়েছে। হৃদপেশী সেই রক্তের সরবরাহ পায় দুইটি করোনারি ধমনীর মাধ্যমে । ডান ও বাম করোনারি ধমনী তাদের শাখা-প্রশাখার সাহায্যে হৃদপিণ্ডের প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি যোগায়। হৃদপেশীর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্পন্দনশীলতা। অর্থাৎ হৃদপেশী নিজস্ব শক্তিতে উদ্দীপিত হয়। অলিন্দের ওপরের দিকে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড নামে পরিচিত একটি বিশেষ অংশ থেকে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা প্রথমে সৃষ্টি হয় এবং তা একটি জটিল জালিকার মতো ছড়ানো পথে সমগ্র হৃদপিণ্ডে বিস্তৃত হয়। এই বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার ফলেই হৃদপেশী স্পন্দিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে হৃদপিণ্ড একই সমান্তরালে কার্যরত দুইটি পাম্প বিশেষ। এখানে ডানদিকের পাম্পকে কম কাজ করতে হয়। কারণ এটা ফুসফুসে রক্ত পাঠায়। এজন্য ডান নিলয়ের পেশী তেমন পুরু নয়। কিন্তু বাম দিকের পাম্পকে বেশী কাজ করতে হয়। এখান থেকে রক্ত সারা শরীরে পাঠাতে হয় এবং সামগ্রিক রক্ত প্রবাহ অনেক বেশী বাধার মুখোমুখি হয়। এজন্য বাম নিলয় বেশী পেশল, পুরু এবং ভারী। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হৃদপিণ্ড বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে গড়পড়তা ৭২ বার স্পন্দিত হয়ে ৫/৬ লিটার রক্ত পাম্প করে। অর্থাৎ হৃদপিণ্ড প্রতিদিন ১,০০,০০০ বার স্পন্দিত হয়। সারা বছরে এটা ৪০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়। একজনের জীবনকালে গড়পড়তা এটি ৩ বিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়। আর রক্ত শরীরের কোষ ও কলায় অক্সিজেন ও পুষ্টি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আকারের রক্ত নালীর মধ্য দিয়ে ৬০,০০০ মাইল (৯৭,০০০ কিলোমিটার) পথ অতিক্রম করে। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ব্যায়ামের সময় হৃদপিণ্ডের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ৫-৭ গুণ অর্থাৎ ২০ থেকে ৪০ লিটার রক্ত পাম্প করতে পারে। (চলবে)

মূল লেখার লিংক-
http://hypertensionandheartdiseasepart1.blogspot.com.au/

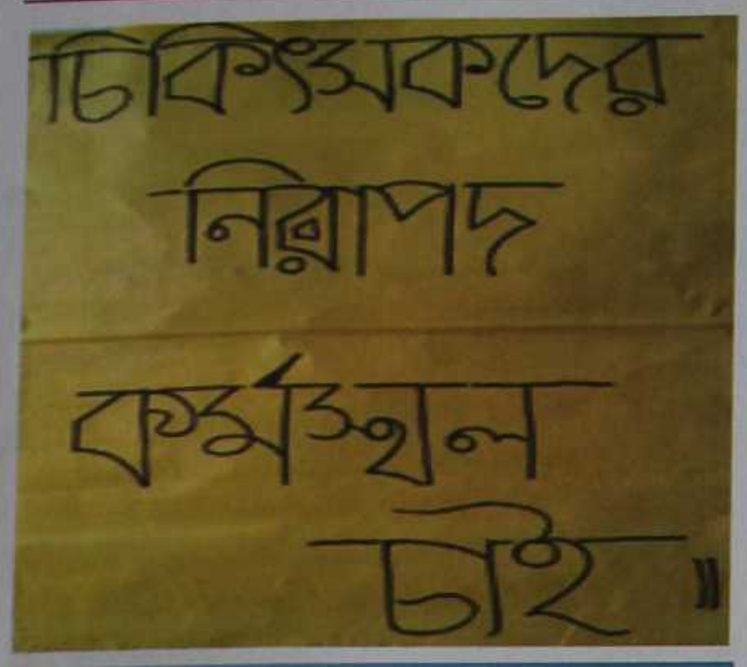

চিকিৎসকদের ধর্মঘটঃ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

ডাঃ নির্ঝর অলয়, ব্যাচ-৪৬, রাজশাহী এমসি

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নদের ধর্মঘট পরিলক্ষিত হয়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইন্টার্নদের ধর্মঘটের কারণ "কর্তব্যরত চিকিৎসকদের লাঞ্ছনা এবং নিরাপত্তার অভাব। "আমাদের দেশের মিডিয়া সবসময় একপেশেভাবে এই ধর্মঘটের খবর দেয় এবং প্রায় সবসময়ই ডাক্তারদের খলনায়ক বানিয়ে রোগীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরার একটা জনপ্রিয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এটা কখনো লেখা হয় না যে, জরুরীবিভাগ, আইসিইউ, ইমার্জেন্সি অপারেশন, ইনডোর সেবা ইত্যাদি সবই চালু থাকে। ইন্টার্ন ছাড়াও টারশিয়ারি লেভেল হাসপাতালে অনেক মিডলেভেল চিকিৎসক থাকেন যাঁরা কর্তব্য পালন করেন। সেটাও চেপে যাওয়া হয়, বোধহয় পাবলিক "খাবে না" ভেবে! আরো একটা ব্যাপার-অনেকের ধারণা যে, শুধু আমাদের দেশেই ডাক্তাররা ধর্মঘট করে এবং পৃথিবীর আর কোন দেশেই ডাক্তারদের ধর্মঘট নেই। কেউ কেউ মনে করে, উন্নত দেশগুলিতে নাকি ডাক্তারদের ধর্মঘট আইনত নিষিদ্ধ। কাজেই দেখা যাক চিকিৎসক ধর্মঘটের বৈশ্বিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

প্রথমেই আসি বিলেতের কথায়,যুক্তরাজ্য আমাদের বড় স্যারদের বড়ই প্রিয় দেশ! বিলেত-সেখানেও ধর্মঘট? ভাবা যায়? হ্যাঁ,তাই হয়েছিল যখন ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কনসালট্যান্টরা সব ধরনের "নন-ইমারজেন্সি," "ওভার-টাইম বা গুড-উইল" সেবা বন্ধ রেখেছিলেন। তাঁরা এটা করেছিলেন প্রস্তাবিত একটি নতুন চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। তাঁদের মতে এটা তাঁদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস পরিত্যাগ করতে বাধ্য করত। (অবশ্য প্রাইভেট প্র্যাক্টিস যুক্তরাজ্যে এখনো খুবই কঠিন নিয়মের মধ্যে করতে হয় NHS এ কর্মরত চিকিৎসকদের)। আন্দোলনের মুখে ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বহাল থাকে। ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে কর্মঘণ্টা কমানোর দাবীতে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট শুরু হয়। গার্ডিয়ান পত্রিকার ভাষায়

"Later that year junior doctors took action against the following problems: roster that enforced working 120 hours one week and 80 the next while being paid for a 40-hour week; appalling conditions in their on-call rooms; and having to provide care for "their" consultants' private patients, which took them away from NHS commitments."

উল্লেখ্য এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনের পর জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে আনা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে EU Work Directive এর বাস্তবায়নের ফলে গোটা ইউরোপের মত যুক্তরাজ্যেও ডাক্তারদের নিয়মিত কর্মঘণ্টা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টায় এবং বেসিকের ৪০% ওভারটাইম সাপেক্ষে সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অধিকাংশ হাসপাতালে এটি বাস্তবায়িত হয়েছে। রয়েল কলেজ অফ সার্জারির কর্তাদের চেঁচামেচিও এটা বন্ধ করতে পারেনি। কারণ এখন পর্যন্ত কোন স্টাডিই পেশেন্ট সেফটিও ট্রেনিংয়ের গুণগত মান কমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রমাণ করেনি। বরং ডাক্তারদের জীবনযাত্রার মান (Quality of Life) এবং কাজ ও জীবনের সমন্বয় (Work-Life balance) অনেক বেড়ে যাবার কথা প্রতিটি স্টাডি উচ্চকণ্ঠে বলছে। জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইউকে যদিও বলছে যে এটা ট্রেনিংয়ের মান ক্ষুণ্ন করছে কিন্তু সেটা কিন্তু কর্মঘণ্টা কমানোর জন্য নয়। আরো অনেক ফ্যাক্টর জড়িত। তাদের প্রকাশনার মতে জুনিয়র ডাক্তারদের ট্রেনিংয়ের জন্যই রাখা উচিত, সার্ভিসের জন্য কম। "In addition, the training issues raised by the directive do not suggest that junior doctors can't be trained in 48 hours, says the report; for example, doctors in Norway are restricted to 40 working hours a week, yet training is considered adequate because of the emphasis placed on continuing professional development, the favourable doctor to patient ratio, and the efficiency of medical staff." এই ইতিবাচক উত্তরণের পটভূমি হিসেবে ১৯৭৫ এর ধর্মঘটকে মূল কারণ বলে মনে করেন অনেকেই। এরপর দীর্ঘ ৩৭ বছর পর ২০১২ সালের ২১ জুন যুক্তরাজ্যের বেস্ট পেইড পাবলিক সার্ভেন্ট অর্থাৎ ডাক্তাররা পরিবর্তিত পেনশন স্কিমের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে। উল্লেখ্য যুক্তরাজ্যের প্রতিটি ধর্মঘটই ছিল সর্বাত্মক এবং ধর্মঘটের প্রস্তাব ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভোটে পাশ হতে হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বিবিসি গার্ডিয়ান বা টেলিগ্রাফ কারো প্রতিবেদনেই কিন্তু রোগীদের "জিম্মি" করা বা দুর্ভোগের ব্যাপারটাকে খুব ফলাও করে প্রচার করা হয় নি। বরং বারবার লেখা হয়েছে যে, ইমার্জেন্সি, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, ক্যান্সার-কেয়ার ইত্যাদি সেবা চালু ছিল।যা আমাদের দেশের সমধর্মী খবরগুলোতে কখনোই দেখা যায় না। আমাদের দেশে কিন্তু সর্বাত্মক ধর্মঘট কখনোই হয় না। সাধারণত শুধু ইন্টার্নরা ধর্মঘট করে। আমি স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণকালে ইন্টার্নদের একটা ধর্মঘট দেখেছি। তাতে আমাদের ওয়ার্ডে কোন সমস্যা হয় নি। উলটো রোগীরা আরো দ্রুত সেবা পেয়েছে-বেশি দক্ষ ও অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসারদের কাছ থেকে। গত ২৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ সকালে আয়ারল্যান্ডের ইন্টার্নসহ জুনিয়র চিকিৎসকরা কর্মঘণ্টা সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘণ্টায় সীমাবদ্ধ রাখার দাবীতে ধর্মঘট আহ্বান করেছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ক ডিরেক্টিভের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ঘটানো হবে আয়ারল্যান্ডে।

এবার যাওয়া যাক যুক্তরাষ্ট্র-আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ডাক্তাররা প্রথম ধর্মঘট আহ্বান করেন ১৯৬৬ সালের ২৮ জুন। এদিন নিউ ইয়র্ক সিটি হেলথ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত প্রায় ১৫০০ ডাক্তার যাদের মধ্যে ডেন্টিস্ট ও অপ্টোমেট্রিস্টরাও ছিলেন, ১১৯ টি শিশু হাসপাতালে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেন। তাঁদের দাবী ছিল বর্ধিত বেতন এবং কর্ম নিরাপত্তা। এর মধ্যে ৫৫টি হাসপাতাল পুরোপুরি বন্ধ ছিল এবং ৫৮ টি হাসপাতালে সীমাবদ্ধ সেবা বা শুধু ইমার্জেন্সি ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেবা চালু ছিল। লক্ষ্যণীয়, এমন ধর্মঘট বাংলাদেশে হলে হয়ত ডাক্তারদের গণহত্যা করা হত। বাংলাদেশে কখনোই কোন ধর্মঘটে কোন পাবলিক হাসপাতাল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়নি।

NHS: National Health Service (England)

১৯৬২ সালের ১জুলাই কানাডার সাসকাচুয়ান প্রদেশে ডাক্তাররা নতুন স্বাস্থ্যবীমার প্রতিবাদে সর্বাত্মক ধর্মঘটে যান। এবং রোগীরা ক্লিনিকে গিয়ে দেখতে পানঃ This sign was on the door of the Prince Albert Clinic to notify patients that the doctors were going on strike on July 1, 1962.Saskatchewan Archives Board, George and Tillie Taylor। এরপর আবার কানাডার অন্টারিও এবং এলবার্টাতে ১৯৮৬ সালে ডাক্তারদের একটি ঐতিহাসিক ধর্মঘট সংঘটিত হয় নবপ্রযুক্ত স্বাস্থ্যবীমায় ডাক্তারদের অতিরিক্ত বিল নেবার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায়। ডাক্তাররা ৭ মে গণসমাবেশ করে এবং ২৯ ও ৩০ মে তাদের অফিস বন্ধ রাখে এবং ১২ জুন সর্বাত্মক ধর্মঘট আহ্বান করে। চারদিন পর কুইন্স পার্কে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সাথে নিরাপত্তারক্ষীদের সংঘর্ষ বাধে,যে টা জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ জুন টরোন্টোতে ১০টি ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ জুন, ১৯৮৬ নিউমার্কেটে ইয়র্ক কাউন্টি হসপিটালটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। এসময় the College of Physicians and Surgeons of Ontario ডাক্তারদের এসেনশিয়াল সার্ভিস বা অপরিহার্য সেবা প্রদানের অনুরোধ করে, নইলে তারা প্রোফেশনাল মিসকন্ডাক্টের দায়ে অভিযুক্ত হবেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। উল্লেখ্য ২৫ দিন ব্যাপী এই আন্দোলনের জনসমর্থন ছিল খুবই কম, সহযোগী স্বাস্থ্যকর্মী যেমন নার্সরা এর তীব্র বিরোধিতা করে। আন্দোলনরত চিকিৎসকদের চেয়ে ক্ষুদ্র একটি চিকিৎসকগোষ্ঠী সরকারপক্ষের সব নিয়ম মেনে নেয়। এই আন্দোলনের ফলে পেশাটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই পলিসিটি বাস্তবায়িতও হয়। বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত চিকিৎসকদের এমন কোন ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় নি।

চিকিৎসকদের ধর্মঘট হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বিশ্বের সেরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার দেশ ফ্রান্সেও। ২০০২ সালের ২৩ জানুয়ারী ফ্রান্সের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চিকিৎসক কনসালটেশন ফি বাড়ানোর দাবীতে ধর্মঘট করেন। এরপর ২০০৫ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ফ্রেঞ্চ এসোসিয়েশন অফ হসপিটাল ইমার্জেন্সি ডক্টরসের নেতৃত্বে ফ্রান্সের পাবলিক এবং ইউনিভার্সিটি হাসপাতালগুলোর ইমার্জেন্সিতে এক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাস্থ্য-প্রশাসক, নার্স এবং এম্বুলেন্স ড্রাইভাররাও যোগ দেন। আন্দোলনরত চিকিৎসকগণের দাবী শুধু উন্নত কর্ম পরিবেশ, অধিক স্টাফ, বেশি বেতন, বেশি শয্যার দাবীই তোলেন নি, বরং সমগ্র ইমার্জেন্সি এবং 'আউট অফ আওয়ার' কাজের পুনর্বিন্যাসের দাবী করেছেন। কাজের পরিবেশের উন্নতি ও কর্মঘণ্টা হ্রাস করার দাবীতে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের ছুটির সময় ফ্রান্সের তরুণ চিকিৎসকদের ইউনিয়ন একটি ধর্মঘট আহ্বান করে।

চিকিৎসকদের ধর্মঘট কখনোই কাম্য নয়। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে এ ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তাদের হাতে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে,উন্নত দেশের চিকিৎসক-ধর্মঘটের সাথে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের ধর্মঘটের বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। উন্নত দেশের চিকিৎসকগণ যেখানে ধর্মঘট করেছেন বেশি বেতন, প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ, উন্নত কাজের পরিবেশ, কম কর্মঘণ্টা ইত্যাদি দাবীতে সেখানে আমাদের চিকিৎসকদের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বিক্ষিপ্তভাবে ধর্মঘট করেছেন শুধুমাত্র "নিরাপদ কর্মস্থলের" দাবীতে বা আহত বা নিহত চিকিৎসকের প্রতি সংঘটিত অপরাধের বিচার চেয়ে। কাজেই আমাদের চিকিৎসকদের আন্দোলন অনেক বেশি নিঃস্বার্থ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য দেশের চিকিৎসকবৃন্দের ধর্মঘট যেমন ব্যাপক ও সর্বাত্মক আমাদের তেমন নয়।১৯৬২ তে আমেরিকাতে এবং ১৯৮৬ তে কানাডায় বেশ কিছু হাসপাতাল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে,এদেশের কোন পাবলিক হাসপাতালেই ইমার্জেন্সি ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার সেবা কখনোই বন্ধ করা হয় নি কোন ধর্মঘটে।

কখনোই সবস্তরের চিকিৎসক একত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘট করেননি এবং অধিকাংশ সময়েই ধর্মঘট শুধু ইন্টার্নদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য সকল পর্যায়ের চিকিৎসক কর্তব্যরত থাকেন। তৃতীয়ত, উন্নত দেশের সংবাদ মাধ্যমে ধর্মঘটের রিপোর্ট পড়লে দেখা যায় একটা নিরপেক্ষ অবস্থান। বারবার বলা হয় যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার, ইমার্জেন্সি, ক্যান্সার কেয়ার ইত্যাদি চালু আছে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের কোন সংবাদ-মাধ্যমেই সচরাচর ইমার্জেন্সি, আইসিইউ, করোনারি কেয়ার ইউনিট খোলা রাখার কথাটি প্রচার করা হয় না। চতুর্থত, প্রায়ই নন-আর্জেন্ট পেশেন্টদের ছবি ছাপিয়ে রোগীদের "জিম্মি করা" প্রভৃতি অযৌক্তিক শব্দ এবং ভোগান্তির অতিরিঞ্জিত চিত্র পেশ করা হয়। আমার নিজের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের সময় ইন্টার্নরা নারী ইন্টার্নকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিল। আমরা মধ্যপর্যায়ের চিকিৎসকরা খুব সহজেই এই ঘাটতি পূরণ করে নিয়েছিলাম এবং ইন্টার্নদের কাজ আমরা করাতে আরো দ্রুত কাজ শেষ হয়েছিল। ইন্টার্নদের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হলে বুঝতে হবে যে, সিস্টেম আবার দাবী করছে যে, সরকারী মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ইন্টার্নদের আবার অতীতের মত ইন সার্ভিস ট্রেইনী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হোক এবং তাদের ট্রেনিং পোস্টগ্রাজুয়েশনে গণ্য করা হোক। বর্তমান ব্যবস্থায় ইন্টার্ন যেহেতু সরকারী কর্মচারী নয়-জনগণ তাদের সাথে প্রায়ই সাধারণ সৌজন্যটুকুও রক্ষা করে না। অত্যধিক রোগীর চাপে ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে খারাপ ব্যবহার করেন সেটা তাঁরা স্বীকারও করেন। বেশ কিছু চিকিৎসক পেশার মর্যাদাহানী করছেন-এটাও সত্যি। কিন্তু তার জন্য সব চিকিৎসক দায়ী নন। বিশেষত, তরুণ চিকিৎসকদের সততা, ত্যাগ আর উদ্যমের ওপরই এই অন্যতম দরিদ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থাটি টিকে আছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, চিকিৎসকদের ধর্মঘট শুধু বাংলাদেশ নয়, বরং সমগ্র বিশ্বেই কোন বিরল ঘটনা নয়।

চিকিৎসক দিবস, কিছু কথামালা

ডাঃ খোশরোজ সামাদ, রাজশাহী এমসি

গত ৩০ মার্চ ছিল বিশ্ব চিকিৎসক দিবস। চিকিৎসাকে আমি নিছকই পেশা বা অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে দেখি না, বরং Dedication , Possesion and passion হিসেবে আমার দীক্ষাগুরুরা শিখিয়েছেন আর আমিও সেটি বিশ্বাস করে এসেছি।

চিকিৎসা প্রদান নিছক একটি প্রেসক্রিপশন লেখা নয়, বরং রোগীকে বা তার অভিভাবককে রোগটির সম্বন্ধে সম্যক ধারণা দেওয়া, ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্মন্ধে সতর্কীকরণ করে দেয়াকে আমি মৌলিক কর্তব্য বোধ বলেই জেনে এসেছি। একজন রোগী যদি পেশায় মেথর হন ,আর তার যদি কষ্ট পায়ে ব্যথাও হয় আমি নিজে হাত দিয়ে রোগীর পদ যুগল হাত দিয়ে স্পর্শ করে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত প্রেসক্রিপশন লিখি না, এটি আমার বোধ, এটি আমার চেতনা !

রোগীর বর্ণ-গোত্র-সামাজিক অবস্থান নয় "মানুষ"এর চিকিৎসাই আমার ব্রত। আমি আমার পেশার সম্মান আমার শ্রম আর সাধনায় উচ্চে তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকতে চাই। আর শুধু যান্ত্রিক চিকিৎসক হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে' মানুষের' চিকিৎসা করতে চাই মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত !

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলাম (চিকিৎসকের উপর হামলা : গন্তব্য কোথায়)

হাতের কাছেই আছে ডাক্তার আর নার্স সুতরাং পেটাও তাদের। বেচারা ডাক্তারের অবস্থা হয়ে গেছে হকি মাঠের রেফারির মত পুরো মাঠের মধ্যে তার হাতেই কোন লাঠি নেই। সুতরাং পেনাল্টি কর্নার মিস হোক বা গোলকিপার সেভ করতে না পারুক দোষ রেফারির, তাকে মারো। মার খেয়েও রেফারি মহোদয় শুধু বাঁশিই বাজিয়ে যান,আর জান বাজি রেখে দৌড়ে পালান। গত কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলোকে পুঁজি করে চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষদের পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেবার একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে । কিছুদিন আগে বারডেম হাসপাতালে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির কথাই ধরা যাক। কে বা করা কি উদ্দেশ্যে হামলা করেছে কিংবা চিকিৎসকের কোন অবহেলা ছিল কিনা সেগুলো তদন্তসাপেক্ষ কিন্তু এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে সেদিন চিকিৎসকরা কর্মস্থলে কর্তব্যরত অবস্থায় আক্রান্ত ও আহত হয়েছে। এরা সবাই কঠিন প্রতিযোগিতা পার করে দেশের প্রথম সারির মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হয়েছিল পাশ করে বেরোনোর পর আরও কঠিন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হবার পথে। তাঁদের স্বজনরা যখন খবর পেলেন যে তার ছেলে বা মেয়েটি রোগীর জীবন বাঁচাতে গিয়ে এখন নিজেরাই আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ তখন তাদের মনের অবস্থা কি রকম ছিল? কিংবা যে চিকিৎসক হামলা থেকে বাঁচতে টয়লেট লুকিয়ে রেহাই পেলেন না, অথবা যাদেরকে মাটিতে ফেলে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হল, তাদের? তাদের এই চিকিৎসকদের যখন একা কোন হাসপাতালে ডিউটিতে পাঠানো হবে,তাঁরা কি নিজেদের আর নিরাপদ মনে করতে পারবেন? ঢাকা মেডিকেল কলেজের সেই চিকিৎসকের কি হবে, যিনি ডিউটির ফাঁকে খেতে গিয়ে দুর্বত্তদের প্রহারে আহত হয়ে আইসি ইউতে ভর্তি হলেন? তাঁরা হাসপাতাল থেকে কোন বেতন পাননা,কারণ তাঁরা "অনারারী" দেশের শীর্ষস্থানীয় একাডেমিক হাসপাতালগুলোর মূল চালিকাশক্তি এই অবৈতনিক চিকিৎসকরা। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এ ধরনের অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে বলে জানিনা,যেখানে পুরো কাজ করেও কোন বেতন পাওয়া যায় না। তারপরও তাঁরা বেতনের দাবিতে কখনো বিক্ষোভ করেননি,বিক্ষোভ করেছেন নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে। কিন্তু রোগী দুর্ভোগের একটা অজুহাত দিয়ে সেটাকেই ছবিসহ প্রথম পাতায় খবর হিসেবে ছাপানো হয়েছে, যেখানে চিকিৎসকের ওপর হামলার খবর এসেছে ছোট্ট করে পেছনের পাতায়।

প্রাসঙ্গিক হবে কিনা জানি না তবে চিকিৎসা সাংবাদিকতার কথাও এখানে না এনে পারছি না। এদেশে বিশেষত চিকিৎসক হতে এমবিবিএসের পর চার-পাঁচ বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাগে, কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা সাংবাদিক হতে কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নেই। কোন ধরনের তদন্ত বা প্রমাণ ছাড়াই হরদম পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে-"ভুল চিকিৎসার রোগীর মৃত্যু।" চিকিৎসকরা ভুলের উর্ধ্বে নন,কিন্তু সে ব্যাপারে মতামত দেয়ার অধিকার রয়েছে শুধু সে বিষয়ের বিশেষজ্ঞের। রানা প্লাজার নির্মাণ ত্রুটি কিংবা অর্থমন্ত্রীর দেয়া বাজেটের বাস্তবমুখিতা নিয়ে কোন ডাক্তার বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন বলে শুনিনি। অথচ চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপার এলেই বীরবলের গল্পের মত সবাই ডাক্তার হয়ে যান। আমি বলছিনা যে সাংবাদিকদের দরকার নেই, কিন্তু সংবাদের উদ্দেশ্য যেন গঠনমূলক হয়। শুধুমাত্র পাবলিক সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য আংশিক সংবাদ পরিবেশন করা কারো জন্যই সুফল বয়ে আনবে না।

অনেকে হয়তো বলবেন এত কথা না বলে চিকিৎসার মান ভাল করেন, সব আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে, চিকিৎসকের মান ভাল হলেই চিকিৎসার মান ভাল হবে যাবে তা নয়। চিকিৎসা একটা বড় ব্যাপার, চিকিৎসক এখানে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এর বাইরেও প্রচুর সার্পোট সার্ভিস দরকার যেগুলো ছাড়া চিকিৎসার সুফল রোগীর কাছে পৌছবেনা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গেলেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক হয়তো হৃদরোগের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত, কিন্তু হাসপাতালে কোন ইসিজি মেশিন,কার্ডিয়াক মনিটর, ইমাজেন্সী কার্ডিয়াক ঔষধ হয়তো নেই। জেলা হাসাপাতালে পাঠাবেন, এ্যাম্বুলেন্স নষ্ট কিংবা ড্রাইভার নেই। এই রোগী যখন বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন, তার দায় যতটা না চিকিৎসকের, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী প্রশাসক ও নীতি নির্ধারকদের। অন্যদিকে বলা হচ্ছে চিকিৎসকদের নৈতিকতার কথা। এখানে শুধু এটুকু বলব, নৈতিকতা শিক্ষার মাধ্যম কিন্তু পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সমাজ। যে শিশুটি ছোটবেলা থেকে দেখছে প্রাইভেট না পড়লে টিচার মার্কস দেননা, খুঁটির জোর ছাড়া চাকরি হয় না, একটু আধটু দুর্নীতি ছাড়া জীবনে উন্নতি করা যায় না, সেই ছেলে বা মেয়েটি আঠারো উনিশ বছর বয়সে মেডিকেল কলেজে ঢুকে কোন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় পাঁচ বছর পর আদর্শ মানুষ হয়ে বের হবে, এই চিন্তাটাই হাস্যকর। পুরো জাতির নৈতিক অবক্ষয়ের প্রভাব চিকিৎসকদের ওপর পড়বেই, কেননা তারা সমাজেরই অংশ। এর প্রতিকার করতে দরকার জাতীয় উদ্যোগ। শুধুমাত্র ডাক্তারদেরকে সৎ হয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে সস্তা বাহবা পাওয়া গেলও কাজের কাজ কিছু হবেনা। কেবল চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নই যে হাসাপাতালে হামলা নৈরাজ্য ঠেকাতে যথেষ্ট নয় তার একটা উদাহরণ দিই। ২০১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের সোলাপুর সিভিল হাসাপাতালের একজন চিকিৎসককে কর্তব্যরত অবস্থায় আক্রমণ করা হয়। প্রতিবাদে পুরো মহারাষ্ট্রের প্রায় চার হাজার রেসিডেন্ট চিকিৎসক অনির্দিষ্ট কালের ধর্মঘটের ডাক দেন। অধ্যাপক ও সিনিয়র চিকিৎসকদের মাধ্যমে জরুরী সেবা শুধু চালু রাখা হয়েছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে মুম্বাই হাইকোট প্রশাসনকে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী তড়িৎ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। ঘটনার সাত দিন পর হামলাকারীরা আদালতে আত্মসমর্পণ করলে চিকিৎসকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে ফিরে যান। (সূত্র-যদি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ও ০৮ই জানুয়ারি ২০১৪)।

মহারাষ্ট্রের এই ঘটনার দ্রুত সমাধানের পেছনে ছিল মহারাষ্ট্র এসোসিয়েশন অব রেসিডেন্ট ডক্টরস এর দৃঢ় অবস্থান, প্রশাসনের সদিচ্ছা এবং চিকিৎসকের ওপর হামলা রোধকল্পে প্রণীত একটি কঠোর আইন। Medicare service Persons and Medicare service Institution Act (MMS PMSI) নামের আইনটি মহারাষ্ট্রে বলবৎ রয়েছে ২০০৯ থেকে, এবং প্রায় একই রকম আইন রয়েছে দিল্লী হরিয়ানা উড়িষ্যা সহ ৮টি রাজ্যে আইনটির কিছু অংশে। এখানে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছিনা-

MMSPMSI Act-
Section-3,

Any act of violence against a Medicare service person or damage or loss to the property in a Medicare service Institution shall be prohibited.

Section-4,

Any Offender, who commits or attempts to commit or abets or incites the commission of any act of violence in contravention of the provisions of sector-3, shall be punished with imprisonment which may extend to three years and with fine which may extend to fifty thousand rupees.

Section-5,

Any offence commited under this act, shall be cognizable and non-bailable and triable by the court of Judicial Magistrate of the first class.

(সূত্র- দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ০৪ জানুয়ারি ২০১৪)

চিকিৎসকদের রক্তে ভেজা এপ্রোন

মোদ্দা কথায়, চিকিৎসা সেবাদাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলার অপরাধটি জামিন অযোগ্য এবং এর জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার রুপি জরিমানা হতে পারে। আমরা কি এরকম কঠোর একটি আইন বা শক্তিশালী চিকিৎসকদের সংস্থা চাইতে পারি না? আশান্বিত হতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু মনের কোণে জমা আশাঙ্কার মেঘটাই যেন বেশী ভারী। জাতি হিসেবে আমরা যে অকৃতজ্ঞ তার প্রমাণতো পদে পদেই দিয়ে চলেছি। শিক্ষকতার মত মহান পেশাকে আমরা এতটাই নিচে নামিয়ে এনেছি যে ক্লাসের প্রথম শ্রেণীর কোন ছাত্র এখন শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চায় না। নিরুপায় হয়ে যারা এ পেশায় আসেন তাদের জীবিকার জন্য দ্বিতীয় কোন পন্থা দেখতে হয়,অথবা বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া খেতে হয়। ফলাফল প্রচুর জিপিএ-৫ কিন্তু শিক্ষার মান নিম্নমুখী। আজ থেকে পাঁচ বছর পর চিকিৎসা শিক্ষায় ও যে এ অবস্থায় আসবে না তাকে বলতে পারে? নতুন প্রজন্মের চিকিৎসকরা এখনই সরকারী চাকুরিতে অনাগ্রহী। কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে প্রকৌশলীদের মত মেধাবী চিকিৎসকরাও পাশ করেই উড়ে যাচ্ছেন অন্য কোন দেশে। এই দেশেও কিছু ভাল চিকিৎসক, ভাল হাসপাতাল হয়তো থাকবে, কিন্তু অনুমিতভাবেই সেগুলো হবে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। সাধারণ মানুষ তখন চিকিৎসার জন্য কোথায় যাবে?

আমার জানা নেই। কেউ যদি জেনে থাকেন তবে জানাবেন।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলাম
(পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ বিবাদ মিটাবে)

স্কুলজীবনে এইম ইন লাইফ লিখতে গিয়ে দেখতাম অনেকে লিখতেন ভবিষ্যতে ডাক্তার হবেন। ডাক্তার হয়ে গ্রামে যাবেন। গরিব মানুষকে চিকিৎসাসেবা দেবেন। সেই তাদেরই একটি অংশ মেধা এবং জনগণের টাকায় ডাক্তার হয়ে গ্রামে যান না। টাকার জন্য পাগল। ভুল চিকিৎসা, অমানবিক আচরণ আর সংবাদকর্মীদের ওপর হামলাও করেন অনেক সময়। গ্রামে গ্রামে ডাক্তার নেই। জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার সংকট প্রকট। প্রাইভেট প্র্যাকটিস, ক্লিনিক ব্যবসার গোপন অংশীদারিত্ব, দলবাজিতে মগ্ন হয়ে তদবির, নিয়োগ, পোস্টিং বাণিজ্য মিলিয়ে চিকিৎসাব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করে দিচ্ছে। চিকিৎসাব্যবস্থাকে গণমুখী করতে প্রতিটি সরকার চেষ্টা করে। দলবাজদের জন্য পারে না। বর্তমান সরকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে।

অন্যদিকে চিকিৎসকরা গ্রামে যেতে চান না কেন? এমন প্রশ্নেরও নানা কারণ আছে। সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পুরুষের চেয়ে, নারী চিকিৎসকের সংখ্যা বেশি। তাদের গ্রামে পোস্টিং হলেও নানা কারণে থাকা সম্ভব হয় না। কারণ, গ্রামের পরিবেশে মেনে নেওয়া কঠিন। আর যারা লাখ লাখ টাকা খরচ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করেন তারাও গ্রামে যেতে চান না। এজন্য চাকরি চলে গেলেও তারা কর্ণপাত করেন না। কারণ অনেকের পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতি ভাল। আর যাকে গ্রামে পাঠানো হয় তাঁকে ভবিষ্যতে কোথায় দেওয়া হবে তাও ঠিক থাকে না। যদিও সম্প্রতি মন্ত্রী বলেছেন, গ্রামে তিন বছর থাকলে, ভালো জায়গায় পোস্টিং হবে। অন্যদিকে স্থানীয় রাজনীতি করা অনেক সময় চিকিৎসকের কাছ থেকে নানা ধরনের সুবিধা আদায় করেন। এসব ঝামেলার কথা চিন্তা করে অনেকে সেখানে যেতে চায় না ডাক্তাররা। তবে ভাল চিকিৎসক হলে গ্রামেও কিন্তু অনেক প্র্যাকটিসের সুযোগ থাকে। আর গ্রামে ভাল স্কুল-কলেজ থাকলে পরিবার পরিজন নিয়ে ভবিষ্যতেও সেখানে থাকতে চিকিৎসকেরা উদ্বুদ্ধ হবেন। এছাড়া চিকিৎসকের অন্যায় দেখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আছে। কোনো চিকিৎসকের বিষয়ে অভিযোগ থাকলে তা ওই প্রতিষ্ঠানকে জানাতে পারি। নিজেরা কেন সরাসরি তাদের সঙ্গে বিবাদে জড়াবো। কেননা চিকিৎসকরা যদি অন্যায় করে তবে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এজন্য নীতিমালা আছে। চিকিৎসক অনিয়ম করলে তাঁর নিবন্ধন বাতিলও হতে পারে। যেন তিনি প্র্যাকটিস করতে না পারেন। একইসঙ্গে সাংবাদিকরাও যদিও কোন অন্যায় করে তবে তাদেরও নানা সংগঠন আছে। সেখনে তাদের বিষয়ে জানানো যেতে পারে। জেলা-উপজেলায় তো প্রেসক্লাব রয়েছেই। সাংবাদিকদের বিষয়ে অভিযোগ থাকলে সেখানে জানিয়ে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। তাই বলে তাদের মারধর কারাটাও শোভা পায় না। তারাও তো সাধারণ মানুষের পাশেই থাকে। মানুষের সুখ-দু:খের কথা তুলে ধরে লেখনির মাধ্যমে। যাই হোক-মাঝে মাঝে সাংবাদিক-ডাক্তার বিবাদ, রোগীরদের সঙ্গে ডাক্তারের মারামারি, সব ঘটনায় কেন যেন একটা রহস্যের মধ্যে ঘুরপাক খায়। তাই মনে হয়-এটা একটা আন্দোলন জমানোর নতুন ফাঁদও হতে পারে। বর্তমানে অনেক সেক্টরেই আন্দোলন-সংগ্রাম হচ্ছে না। তাই হয়তো স্বাস্থ্য খাতকে বেছে নেয়া হতে পারে। যারা রাজনৈতিকভাবে এই আন্দোলনের-সংগ্রামের সুবিধা নিতে চাইছে তারা এর পেছনে প্ররোচনা দিচ্ছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করছে না এটা তো নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

(robbani84@gmail.com)

নিরাপদ কর্মস্থল চাই

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলাম (হাসপাতালে কী ঘটে, মিডিয়াতে কী আসে)

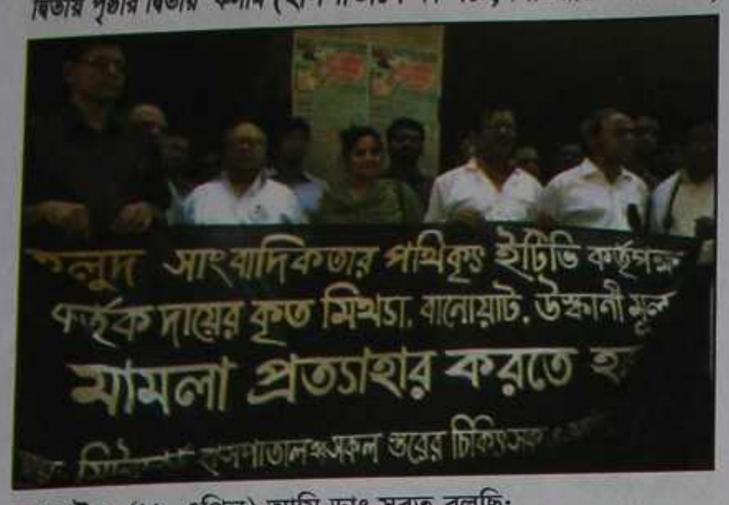

দৃশ্যপট ২ (১৯ এপ্রিল) আমি ডাঃ সুব্রত বলছি:
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতলের যে ঘটনা নিয়ে মিডিয়াতে তোলপাড় চলছে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা জ্ঞাপন করছি। আমাকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার পুরোটা নিচে তুলে ধরলাম: যে রোগীটা এসেছিল সেটি ছিল Conversion Disorder এর রোগী। আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য পেইনফুল stimulus দেই। এবং তাকে ধমক দিয়ে টেনে তুলে বসানোর চেষ্টা করি। তাকে ধমক দেয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তার সাথে থাকা attendant আমার উপর চড়াও হয়ে আমাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে।
(বি: দ্র: এত কিছুর পরেও সেই রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয় এবং রোগী কিছুক্ষণ পরেই সুস্থ হয়ে যায়।) আমি ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যাই। আমি রোগীর লোকের উপর রেগে গেলে সে আবার আমার উপর চড়াও হয়। আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দায়িত্বরত পুলিশ এবং পরিচালককে ঘটনাটি অবহিত করি। সেই সাথে আমার সহকর্মী ডাক্তারবৃন্দকে ফোনে ঘটনাটি জানালে তারা আমাকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য ১৩ নং ওয়ার্ডের সামনে চলে আসে। কিন্তু ইতোমধ্যে পরিচালক পুলিশসহ ওয়ার্ডে চলে আসেন। এবং কোনও ইন্টার্ন ডক্টরকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেন নি।
ঘটনার এক পর্যায়ে পুলিশ এবং সাংবাদিকদের সাথে আমার সহকর্মীদের বাদানুবাদ হয়। এবং এতে আমার অনেক সহকর্মী (বিশেষ করে মেয়ে সহকর্মী) লাঞ্ছিত হয়। হাসপাতালে ডাক্তারের অবহেলায় রোগী মারা গেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সাংবাদিকবৃন্দ হাসপাতালে ভিড় জমায়। আমার সহকর্মীদের কেউ কেউ সাংবাদিকদের চলে যেতে বলে। সাংবাদিকরা চলে যাওয়াতো দূরের কথা, উল্টো ফুটেজ নিতে থাকে। এবং তারা বহিরাগত কিছু লাঠিসোটা ধারী লোক নিয়ে আমার সহকর্মীদের উপর চড়াও হয়। এই আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে আমার কয়েক বন্ধু-বান্ধবী আহত হয়।
গণমাধ্যমে খবর: ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু, প্রতিবাদ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের মারধোর করলেন সন্ত্রাসী ডাক্তারেরা! (অধিকাংশ চ্যানেল রোগী মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করেছে।)
দৃশ্যপট ৩ (২১ এপ্রিল) কোন প্রকার অনুমতি ব্যাতিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের রেসপিরেটরি মেডিসিনের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের রুমে ঢুকে "ভুল চিকিৎসা" ধরতে যেয়ে স্যারকে লাঞ্ছিত করা এবং অপমান করে ভিডিও ফুটেজ গ্রহন। ততক্ষণে বাকি ডাক্তারেরা জানতে পেরে সাংবাদিকের ক্যামেরাসহ আটক। ডিরেক্টরের প্রহরায় তাদের অবস্থান এবং আরো সাংবাদিকের আগমন। টিভিতে নিউজ-"খবর সংগ্রহ করতে যেয়ে সাংবাদিক প্রহৃত" ফলে সাংবাদিকদের সাথে তরুণ ডাক্তারদের হাতাহাতি ক্যামেরা ভাংচুর। সাংবাদিক কর্তৃক ডাক্তারদের বিরুদ্ধে মামলা। সলিমুল্লাহ মেডিকেলের সর্বস্তরের ডাক্তারদের মানব বন্ধন।
গণমাধ্যমে খবর: খবর সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের প্রহার করেছেন চিকিৎসকেরা
দৃশ্যপট ৪ (১৮ মে) রোগীর টিবিয়া ফ্র্যাকচার ছিল। এই ফ্র্যাকচার থেকে পালমোনারী এম্বোলিজম হওয়া বিরল হলেও অস্বাভাবিক কিছু না। অর্থোপেডিক্সের রোগী হলেও এই কেস তাকে নিয়ে মেডিসিন এবং রেসপিরেটরি মেডিসিনের প্রফেসররা মেডিকেল বোর্ড করেছেন। রোগীকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। বাঁচার সম্ভাবনা অনেক কম ছিল। রোগীর এটেন্ডেন্টদের সেভাবে কাউন্সেলিংও করা হয়েছিল। তারপর রোগীটা সকালে মারা গেলে ভুল চিকিৎসা হয়েছে দাবী করে তাঁর কয়েকজন আত্মীয়স্বজন এসে একজন এসিস্ট্যান্ট রেজিস্টারের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে এবং এক পর্যায়ে তাঁর গায়ে হাত তোলে। ডক্টর্স রুমে ভাংচুর চালায়। পরবর্তীতে ইন্টার্নদের সাথে বচসা হয়। পুলিশ এসে সেই বিশৃংখলাকারীদের না ধরে আরেকজন চিকিৎসককে ধমকাতে থাকে কেন রোগীর আত্মীয়দের গায়ে হাত তোলা হল। এতে পুলিশের সাথেও বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দোষীরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সেজন্য ইউনিটের মেইন গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু সংবাদকর্মীরা গেট খোলার জন্য জোর জবরদস্তি শুরু করে। পরবর্তিতে সিনিয়র প্রফেসরদের হস্তক্ষেপে সাংবাদিকদের হেড অব দ্যা ডিপার্টমেন্টের রুমে নিয়ে ব্রিফ করা হয়। সবশেষে তারা ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীর স্বজনদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছে। এই হল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশালের পরিস্থিতি ।
দৃশ্যপট ৫ (০৬ মে) ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল নতুন ভবনে ঢুকতেই রোগীদের ব্যবহারের জন্য পাঁচটি লিফট আছে। বড় আকৃতির এই লিফটগুলোতে করে রোগীর স্ট্রেচার, হুইল চেয়ারসহ রোগীর অ্যাটেনডেন্টরাও ওঠানামা করেন। ভবনের অপর দিকে ডাক্তারদের ব্যবহারের জন্য দুটো ছোট ইমারজেন্সি লিফট আছে। তার মধ্যে একটা নষ্ট। বাকি একটা ছোট লিফটে করেই বিভিন্ন প্রয়োজনে, বিভিন্ন ফ্লোরে ডাক্তারদের দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। লিফটের বাইরে বাংলা ও ইংলিশে পরিষ্কার লেখা আছে, "শুধুমাত্র ডাক্তার ও নার্সদের ব্যবহারের জন্য"। আজকের ঘটনা। দুই ডাক্তার ভাই লিফটে উঠতে গিয়ে দেখেন যে লিফটে রোগীদের লোকজন উঠে আছে। ভাইয়ারা তাদের বলেন এটা শুধুমাত্র ডাক্তারদের জন্য। রোগীদের লিফট অন্যদিকে। প্রথমে তাদের নামতে অনুরোধ করলে তারা অস্বীকৃতি জানায়। এর পরে ব্যাপারটা বাক-বিতণ্ডার দিকে গড়ায়। ঐ অ্যাটেনডেন্ট এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, 'আমি কে, আমারে তুই চিনছ! তুই কোনহানকার ডাক্তার আইছস! ডাক্তারি দেখাছ?!!'
প্রতিবাদ করতে গেলে এক ডাক্তার ভাইকে তারা ধাক্কা দিয়ে লিফট থেকে বের করে দেন। আরেক ডাক্তার ভাইকে লিফটের মধ্যেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। লিফটের বাইরের ডাক্তার ভাই অনেকবার তাদের টেনে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পাশেই নিরাপত্তার কাজে চারজন আনসার দাঁড়িয়ে ছিল। তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ দূরত্ব থেকে ঘটনাটা দেখতে থাকে। কয়েকজন লিফটে ঢুকে মেঝেতে পড়ে থাকা ওই ভাইয়াকে উপর্যুপরি লাথি মারতে থাকে। ভাইয়া ডাক্তার মানুষ। পড়ালেখা বাদে সারাজীবন আর কিছুই করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ঐ গুণ্ডাদের সামনে তিনি উঠেই দাঁড়াতে পারলেন না। তাকে পায়ের নিচে ফেলে পাড়াতে পাড়াতে লিফট তিনতলা থেকে সাততলায় চলে গেল। খবর পেয়ে আমাদের সিএ, আইএমও ভাইয়ারা ছুটে এলেন। উপস্থিত অনন্য রোগীর স্বজনেরা তাদের দেখেই চিৎকার করে উঠলো,'স্যার!! ডাক্তার সাহেবকে বাঁচান স্যার! নাইলে আজকে ওনারে মাইরাই ফালাইব!'
ভাইয়ারা সাথে সাথে তাদের থামানোর চেষ্টা করলেন। ফোন করে অন্য ডাক্তারদের ডেকে আনলেন। সবাই মিলে অনেক ধস্তাধস্তির পরে তাদের থামানো সম্ভব হল। ওই দুইজনকে আটক করা হল। বাকি সহায়তাকারীদের আনসারদের হাতে দেয়া হল। তারা আনসারদের হাত ছুটে পালিয়ে গেল। একই ঘটনার জের ধরে পরবর্তিতে চানখার পুলে খেতে গেলে চিকিৎসক প্রহৃত হন, দোষীরা থেকে যায় সকল কিছুর উর্ধ্বে ।
গণমাধ্যমের খবরঃ "ঢাকা মেডিকেলে ডাক্তারদের হাতে রোগীর লোক, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র প্রহৃত।"
সম্পাদনায় ডাঃ তানভীর আহমেদ, ১৩তম ব্যাচ,ঢাকা ন্যাশনাল এমসি

দেশব্যাপী চিকিৎসক নির্যাতনের প্রতিবাদে বিএমএ'র চার দফা কর্মসূচি পালিত

গত ১৪-১৫ মে দেশব্যাপী চিকিৎসক নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন ঘোষিত চার দফা কর্মসূচী পালিত হয় । কেন্দ্রীয় বিএমএ'র আয়োজনে মানব বন্ধনে চিকিৎসকেরা কর্মক্ষত্রে নিরাপত্তার জোর দাবি

তোলেন। এছাড়াও হামলাকারীদের গ্রেফতার এবং দ্রুত আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান তারা। এর আগে দেশব্যাপী চিকিৎসক নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজধানীর তোপখানা রোডের বিএমএ ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চার দফা কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা করেন সংগঠনের মহাসচিব অধ্যাপক ইকবাল আর্সলান। এ চার দফা কর্মসূচি হলো-
১. ১৪ মে সকল চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কালো ব্যাজ ধারণ,
২. ঐ দিন রাজধানীর শাহবাগ চত্বরে দুপুর ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত মানববন্ধন,
৩. মানববন্ধন চলাকালে দেশব্যাপী চিকিৎসকদের এক ঘণ্টার কর্মবিরতি। তবে এসময় জরুরি চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
৪. পরের দিন ১৫ মে সকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রাইভেট চেম্বারে বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করা হবে।
কর্মসূচি ঘোষণার সময় সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএমএ'র সভাপতি ডা. মাহমুদ হাসান, সহ-সভাপতি ডা. কামরুল হাসান খান, যুগ্ম-মহাসচিব ডা.এমএ আজিজ প্রমুখ।

বিএমএ মহাসচিব ডা. ইকবাল আর্সলান অভিযোগ করেন, দেশে গত ছয় মাসের চিত্র দেখলে বোঝা যায়, চিকিৎসক নির্যাতনসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে কোনো বিশেষ চক্র কাজ করছে। সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলায় এখন পর্যন্ত ২২টি হামলা ও মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটেছে।
(www.platform-med.org থেকে সংগৃহীত)

সমস্যায় জর্জরিত পাবনা মেডিকেল কলেজ

প্রতিষ্ঠানটির জন্মলগ্ন থেকেই নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত পাবনা মেডিকেল কলেজ, কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি নির্বিকার সেখানে। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় সেখানকার চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে-
নিচে সমস্যাগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা হলো-
১) পর্যাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারী নেই সেখানে। প্রতি ডিপার্টমেন্টে ১/২ জন করে শিক্ষক আছেন, কিছু ডিপার্টমেন্টে (ফিজিওলজি,প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজি) কোন শিক্ষকই নেই। ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলোতেও কোন শিক্ষক নেই। এগুলোর ক্লাস ও পরীক্ষা নেন সদর হাসপাতাল থেকে আসা ডাক্তাররা। ফলে পর্যাপ্ত ক্লাস ও যথার্থ সুযোগ পাচ্ছেন না ছাত্র-শিক্ষকরা। এমনিতেই শিক্ষক সংকট তার উপর যারা আছেন, তাঁরাও বিভিন্ন সমস্যা এড়াতে বদলি হয়ে যাচ্ছেন। যার ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ছে চরম বিপাকে।

২) মেডিকেল কলেজের নিজস্ব কোন হোস্টেল নেই। ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের জন্য পৃথক পৃথক ভবন দরকার অনেক আগে থেকেই। পাবনা মানসিক হাসপাতালের পরিত্যক্ত রুমগুলো স্টুডেন্টদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে যা মানের দিক দিয়ে খুবই নিম্ন।

৩) ইতোমধ্যে ৬টা ব্যাচের আগমন ঘটলেও নিজস্ব কোন হাসপাতাল নেই,ওয়ার্ড চলে সদর হাসপাতালে। যা মেডিকেল কলেজ থেকে সাড়ে ৯ কি.মি দূরত্বে অবস্থিত।

৪) কলেজের নিজস্ব কোন বাস না থাকায় কখনো ভাড়া বাসে বা কখনো স্টুডেন্টদের নিজস্ব খরচে হাসপাতালে যাতায়াত করতে হয়।

৫) সবচেয়ে বড় কথা হলো-হাসপাতালে যাতায়াতের পথে স্টুডেন্টদের (বিশেষ করে মেয়েদের) নিরাপত্তাজনিত সমস্যা। হোস্টেলে নিরাপত্তাকর্মীদের অনুপস্থিতির কারণে হোস্টেল থেকে প্রায়ই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন জিনিস চুরি হয়ে যায়। মেডিকেল কলেজ চালুর পর থেকেই কোন নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মচারী নিয়োগ না দেয়ায় মানসিক হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মচারী দিয়ে কাজ চালানো হতো। বর্তমানে মানসিক হাসপাতালের নতুন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক তাদের সরিয়ে নেয়ায় চেয়ার-টেবিল সরানোর মতো কাজও করতে হয় ছাত্র-শিক্ষকদের। ছাত্রীদের অস্থায়ী হোস্টেলের সামনে/পাশেই বসে স্থানীয় লোকজন ও নেশাখোরদের নিয়মিত আড্ডা। ফলে ছাত্রীদের যাতায়াতও অনেকটাই ঝুঁকির সম্মুখীন।

৬) কলেজের কোন নামফলক পর্যন্ত নেই।

৭) কলেজে কোন ক্যান্টিন,মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য কোন উপাসনালয় নেই।
আর হোস্টেলের ডাইনিংয়ের অবস্থাও প্রচন্ড খারাপ। এমনকি পাশের বাথরুম থেকে পানি এনে রান্নার কাজ চালানো হয় যা বেশ অস্বাস্থ্যকর।

৮) কলেজের নেই কোন কমন রুম, নেই কোন খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। একটি লাইব্রেরি থাকলেও তাতে পর্যাপ্ত বই না থাকায় ও বেশিরর ভাগ সময় বন্ধ থাকায় স্টুডেন্টরা কোন সুবিধাই পাচ্ছে না সেখান থেকে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার-২০১৪

নিলয় দাশ, ব্যাচ-২০, ফরিদপুর এমসি

প্রথমবারের মতো প্রদান করা হলো স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। শ্রেষ্ঠ সিভিল সার্জন অফিস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে পাবনা। জেলা হাসপাতাল ক্যাটাগরিতেও শ্রেষ্ঠ পাবনার সাঁথিয়ার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। 'উদ্দীপিত স্বাস্থ্যসেবা'র আওতায় মোট চারটি ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম প্রধান অতিথি হিসেবে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। টারসিয়ারি লেভেলে শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। রানার্স আপ হয়েছে যৌথভাবে, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। সিভিল সার্জন অফিস ক্যাটাগরিতে রানার্স আপ হয়েছে মুন্সীগঞ্জ সিভিল সার্ভিস অফিস। জেলা হাসপাতাল ক্যাটাগরিতে রানার্স আপ হয়েছে কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল। সব মিলিয়ে মোট ৪৯টি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান, মোট ৪৯৬টি প্রতিষ্ঠান এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

সন্ধানী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ইউনিটঃ পথপরিক্রমায় সেশন ২০১৩-১৪

আলী আজগর শিবলী,ব্যাচ-৩৮,উপদেষ্টা, সন্ধানী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ইউনিট।

১ এপ্রিল, ২০১৩। শুরু হল সন্ধানীর নতুন একটি সেশন। নতুন কার্য বর্ষে দায়িত্ব বর্তাল সভাপতি হিসেবে আমার আর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ব্যাচমেট বন্ধু শৈলীর কাঁধে। সেশনের শুরুটা হয় সাভার ট্র্যাজেডির শিকার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। সেই সময় সন্ধানী রংপুর মেডিকেল কলেজ ইউনিটে চলছিল সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়োজনে ৩২ তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলন। সন্ধানীয়ানরা প্রায় অধিকাংশই ছিল রংপুরে। কিন্তু সন্ধানী এসএসএমসি ইউনিট যে বাধা মানতে জানে না! অল্প যে ক'জন ক্যাম্পাসে ছিল তারাই ৩ দিনে ৭ টা রক্তদান কর্মসূচি করে ছয়শত ব্যাগেরও বেশি রক্ত সংগ্রহ করে আর সেই রক্ত পাঠানো হয় দূর্ঘটনা কবলিতদের সহায়তার উদ্দেশ্যে। এই সেশনে একটি বিশেষ কর্মসূচি ছিল ডোনারদের ফোন করে ইউনিটেই প্রোগ্রাম করা, যা আমাদের ইউনিটে প্রথমবার। এর ফলে দেশের প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সন্ধানী এস এস এম সি ইউনিটে রক্ত নিতে এসে শুণ্য হাতে ফেরেনি কেউ। কর্মীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই সেশনে আমাদের রক্ত সংগ্রহও ছিল অন্যান্য সেশনের তুলনায় বেশি। এপ্রিল'১৩ থেকে মার্চ'১৪ পর্যন্ত আমাদের সংগ্রহ ৩০৬২ ব্যাগ, যা আমার দেখা সর্বোচ্চ। আমাদের কর্মসূচী সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল পাবনা, মুন্সিগঞ্জের মত দূরবর্তী জেলাতেও। বর্তমানে মিটফোর্ড হাসপাতালের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ রক্ত সরবরাহ করছে সন্ধানী এসএসএমসি ইউনিট। এমনকি বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালেও ডোনার প্রেরণ করছি আমরা। সন্ধানীর এবারের একটা বড় সাফল্য ছিল হাসপাতাল প্রাঙ্গনে রক্তদান কর্মসূচী উদযাপন। এটা ছিল ১৪ জুন বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে করা, আমাদের ক্যাম্পাসে প্রথম! ভ্যাক্সিনেশনেও এবার রয়েছে বিস্ময়কর সাফল্য। ভ্যাক্সিনেশনের সংখ্যাও এবার বেশি বিগত বছরগুলোর তুলনায়। ভ্যাক্সিনেশনের প্রচারের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে সুদৃশ্য পোস্টার। প্রচার প্রকাশনায় ২০১৩-১৪ সেশনে সূচিত হয়েছে নতুন মাত্রা। সন্ধানীর কার্যক্রম সম্বলিত ফেসটুন লাগানো হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, ইউনিটের সামনে লাগানো হয়েছে ডিজিটাল সাইনবোর্ড। প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়েছে 'সন্ধানীবার্তা' নামে সন্ধানীর কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি, আমাদের নিজস্ব পত্রিকা। এখানে আমরা তুলে ধরছি আমাদের স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিকে। তাছাড়া আমাদের সেশনেই দৈনিক প্রথম আলোয় সন্ধানীর কার্যক্রম নিয়ে একাধিক বার ফিচার বের করা হয়েছে। এছাড়াও New age ও ইত্তেফাক পত্রিকায় এসেছে আমাদের কার্যক্রমের কথা। এর পাশাপাশি আমাদের কার্যক্রমকে টেলিভিশনের পর্দায় নিয়ে এসেছে ATN Bangla,Somoy TV প্রভৃতি যা আমাদের ইউনিটের কাজকে দেশব্যাপী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ড্রাগ ব্যাংকের কাজ ও ছিল চোখে পরার মত। আমরা এ বছর মুন্সিগঞ্জ,পাবনা এর মাদারিপুরে তিনটি হেলথ ক্যাম্প করেছি সফলতার সাথে। সেখানে প্রায় এক হাজারেরও বেশি রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দিয়ে সহায়তা করেছি। নিজ ক্যাম্পাস থেকে এত দূরে অনুষ্ঠান করা কঠিন হলেও আমরা তা সাফল্যের সাথেই সম্পন্ন করেছি। ড্রাগ ব্যাঙ্কের কাজকে সবার সামনে তুলে ধরার জন্য বানানো হয়েছে চমৎকার ব্যানার। এই সেশনে আমরা দুইজন পঙ্গু ব্যক্তিকে দিয়েছি হুইল চেয়ার, তিনজন দুঃস্থ মহিলাকে যাকাতের অর্থে দিয়েছি সেলাই মেশিন। এই বছর শীতবস্ত্র বিতরণ করতে আমরা গিয়েছিলাম সুদূর গাইবান্ধা জেলার চর সিধাইয়ে।

সেখানে আমরা প্রায় দুই শতাধিক মানুষকে কম্বল আর কাপড় দিয়ে সহায়তা করেছি। আর এই কাজে আমাদের সাথে ছিলেন সন্ধানী রমেক ইউনিট এবং সন্ধানী ডোনার ক্লাব, গাইবান্ধা।

থ্যালাসেমিয়া কমিটির কার্যক্রমও পিছিয়ে নেই। আমরা ২৭ জন নিবন্ধিত রোগীকে নিয়মিত প্রতি মাসেই রক্ত সরবরাহ করে যাচ্ছি। থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে প্রচারণামূলক ব্যানার। সন্ধানী এসএসএমসি ইউনিটের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবার পালিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রথমবারের মত লেকচার গ্যালারীতে আমরা উদযাপন করেছি সন্ধানীর জন্মদিন। এতে কেক কেটে অনুষ্ঠান শুরু করেন মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্মানিত পরিচালক ব্রিঃ জেঃ ডাঃ জাকির হাসান। ২০১৩-১৪ সেশনে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনে আরেকটা বিশেষ আয়োজন ছিল ইউনিট প্রাঙ্গনে আল্পনা, যা আমাদের ইউনিটের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে অনেকখানি। সন্ধানীয়ানদের অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল সবাই মিলে পিকনিকে যাবার। ২০১৩-১৪ সেশনে সেই আশাও পূর্ণ হয়েছে। গাজিপুরের শফিপুরে অবস্থিত আনসার ক্যাম্পে আমরা গিয়েছিলাম পিকনিক করতে। সারাদিন দুরন্ত মজা করেছে সব সন্ধানীয়ান। মাত্র চারদিনের প্রস্তুতিতে সম্পন্ন হয় সব আয়োজন, আর সন্ধানীর ইতিহাসে যোগ হয় নতুন অধ্যায়। এই সেশনে সবচেয়ে বড় অর্জন বলতে হবে আমাদের ব্র্যান্ড নিউ এ্যাম্বুলেন্স, যা আমরা পেয়েছি গত সেশনের সভাপতি মীর আরিফুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আকিব জাহান ভাইয়ের প্রচেষ্টায়। আর এই এ্যাম্বুলেন্সটি দিয়ে আমাদের কাজের গতিকে বাড়াতে সাহায্য করেছেন এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড এবং ইডিসিএল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সেখানকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ এম কদরুল হুদা ডাল্টন স্যার। সন্ধানী এসএসএম সি ইউনিটের প্রথম সম্মানিত বিশেষ সদস্য হিসেবে কার্যকরী পরিষদ ডাঃ এম কদরুল হুদা ডাল্টন স্যারকে মনোনিত করেছে আমি শুধু সন্ধানী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ২০১৩-১৪ সেশনের একটু ছোঁয়াই দিতে পেরেছি, পুরোটা তুলে ধরতে পারিনি। কারণ সন্ধানীর কাজকে কেবল কাগজ-কলমের হিসাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়না। সন্ধানীর কাজগুলো হল অনুভবের বিষয়। আর এই অনুভব বেঁচে থাকে সকল সন্ধানীয়ানের প্রাণে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভব আর অনেকখানি ভালোবাসা নিয়েই সন্ধানী পরিবার। ভালবাসা, বিশ্বাস, আর মানুষের আন্তরিক দোয়ায় এগিয়ে চলেছে সন্ধানী। জয় হোক মানবতার, জয় হোক সন্ধানীর।

তৃতীয় জাতীয় মেডিকেল কলেজ বিতর্ক উৎসব

মারেফুল ইসলাম মাহী, ব্যাচ-৬, ইবনে সিনা এমসি, ঢাকা

"ধমনীতে যুক্তির লাল চঞ্চলতা" এই শিরোনামে CULTURAL MEDICAL COLLEGE নামে খ্যাত 'চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ' এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'তৃতীয় জাতীয় মেডিকেল কলেজ বিতর্ক উৎসব'। আয়োজনে ছিল National Debate Fedaration Bangladesh (NDF-BD) এবং Chittagong Medical College Debating Club-Chittagong Medical College Student's Union। এবারের আয়োজনে Convener হিসেবে ছিলেন মুসবাহ আহমেদ মাহদি (Co-chairman, NDF-BD)। Co-convener হিসেবে ছিলেন ফরহাদ পারভেজ লিখন (Sohrawardy Medical College) এবং সোহানুর রহমান সোহান (ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ)। মূল স্পন্সর হিসেবে এবারও ছিল Eskayef Bangladesh Limited। Media partner হিসেবে ছিল একাত্তর টেলিভিশন, রেডিও ফূর্তি, The Daily Star, দৈনিক ইত্তেফাক এবং banglanews24.com। ২৮শে মার্চ সকাল ৯টায় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডাঃ মুজিবুল হক খান স্যারের (President,Bangladesh Medical Association,Chittagong) উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন Chittagong Medical College এর Principal সেলিম মোঃ জাহাঙ্গীর স্যার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর একটি শোভাযাত্রা বের হয় যা পুরো campus প্রদক্ষিণ করে। একই সাথে চলতে থাকে রেজিস্ট্রেশনের কাজ। বিতর্কের জন্য ১০ টি মেডিকেল কলেজ এর ১৪ টি দল রেজিস্ট্রেশান করে। মেডিকেল কলেজগুলো হচ্ছে : ১। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ২। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ৩। ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ ৪। শের এ বাংলা মেডিকেল কলেজ ৫। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ৬। পপুলার মেডিকেল কলেজ ৭। চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ ৮। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ৯। শহীদ জিয়াউর রাহমান মেডিকেল কলেজ ১০। কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ। ১৪ টি দল লটারির ভিত্তিতে একে অপরের বিরুদ্ধে বিতর্ক-যুদ্ধে লিপ্ত হয়। নতুন একাডেমিক ভবনের ৭ টি ভেন্যুতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে কুইজ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পড়ন্ত বিকেলে বিতর্কের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এবার ১৪ টি দল পয়েন্টের ভিত্তিতে একে অপরের মুখোমুখি হয়। এই পর্বের বিতর্ক শেষ হতে হতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। রাত ৯টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে রাফায়েত এবং জিহান। প্রথমেই পরিবেশিত হয় জাতীয় সঙ্গীত। এরপর নাচ,গান, অভিনয়, আবৃত্তি দিয়ে পুরো মিলনায়তনকে মাতিয়ে রাখে সিএমসিয়ানরা।

কাজী আসিফের কবিতা সবাইকে বিমোহিত করে। এরপর NDF-BD এর Chairman শোয়েব ভাই নিজেও কবিতা আবৃত্তি করেন। ইনজামামুল হকের পরিচালনায় বিদেশিদের নিয়ে নাটকটি সবাই খুব মজার সাথে উপভোগ করে। কিছুক্ষণ পর পরিচালক নিজেই নাচ নিয়ে সবার সামনে আসে। চট্টগ্রাম মেডিকেল ছাড়াও অন্য মেডিকেল কলেজ এর পরিবেশনা ছিল। চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেলের নাচ ও গান সবাইকে মুগ্ধ করে। কুমিল্লা মেডিকেলের সামান্তার নাচ অনেক উপভোগ্য ছিল। একই মেডিকেলের মাসাবা তার আবৃত্তি দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। শের এ বাংলা মেডিকেলের আসিফ তার আবৃত্তি ও গান দিয়ে সবাইকে চমকে দেয়। পপুলার মেডিকেলের সালেহিনের গান ও অনেক উপভোগ্য ছিল। এরপর তুশিন,সোহান,সারাজ এবং আর্য এই চার জনের মূকাভিনয় সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এরপরই অপূর্ব fire-works এর প্রদর্শনী দেখানো হয়। অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে দেখা যায় ঘড়ির কাঁটা রাত দেড়টা পেরিয়ে গিয়েছে। ২৯ তারিখ সকালে ৮ দলের মধ্যে quarter-final অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এই পর্ব থেকেই 'সংসদীয় বিতর্ক' পদ্ধতিতে বিতর্ক শুরু হয়। এ পর্বে বিজয়ী দলগুলো ছিল- চট্টগ্রাম মেডিকেল-১, শের এ বাংলা মেডিকেল, চট্টগ্রাম মেডিকেল-২ এবং ঢাকা মেডিকেল। এরপর কুইজের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেমি-ফাইনাল এ চট্টগ্রাম মেডিকেলের দুটি দলই পরস্পরের মুখোমুখি হয়। এতে জয়ী হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল-২ ফাইনালের দিকে পা বাড়ায়। অপর সেমি-ফাইনালে শের এ বাংলা মেডিকেলকে হারিয়ে ঢাকা মেডিকেল ফাইনালে চলে যায়। সন্ধ্যার পর ফাইনাল এ ঢাকা মেডিকেল এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল-২ মুখোমুখি হয়। যুক্তি, পাল্টা যুক্তির বহর দেখাতে থাকে দুই দলই। শ্বাসরুদ্ধকর একটি বিতর্ক উপভোগ করেন সকল দর্শক। বিতর্কের শেষে ৯ জন বিচারক তাদের ভোট প্রদান করেন। প্রাপ্ত ভোটে জয়ী হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হয় বিজয়ী দলের রিয়াদ। বিতর্কের শেষে কুইজের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এতে ১ম হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল এর তুশিন এবং দায়েমি,২য় হয় একই মেডিকেলের রায়হান এবং ইজাজ,৩য় হয় কুমিল্লা মেডিকেলের সামান্তা এবং মাসাবা,৪র্থ হন ইবনে সিনা মেডিকেলের আদনান। এরপর অংশগ্রহণকারী সকল দলকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিজয়ী এবং বিজিত উভয় দলকে ট্রফি প্রদান করা হয়। NDF-BD এর Chairman এ কে এম শোয়েব, Co-Chairman মুসবাহ আহমেদ মাহদি, শরিফুল আনোয়ারের এর নেতৃত্বে তামজিদ,আকাশ,আদনান,মুন্না সহ আরও অনেকে অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য। চট্টগ্রাম মেডিকেলের রাফসান,মাহিদ,শুভ,রাশেদ সহ অনেকে দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। বিশেষ করে ইনজামামুল হক সার্বক্ষণিক যে সাহায্য করেছে, তা সত্যি অতুলনীয়। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আয়োজক হয়েও চট্টগ্রাম মেডিকেল কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করেনি। বিচারকার্য পরিচালনায় বিচারকদের রায়কে তাঁরা সব সময় সম্মান জানিয়েছেন। তাঁদের এই মানসিকতা প্রশংসার দাবি রাখে। এভাবেই দুই দিনের বিতর্ক উৎসব শেষ হয়ে গেল সফলতার সাথেই।

Third BMT in DMCH

Hello
Have a good day..

We have done the 3rd Bone Marrow Transplantation on Sunday 8th June,2014; of Mr. Asgor Ali, 46 yrs Male (Dx M.M).

Our first two patients are in good health.

We are seeking Doa from all of you.

With Thanks
Prof. M.A. Khan
Dept of Hematology & BMT Unit.
Level-10, DMCH-2

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ক্লিনিক

হিমেল বিশ্বাস, ব্যাচ-৪৭, ময়মনসিংহ এমসি

ডাক্তার বাবা মা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চান তাদের সন্তান যেন ডাক্তারই হয়। কেন সেটা আমাদের নতুন করে বলার নিশ্চয় প্রয়োজন নেই, তবুও একটু বলি। স্বাধীন আর সম্মানজনক পেশা, এবং সেই সাথে সৎ পথে ইনকামের পথ। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষের কাছে খুব সহজে পৌছানো যায় খুব গভীরভাবে।

মেডিকেল জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই, যে যত উপরে উঠতে চাইবে, তার জন্য ঠিক তার চেয়েও বেশি পথ আছে খোলা আছে। কেউ যদি ভেবে থাকেন মেডিকেলের সবচেয়ে বড় এবং সব ডিগ্রী নিব, আমি ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে যতটুকু জানি, মনে হয় তা একেবারেই অসম্ভব। MBBS এর পর কি করবো, কি করবো না, করলে কোথায় করবো, কি করলে কি হয়, কি করতে চাইলে কি লাগে, কোনটায় কি লাগে এবং কেন লাগে এসব বিষয় নিয়ে ভার্চুয়াল জগতে সবচেয়ে বড় গ্রুপ Medical Science-Higher Study Abroad, MMC wing (an associate organization of Higher Study Abroad) এর আয়োজনে গত ৭ জুন মমেক গ্যালারী-১ এ এম৪৬ ব্যাচের ডাঃ সাব্বির, ডাঃ ফয়সাল, ডাঃ শোভন এবং ডাঃ আসাদ ভাই এর ঐকান্তিক চেষ্টা এবং ডাঃ এহসানুর রেজা শোভন (সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগ) স্যারের সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় বক্তারা আমাদের "দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন ডিগ্রী" নিয়ে জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যমূলক আলোচনা করেন। উল্লেখ থাকে যে, গ্রুপের সেমিনার অন্যান্য ভার্সিটি ক্যাম্পাসে হলেও মেডিকেলের জন্য এটাই প্রথম সেমিনার। নতুন 1st ইয়ার থেকে শুরু করে ডাক্তার পর্যন্ত যে পরিমাণ সাড়া পাওয়া গেছে তা থেকেই বোঝা যায় মেডিকেলের এই ঘরকুনো ছেলে বা মেয়েটিও উচ্চতর ডিগ্রী নেবার জন্য বাইরে যেতে কতখানি আগ্রহী। আমাদেরকে যারা তাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান সময় থেকে একটু সময় দিয়েছেন সেই সম্মানিত বক্তারা হলেন-ডা. আবু সাদাত মোহাম্মদ নুরুন্নবী, এমবিবিএস, এমফিল, এম এস সি ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলার,সেন্টার ফর বায়োমেডিকেল এথিক্স এন্ড ল, ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি, লুভেন, বেলজিয়াম। এক্সটার্নাল এক্সপার্ট, মিনিস্ট্রি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, ইরান। রিসার্চার , লিন্ডাও নোবেল লরিয়াট মিটিং অন মেডিসিন, জার্মানি।- ডা. মো. এম ইসলাম বুলবুল , এমবিবিএস, এম পি এইচ (জেমস পি গ্রান্ট, স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ঢাকা) টীম লিডার, COIA ফর উইমেন'স এন্ড চিলড্রেনস হেলথ, DGHS , ঢাকা।-ডা. মুফতি মাহতাব মুনতাসির ভুঁইয়া , এমবিবিএস (সিএমসি) USMLE (স্টেপ ১) ইলেক্টিভ স্টাডি ইন ক্লিনিকাল মেডিসিন (ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড)।

আমাদের ময়মনসিংহ মেডিকেলেরই ছাত্র ডা.আবু সাদাত মোহাম্মদ নুরুন্নবী স্যার এবং ডা.মো. এম ইসলাম বুলবুল স্যার মনোমুগ্ধকর বক্তৃতার শেষের দিকে ক্যাম্পাসের স্মৃতিচারণ করেন যা শুনলে অভিভূত না হয়ে থাকা যায় না। ডা. আবু সাদাত মোহাম্মদ নুরুন্নবী স্যার প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে বলেন "সবার উপস্থিতি আশা আকাঙ্খার তুলনায় হয়তো আমরা অনেক কম বলেছি, কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে প্রত্যয় সেটা সবার থাকতে হবে, সেটা পূরণ হোক বা না হোক চেষ্টা করতে ক্ষতি কোথায়, আমরা তো আছিই।" আমরা স্বপ্ন দেখি, নিজেদের চেষ্টায় হয়তো কেউ কেউ এগিয়ে গেলেও সঠিক পথ খুঁজতে খুজতেই অনেকের সময় বা শ্রমের ধৈর্য ঝিমিয়ে পড়ে। এবার থেকে হয়তো আর সেটা হবে না, কারণ আমাদের সামনের অগ্রপথিক তো মশাল জ্বালিয়ে পথ প্রদর্শন করছেনই, এখন সময় শুধু এগিয়ে যাওয়ার, স্বপ্ন পূরণের পথে, যেখানে স্বপ্ন হবে আকাশ ছোঁয়ার।

এবং দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ

সালমান মাহী রুহুল কাওসার,ব্যাচ ২১, দিনাজপুর এমসি

অনেকেই বলেন মেডিকেলে পড়ার জন্য সব বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান রাখতে হয় এ কথাটা আসলেই সত্যি। ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট পাবার পর নিজের ভূগোল বিষয়কে একটু ঝালাই করে নিতেই হল। আমি চান্স পেয়েছি দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে যা কিনা বাংলাদেশের মানচিত্রে একেবারে উত্তর-পশ্চিমে। চান্স পাবার আনন্দ তার সাথে আবার অজানা এক ভয়, কি হবে? কোথায় যাচ্ছি? মানিয়ে নিতে পারব তো? হিমশীতল এক সকালে শুরু হল আমার এ উত্তরবঙ্গে পথচলা। জীবনে কখনো এত শীতের কবলে পড়িনি তাই শীতে কাবু, জুবুথুবু এক অবস্থা। আমার এ অবস্থা দেখে উত্তরবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী বন্ধুরা বলল শীততো এখনো ভালোভাবে শুরুই হয়নি। এখনতো এই অবস্থা আবার গরমের সময় বুঝতে পারবা গরম কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি?

অজানা আতঙ্ক, অজানা ভয়, সব কিছুতেই করব জয়! এমন এক বাণী বুকে ধরে সময় কাটাতে লাগলাম। প্রথমেই ভালো লেগে গেল দিনাজপুরের মানুষের সততা ও সরলতাকে। বাংলাদেশের মানুষ যে আসলেই মাটির মানুষ তা দিনাজপুর আসা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের সুসজ্জিত বাগান, পরিস্কার ক্যাম্পাস, গোছানো অবকাঠামো যে কোন মানুষকে অতি সহজেই আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। বাংলাদেশের অন্য কোন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসের তুলনায় মধুমাস উপভোগের জন্য দিমেক ক্যাম্পাসই সেরা। আম, লিচু বাগানে সিনিয়রদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আম, লিচু করা জুনিয়রদের জন্য এক খুবই মজার ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও ফল উৎসবের মাধ্যমে সমস্ত ক্যাম্পাসে নিজেদের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ বাড়ানো তো আছেই।

সন্ধানী ও মেডিসিন ক্লাবের দুটি বড় ইউনিট পাশাপাশি একইসাথে কাজ করে যাচ্ছে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। তবে গর্ব করার মত সবচেয়ে বড় যে প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে তা হল দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান **'ঐকতান'**। দিন রাত বইয়ের পাতায় মুখ গুজে না থেকে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা করা যায় এবং পরিবেশনার মান যে কোন পেশাদার অভিনেতা বা শিল্পীর সাথে পাল্লা দেবার মতন তা ঐকতানকে দেখেই শিখতে হয়। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে " আল্লাহ্ মিলায় দেয়" এই কথার বাস্তব প্রমাণ আমি এই প্রতিষ্ঠানে দেখেছি। ক্লোজআপ ওয়ান বা পাওয়ার ভয়েস তারকা, কিংবা নাচে গানে, অভিনয়ে পারদর্শী একঝাঁক ছেলে মেয়ে। কি নেই এতে। ঐকতানের তিন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ডিবেটিং ক্লাব, ড্রামা ক্লাব ও মুভি ক্লাব। ডিবেটিং ক্লাবে আছেন জাতীয় পর্যায়ের কয়েকজন বিতার্কিক। ড্রামা ক্লাব প্রতি বছরই এমন সব নাটক মঞ্চস্থ করে যাচ্ছে যা দেখে প্রতি বছরই হতবাক হয়ে যেতে হয়। ঐকতান নিজের পরিচয় দিনাজপুর ও দিনাজপুরের বাইরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। সোসাইটি অব সার্জন অব বাংলাদেশ, অ্যাসোসিয়েশন অব পেডিয়েট্রিক সার্জন অব বাংলাদেশ এর বার্ষিক সম্মেলনে দুর্দান্ত পরিবেশনা এ প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে গিয়েছে অন্য এক উচ্চতায়। মেডিকেল কলেজের ছেলেমেয়েরাও যে কোন অংশে পেশাদার শিল্পীদের চেয়ে কম যায় না তার প্রমাণ প্রতিবছরই আমরা দিয়ে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষের আগ্রহ এ প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে অপ্রত্যাশিত। প্রতি বছর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দূর দুরান্ত থেকে মানুষজন ছুটে আসে শুধুমাত্র নির্মল বিনোদন উপভোগ করার জন্য। তাঁদের চোখে মুখে বিস্ময় যারা তাঁদের সামনে পরিবেশনা নিয়ে আসছেন তারা যে পেশাদার শিল্পী নন তারা বিশ্বাসই করতে চান না। পহেলা বৈশাখের পান্তা ইলিশ খাবার অনুষ্ঠান হোক অথবা 31st night এর DJ Party সব জায়গাতেই ঐকতানের পদচারণা। বড় গ্যালারীতে সবাই মিলে বসে মুভি দেখার মজা অসাধারণ। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীর অনেকেই আমাদের সাথে যোগ দেন। সবাই মিলে একটা উৎসব উৎসব ভাব চলে আসে। মুভি দেখার মজাটা যতটা থাকে তার চেয়ে বেশি থাকে সবাই মিলে হৈ চৈ করার মজা।

অলিগলি

মালিহা তাবাসসুম, সম্পাদক-অলিগলি,ব্যাচ-৪১, স্যার সলিমুল্লাহ এমসি

ডিবেট এন্ড কুইজ সোসাইটি-স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের নিয়মিত প্রকাশনা 'অলিগলি' এর জুন ২০১৪ সংখ্যা বের হয়েছে। এবারের সংখ্যাটি পুরোপুরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন অসাধারণ মানুষকে নিয়ে।মূল রচনায় থাকছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের বিশ্লেষণধর্মী একটি লেখা। এছাড়া থাকছে সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ,শহীদ বীরবিক্রম আবদুল হালিম জুয়েল,বীর প্রতীক তারামন বিবি, কণ্ঠসৈনিক বেলাল মোহাম্মদ, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি,বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীনকে নিয়ে আলাদা আলাদা রচনা। ডিকিউএস তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ধারণ করে আসছে ও নতুন প্রজন্মকে তা জানাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। অলিগলি'র এই সংখ্যা সে উদ্যোগেরই একটি অংশ। অলিগলির এই বিশেষ সংখ্যাটি পেতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেনঃ ০১৭৭৭৮০৫০০২, ০১৭৭৬৩৮০৪১৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি

পৃথিবীতে নতুন প্রাণের আগমন আর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া এই বিষয় দুটোর মুখোমুখি সব থেকে বেশী হন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসক হবার পর প্রথম ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হাত কাঁপেনি এমন চিকিৎসক মনে হয় না খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন একজন চিকিৎসক আরেকজন চিকিৎসকের ডেথ সার্টিফিকেট লেখেন সেই অনুভূতিটা আসলে কেমন হতে পারে? চিকিৎসক মাত্রই মানুষ আর মানুষ মাত্রই মরণশীল। মৃত্যু চিকিৎসককে ছোঁবে না কথাটা এমন নয় কিন্তু মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরিয়ে আনতে অবিরাম চেষ্টা করে যাওয়া চিকিৎসকের মৃত্যুটি যদি হয় অস্বাভাবিক বা একেবারেই অল্প বয়সে তাহলে তা মেনে নিতে কষ্টটা একটু বেশীই হয়।

গত ১৩ই এপ্রিল ২০১৪ মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে জাগতিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেলেন ডাঃ তাবাসসুম। জীবনের প্রতিটি পদে যুদ্ধ করে জিতে যাওয়া অসীম সম্ভাবনাময় এই তরুণ চিকিৎসক হার মানলেন ক্যান্সারের কাছে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ২৬ তম ব্যাচের ছাত্রী ডাঃ তাবাসসুম এমবিবিএস ডিগ্রী অর্জন করেন ১৯৯১ সালে। এর পর পরই তিনি সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনে যোগ দান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত ছিলেন। তিনি গ্রেট ব্রিটেনের ড্যান্ডি থেকে এমএড ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। তিনি মেডিকেল শিক্ষাবিদ হবার সুবাদে বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার লেকচারার থেকে খোদ অধ্যাপকরাও তাঁর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তীক্ষ্ণ মেধা, একাগ্র সাধনা, সৃজনশীলতা, দূরদর্শিতা, বাগ্মিতা ছিল তাঁর পাঠদান শৈলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রশিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক নির্মাণে তিনি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেছেন ।

পরের ঘটনাটি ঘটে গত ১৫ই এপ্রিল, ২০১৪। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে মেজর পদে যোগ দিতে চট্টগ্রাম আসার পথে সীতাকুণ্ডের বাঁশবাড়িয়া এলাকায় বাসের সাথে কভারড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ডাঃ সঞ্জিতা বিশ্বাস। ডাঃ সঞ্জিতা ২০০৮ সালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রী ও বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জন থেকে এফসিপিএস ডিগ্রী অর্জন করেন। ২০১১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনারারি মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০১২ সালে ঢাকা শিশু হাসপাতালে অনারারি মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ২০১৩ সালে পেডিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে যোগ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে। শনিবার সেনাবাহিনীতে মেডিকেল কোরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে মেজর পদবীতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। সাধারণ একটি পরিবার থেকে উঠে আসা এক অনন্য মেধাবী ডাঃ সঞ্জিতা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনেও ছিলেন একইভাবে সফল।

পরের দুটো তারিখ ছিল একেবারেই পর পর। প্রথমটি ঘটে ১২ই মে রাজধানীর নিউ মার্কেট থানার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায়। বেলা একটার দিকে এলিফ্যান্ট রোড সংলগ্ন কনকর্ড ইম্পোরিয়ামের একটি ফ্ল্যাট থেকে ডাঃ কাজী নওমী শিহাব (২৬) নামে এক চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার করেন পুলিশ। পরে তাঁকে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিহাবকে মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের জন্য তার লাশ ঢামেক মর্গে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলাও হয়। ডাঃ নওমী শিহাব বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ইন্টার্নশিপ শেষ করে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে এমপিএইচ করছিলেন। ডাঃ শিহাব ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী ছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটিও একইরকম অনাকাঙ্খিত। ১৩ই মে, ২০১৪। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজধানীর ২নম্বর নিউ বেইলি রোডের একটি ছয়তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে নিহত হন ডাঃ তানিয়া রশিদ (৩৫)। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয় এটি আত্মহত্যার ঘটনা। ডাঃ তানিয়া বেসরকারি হাসপাতাল পপুলার ও মেডিনোভায় কর্মরত ছিলেন।

গত ২৬ মে ২০১৪ আমাদের ছেড়ে পরপারের পথে পাড়ি জমান শ্রদ্ধেয় ডাঃ একেএম লুৎফর রহমান তালুকদার। বাংলাদেশের যুগান্তকারী "আপনার শিশুকে টীকা দিন" প্রকল্পটি শুরু করেন তিনি। বাংলাদেশের একটি অন্যতম বিস্ময়কর সাফল্যের একটি হল প্রায় শতভাগ সফল ইপিআই কার্যক্রম তথা ইমিউনাইজেশনের অবিশ্বাস্য সাফল্য যার পেছনে রয়েছেন এই মানুষটা। নিভৃতচারী এই মানুষটি কোন স্বীকৃতি বা বাড়তি মর্যাদা নয় বরং দেশের মানুষের প্রতি অপার ভালবাসা থেকেই এই উদ্যোগটি নিয়েছিলেন যার সাফল্যে আজ আমরা উপকৃত ও গর্বিত হচ্ছি প্রতি মুহূর্তে।

মৃত্যু মাত্রই বেদনাদায়ক। মেনে নিতে কষ্ট হয় কিন্তু তারপরও আমাদের মাঝ থেকে মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়ে হারিয়ে যাওয়া সকল চিকিৎসকেরা বেঁচে থাকুক তাঁদের কর্ম, মেধা ও মননে। প্ল্যাটফর্মের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য রইল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

সংগ্রহ ও সম্পাদনাঃ সাদিয়া ফাতেমা কবীর, ব্যাচ-৩৯, শের এ বাংলা এমসি (বরিশাল)

কোয়াক হান্টার

আগা সালেহীন ফারহান, ব্যাচ-১৩, শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ, উত্তরা

সাইনবোর্ডে নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে ডিগ্রী। ভিজিটিং কার্ড আর প্রেসক্রিপশনেও ডিগ্রীর মতো আলো ছড়াচ্ছে ইংরেজি বর্ণ আর নানা দেশের নাম। এসব 'ডা.' নামধারীর সাইনবোর্ডের আলো দেখে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিচ্ছেন গরিব-অসহায় রোগী ও অভিভাবকেরা। কারও ঘটছে স্বাস্থ্যহানি, কেউ হচ্ছেন প্রতারিত। তাদের সময়-অর্থ তো নষ্ট হচ্ছেই, উল্টো জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও হরহামেশা শোনা যায়। বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) নিবন্ধন ছাড়া ওষুধের দোকানের বিক্রয়কর্মী, ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টিটিভ কিংবা খ্যাতনামা দন্ত চিকিৎসকের সহকারী হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ কেউ নামের আগে 'ডা.' লেখে রীতিমতো চেম্বার সাজিয়ে ভিজিটের বিনিময়ে রোগী দেখছেন। বিএমডিসি সূত্রে জানা গেছে, এসব স্বীকৃত অতিরিক্ত (এডিশনাল) চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা নয়। শুধু তাই নয়, অনেকে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ সেজে বসে আছেন পোস্টগ্রাজুয়েশন ডিগ্রী না নিয়েই। তারা রোগী আকর্ষণের জন্য সাইনবোর্ডে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনি, শিশু, চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রচার করছেন, যা বিএমডিসি আইনের পরিপন্থী ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানেই অপরাধের শেষ নয়, এসব 'ডা.' নামধারী ব্যাক্তি প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় অনেক ওষুধ, এমনকি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ওষুধ এবং অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার নাম ব্যবস্থাপত্রে লিখছেন। গ্রামগঞ্জে তো বটেই, নগরীর অলিগলিতেও এখন ডিগ্রীধারী ডাক্তার সেজে প্রতারণার ঘটনা বাড়ছে। অন্য আইনে যাই থাক না কেন, বিএমডিসি অ্যাক্টের ধারা ২২(১) অনুযায়ী নিবন্ধন ছাড়া অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নিষিদ্ধ। নিবন্ধন ছাড়া কেউ মেডিক্যাল চিকিৎসক বা ডেন্টাল চিকিৎসক পরিচয় দিতে পারবেন না। ধারা ২৯(১) অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত কোনও চিকিৎসক এমন কোনও নাম, পদবি, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করবেন না যার ফলে তার কোনো অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে মর্মে কেউ মনে করতে পারে, যদি না তা কোনও স্বীকৃত মেডিক্যাল বা ডেন্টাল চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা হয়ে থাকে। ন্যূনতম এমবিবিএস বা বিডিএস ডিগ্রী ছাড়া কেউ নামের আগে 'ডা.' পদবি ব্যবহার করতে পারবে না। ধারা ২৮(১) অনুযায়ী কেউ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে স্বীকৃত মেডিক্যাল বা ডেন্টাল চিকিৎসক হিসেবে এ আইনের অধীনে নিবন্ধন, নিবন্ধন করার উদ্যোগ, মিথ্যা বা প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব প্রকাশের চেষ্টা করতে পারবেন না। এ ৩টি ধারা লঙ্ঘিত হলে ৩ বছরের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত এবং অভিযুক্তকে ভুয়া ডাক্তার হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। নিষিদ্ধ ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লেখার শাস্তি সম্পর্কে ধারা ৩০(১) অনুযায়ী ২ বছরের কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে। ১৯৮১ সালে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডাক্তার না থাকা সাপেক্ষে সরকার পল্লী চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সাধারন রোগের (১২টি) প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এ ছাড়া ডাক্তারের নির্দেশে স্যালাইন বা ইঞ্জেকশন পুশ-ও করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও তাদের নিজেদেরকে ডাক্তার পরিচয় দেয়া কিংবা এলএমএফ, ইকেএমএফ, আরএমপি ইত্যাদিকে পেশাগত যোগ্যতা বা ডিগ্রী পরিচায়ক হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়নি। উপরন্তু, তা করা হলে প্রচলিত আইনে কারাদণ্ড ও জরিমানার মত কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু সে আইনের প্রয়োগ না থাকায় কয়েকটি ওষুধের নাম মুখস্ত করেই ফার্মেসি মালিকরা নাম সর্বস্ব ডিগ্রী লাগিয়ে ডাক্তার বনে যাচ্ছে। সামান্য জ্বর-সর্দি কাশি থেকে শুরু করে তারা দুরারোগ্য ক্যান্সারের চিকিৎসাও দিয়ে চলেছে। তবে সরকারি একটি সূত্রমতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি (এসএমএফ) কোর্স করা (বর্তমানে বন্ধ) পল্লী চিকিৎসকরা ডাক্তার লিখতে পারবেন, তবে কোন সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না। এদেশের মানুষের বেশির ভাগই গরীব। তারা প্রতারিত হচ্ছেন। আমরা চাই, মানুষ জানুক কারা সত্যিকারের ডাক্তার। আমরা কারও শত্রু নই। কাউকে অযথা হয়রানি করার পক্ষে নই। [তথ্য-উপাত্তসমুহ বিএমডিসি ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন অনলাইন নিউজপোর্টাল থেকে সংগৃহীত]

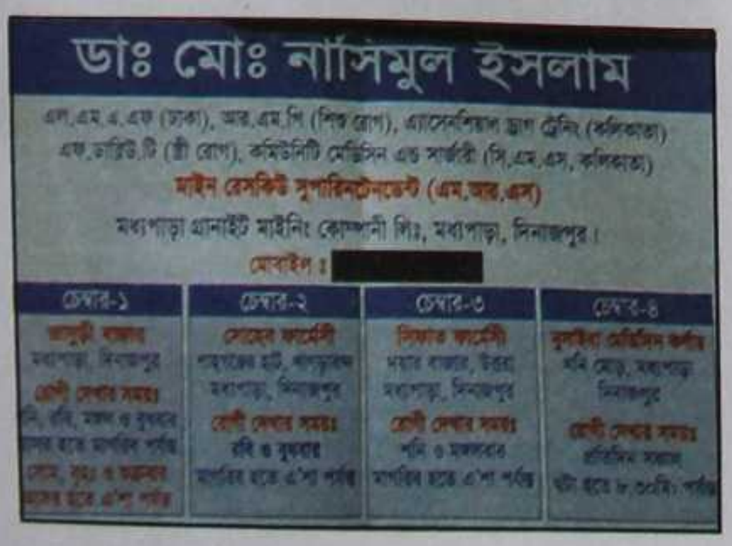

গল্পঃ ক্যাডাভার

ডাঃ তানভীর শুভ, ব্যাচ-৩৪, শের-এ-বাংলা এমসি (বরিশাল), এসিস্টেন্ট রেজিস্টার, সার্জারী-৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

আমার নাম আকু মিয়া। আকলেস থেইকা আকু। আমার দুই পোলা। বড়টার নাম মানিক আর ছোটোটা মতিন। আমি দিনমজুর। টাকা কড়ি, আবাদি জমি কিছুই আমার নাই। পোলা দুইটাই আমার সম্পদ। বড় পোলা লেখাপড়াতে খুব ভালা। স্কুলে নাকি সবার আগে ওর নাম ডাকে। আমি মূর্খ মানুষ, আমার বউ সেও মূর্খ। নাম লিখতে কলম ভাঙ্গে। স্কুলের মাস্টারেরা বিনা পয়সায় মানিকরে পড়ায়, বই খাতা কিন্না দেয়। মাষ্টার সাব বলেন-"আকু মিয়া, তোমার পোলা হইলো গোবরে পদ্ম ফুল, তুমি না খাইয়া হইলেও পোলাটারে খাওয়াইয়ো, যত্ন নিয়ো"। আমি মূর্খ আকু মিয়া আমার মানিকের যত্ন নেই। কাঞ্চন দুধ ওয়ালার কাছ থেকে দৈনিক এক পোয়া দুধ কিনে পোলাটারে খাওয়াই। পোলাটা পিতলের বাটিতে চুকচুক করে দুধ খায়, আমি আর আমার বউ তৃপ্তি নিয়া সেই দৃশ্য দেখি। আহা! মানিক আমার।

মানিকের সামনে বড় একখান পরীক্ষা আইতেছে। মেট্রিক না জানি কি। পরীক্ষার ফিস লাগবো আর পোলাটারে নতুন জামা আর সেন্ডেল কিন্না দিতে হবে বায়না ধরছে। গেরামে দিনমজুরি করে বেশি আয় হয় না। পাশের গেরামের মোবারক আলি ঢাকা শহরে দিনমজুরি করে। ভালো কইরা খাটলেই নাকি ৭ দিনে ৩/৪ হাজার টাকা কামানো যায়। ফাল্গুন মাসের এক সকালে দুইটা কাঁচা মরিচ দিয়া পান্তা ভাত খাইয়া বাসে চাপলাম।

ঢাকা শহর আজব শহর। এই শহরের মানুষগুলার মাঝে কোনো মায়া দয়া নাই। কেউ রাস্তায় পইড়া গেলে এরা দূর থেকে খালি চাইয়া চাইয়া দেখে কেউ আইসা বলে না-"আহারে ভাই খুব দুঃখ পাইছেন নাকি, আসেন আপনেরে আগগুইয়া দেই"। রাতে রেল স্টেশনে ঘুমাই আর দিনে ফকিরাপুলের কাছে এক দালানের কাম করি। মাথায় ৮ খান ইট লইয়া ছয় তলায় উঠি। হাত দুইখান আর হাত নাই, ফোস্কা পইরা ফসলের ক্ষেত হইয়া গেছে। রাতের বেলা বড়ই যন্ত্রণা করে, ঘুমাইতে পারি না। তখন পোলা দুইটার মুখের কথা ভাবি, যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ হইলেও কইমা যায়। দিন ফুরাইলে খাওন দাওন করার পরেও ছয়শ টাকা হাতে থাকে। আজকা আমার মন অতিশয় খুশি। আজকা রাইতে বাসে কইরা বাড়িতে ফিরমু। ছোটো পোলার লাইগা বাতিওয়ালা জুতা কিনছি আর মানিকের লাইগা সাদা শার্ট আর কালা প্যান্ট লগে এক খান রাবারের স্যান্ডেল।

এতো কিছু কিন্নাও ৪ হাজার টাকা লগে আছে। মানিকের পরীক্ষার ফিস হইয়া যাইবো এই টাকায়। রাস্তায় ঘুটঘুইটা আন্ধার, টেম্পু রিকশা কিছু চলে না। আচমকা দুইটা মানুষ আজরাইলের মত আমার সামনে হাজির হইলো। কিছু বুইঝা উঠার আগেই রাস্তায় চিৎ হইয়া পইড়া গেলাম। তলপেট থেইকা কল কল কইরা রক্ত বাইর হইতাছে। ভাইরে তোমরা আমারে মাইরা ফেলো কিন্তু টাকাটা লইয়া যাইয়ো না, আমার মানিক পরীক্ষা দিতে পারবো না। ওরা আমার কথা শুনলো না, কেউ আসলো না আমারে বাঁচাইতে। কেউ না।

৬ মাস ধইরা আমার লাশ মর্গের বরফ ঘরে পইরা ছিলো। কোনো পরিচয়, ঠিকানা পায় নাই। আমার লাশ দাবি কইরা গেরাম থেইকা কেউ আসে নাই। আমি আশায় আশায় ছিলাম। এক টুকরা মাটি আমার কপালে জুটলো না।

আমার লাশটা নয়া একখান জায়গাতে রাখা হইছে। ইয়া বড় সাইজের এক কামরাতে। গা থেকে ভুরভুর কইরা কেমন জানি গন্ধ বাইর হয়। পরে জানতে পারি এর নাম নাকি ফরমালিন। পুরান লাশরে তাজা রাখার লাইগা এই ওষুধ দেয়। প্রতিদিন সকালে ফরমালিনের গামলা থেইকা আমারে তুইলা আইনা ঐ বড় কামরাতে রাইখা দেয়। কিছুক্ষণ পর সাদা কাপড় পরা ফুটফুটে কিছু ছেলে মেয়ে আইসা আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চাইয়া থাকে। কেউ নাক মুখ কুচকাইয়া আমার দিকে তাকায়, আর কেউ হাত দিয়া আমারে ধরে। এক দিন মোটাসোটা এক ছেলে হাতে এক খান ব্লেড নিয়ে আমার দিকে আউগগাইয়া আইলো। বুক বরাবর ব্লেড দিয়া দিল হেচকা টান। আমিতো ডরেই শেষ, পরে মনে পরলো আমিতো লাশ। লাশের আবার বিষ বেদনা কিয়ের! আরো কিছুদিন পার হওয়ার পর বুঝতে পারছি এই সাদা কাপড় পরা পোলামাইয়াগুলা মেডিকেলে পড়ে। ডাক্তার হইবো। আমার শরীর নিয়া এরা পড়ালেহা করে। ঘটনাটা বুঝার পর আমার চক্ষে পানি আইসা পরে, ধুর যা! লাশের কি চোখে পানি আহে নাকি। আহারে আমার মানিকটারে যদি ডাক্তার বানাইতে পারতাম।

এইভাবে অনেকগুলা বছর কাইটা যায়, আমি আর কারো লাইগা অপেক্ষায় থাকি না আমার লাশটারে নিয়ে যাবার জন্যে। এখন আমার অপেক্ষা কখন সকাল হইবো আর কখন সাদা পোশাকের ফুটফুটে ছেলে মেয়ে গুলো আমার চারপাশে কিচির মিচির করবো। একদিন আজিব এক ঘটনা ঘটলো, শুকনা পাতলা এক ছেলে আইসা একটা কাপড় দিয়া আমার কোমর পর্যন্ত ঢাইকা দিলো। এটা দেইখা তার বন্ধুরা তারে নিয়া সেকি হাসাহাসি। হাসি শুইনা পোলায় বলে-"এটা একটা মানুষের ক্যাডাভার, কোনো পশুর না, ক্লাস শেষে শরীরটা আমারা ঢেকে রাখতেই পারি, এতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না"। এই পোলার গলা শুনে আমি আকু মিয়া নিশ্চিত এই পোলা দুনিয়ার যেই প্রান্তেই থাকুক সেখানেই তার কণ্ঠের যাদুতে সবাইকে সে বশে আনতে বাধ্য করবো। একটু পর স্যার আইসা নাম ডাকা শুরু করলো। আজ মনে হয় এরা পরথম এই কামরাতে ঢুকছে, নয়া ডাক্তার।

-রোল নম্বর ১।

ঃ ইয়েস স্যার।

-নাম কি তোমার?

ঃ মোহাম্মদ মানিক মিয়া

-বাবার নাম?

ঃ আকলেস মিয়া

-কি করেন তোমার বাবা?

ঃ আমার বাবা দিন মজুর ছিলেন, গত ৩ বছর যাবত তিনি নিখোঁজ।

ফরমালিনে মাখা আকলেস ওরফে আকু মিয়া ওরফে ক্যাডাভার ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখতে পারে না ছেলেটাকে। কণ্ঠের দৃঢ়তা তাকে চিনিয়ে দেয় সেই শুকনা পাতলা ছেলেটাকে যে তার শরীরটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলো। আহারে এতো আমার মানিক সোনা, আমার ছাওয়াল। আমার মানিক ডাক্তারি পড়ে। আকু মিয়া সুখের কান্না কাঁদতে পারে না, লাশের চোখ ধুঁ ধুঁ মরুভুমি। অবশেষে আকু মিয়ার অতৃপ্ত আত্মা ফরমালিন ভেজা ক্যাডাভারের বন্দি বাক্স থেকে তৃপ্ত হয়ে মুক্তি পায়।

ডাঃ রুনি আপার পাশে আমরা

ডাঃ মনিরুল আলম রাসেল, ব্যাচ-৩৫, রংপুর এমসি

আমরা চিকিৎসক। মানুষের সেবা করার জন্যই আমাদের জন্ম হয়েছে। মানবতার একজন সেবক চোখের সামনে সেবা না পেয়ে ধুঁকতে থাকবে, তাও আবার অর্থের অভাবে, ব্যাপারটা মেনে নেয়া অনেক কষ্টের। রুনি আমাদের বোন। আমাদের নিজেদের যদি ছোট একটা বোন থাকতো, তবে তার জন্য আমরা যা করতাম, রুনির জন্য আমরা তাই করব। কাউকে জীবন দানের ক্ষমতা আমাদের নেই, কিন্তু সেই জীবনটা রক্ষা করার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমরা করতেই পারি। একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই ভাল জানেন কিসের মাঝে মঙ্গল নিহিত আছে। ডাঃ রুনি আখতার রংপুর মেডিকেল কলেজের ৩৫তম ব্যাচের ছাত্রী। সে METASTATIC COLORECTAL CARCINOMA (POORLY DIFFERENTIATED) রোগী আক্রান্ত।

আমরা যে যেখানেই আছি, আমরা রুনির পাশে দাঁড়াবো। সামান্য কিছু টাকার অভাবে আমাদের একটা বোন তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেটা আমরা হতে দেব না। যার যার জায়গা থেকে আপনাদের সাহায্যের অপেক্ষায় রইলাম, হোক সেটা যতই সামান্য, হোক সেটা যতই ক্ষুদ্র। কারণ-আমরা জানি, অনেকগুলো ক্ষুদ্র একসাথে মিলে বিশাল কিছু হয়ে যায়।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানাঃ
ACCOUNT NAME : MST. RUNI AKHTER
ACC NO : 161.151.13730
DUTCH BANGLA BANK, SAIDPUR BRANCH, NILPHAMARY
বিকাশ নাম্বার ০১৭১০৮৭২১৭২

ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রচলিত কিছু প্রশ্ন এবং অন্যান্য

ডা. ইশতিয়াক কুশল (ইনকগনিটো) ব্যাচ-৬৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

কি সমস্যা?- জ্বর।
কয়দিন ধরে?- তিনদিন।
নাম কি?- শিউলি।
বয়স কতো?- ১৮।
ডাক্তার সাহেব ঘসঘস করে প্রেসক্রিপশন লেখা শুরু করে দিলেন। প্রেসক্রিপশনে অনেক কিছু আছে। ৬-৭টা টেস্ট। ৫-৬টা ওষুধ। লেখা শেষে শিউলির মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েই বললেন-জ্বর না কমলে এই টেস্টগুলো করিয়ে আবার আসবেন। নেক্সট।

শিউলির মায়ের প্রচণ্ড মন খারাপ হলো। ডাক্তার সাহেব মনোযোগ দিয়ে কোন কথাই শুনলেন না। কোন পরীক্ষাও করলেন না। উল্টো ৬-৭টা টেস্ট করতে দিলেন। ওষুধের দোকানে গিয়ে দেখা গেলো ওষুধগুলিও দামী। এর মাঝে ৫ মিনিটে রোগী দেখে উনি নিয়ে নিলেন ৫০০ টাকা। শিউলির মায়ের খুব হতাশ লাগতে থাকে।

পাঠক! কি ভাবছেন? উপরের ঘটনায় আমি কাকে সমর্থন করবো? ডাক্তারটিকে? নাকি রোগী পক্ষকে?
না, আমি এই ঘটনায় ডাক্তারটিকে সমর্থন করতে পারছি না। তার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। মূল কারণ হচ্ছে-তিনি বিশেষজ্ঞ, কিন্তু প্রতিটা রোগীর জন্য তার নির্দিষ্ট বরাদ্দকৃত সময় নেই। কি হতো, যদি তিনি প্রতিটা রোগীর জন্য নূন্যতম ১০ মিনিট করে সময় রাখতেন? হয়তো ৫টা রোগী কম দেখতে পারতেন। কিন্তু তাতে এরকম মন খারাপ নিয়ে কোন রোগীর ফেরত যেতে হতো না। এই গল্পে ডাক্তার রোগীর গায়ে কোন পরীক্ষা করেন নি। অথচ এটাও ছিলো চিকিৎসার অংশ। ডাক্তার রোগীর সাথে কোন ধরনের কাউন্সেলিং করেন নি। তাকে বুঝিয়ে বলেন নি, তিনি কেন এতোগুলি টেস্ট দিয়েছেন। তিনি কেন এতগুলি ওষুধ দিয়েছেন। এটা তার করা উচিৎ ছিলো। তার মানে কি ডাক্তার ভুল চিকিৎসা করেছেন? মোটেই না। একটা সাধারণ জ্বরেরও অজস্র কারণ থাকতে পারে। সেই হিসেবে ৬-৭টা টেস্ট খুবই মামুলি ব্যাপার। ভুলটা হচ্ছে-উনি এটা রোগীর কাছে পরিষ্কার করেন নি। ৫-৬ টা ওষুধের কি প্রয়োজন ছিলো? হয়তো ছিলো। হয়তো ছিলো না। ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট ছাড়া এটা বোঝা কঠিন। তবে, ওই যে বললাম-বিশেষজ্ঞ। সে তার মতো জটিল করে চিন্তা তো করবেই। হয়তো জ্বরটা ছিলো খুবই সাধারণ। হয়তো মোড়ের ফার্মেসীতে বসা তরুণ ডাক্তারটির কাছে গেলেও ১টি বা ২টি ওষুধে জ্বরটা সেরে যেতো। খরচ হতো বেশি হলে ২০০ টাকা। কিন্তু আমরা তো সেটা করি নি। আমরা জ্বর নিয়ে গেছি বিশেষজ্ঞের কাছে। তিনিও তাই করেছেন, যেটা তিনি সচারচর করেন কঠিন অসুখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে।

ভুলটা তাহলে কার?

আমরা কম ঝামেলায়, কম খরচে সেবা চাই। অথচ আপনি, আমি, কেউই চিকিৎসার জন্য নতুন পাশ করা ডাক্তারদের কাছে যাই না। আমরা অসুখ হলে বিশেষজ্ঞ খুঁজি। বাংলাদেশে এই মুদ্রাস্ফীতির যুগে একজন বিশেষজ্ঞের পারিশ্রমিক বেশি না। অবাক হলেন? আবারো বলছি-বাংলাদেশে, এই মুদ্রাস্ফীতির যুগে একজন বিশেষজ্ঞের পারিশ্রমিক আসলেই বেশি না। গত ১০ বছরে চালের দাম কতো বেড়েছে বলেন তো? ডালের দাম? নুনের দাম? তেলের দাম? একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ভিজিট কতো বেড়েছে? ভিজিট বাড়ে নাই। এতো অল্প খরচে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পৃথিবীর আর কোন দেশে পাবেন না। সারা পৃথিবী ঘুরে পরখ করে দেখতে পারেন। অথবা ঘরে বসেই গুগল করে খোঁজ নিতে পারেন।
দাম বেড়েছে ওষুধের। হ্যাঁ, দাম বেড়েছে ইনভেস্টিগেশনের। নিত্য নতুন টেকনোলজি আসছে ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে। এটা কিন্তু চিকিৎসকের দোষ নয়। এখন আপনি যদি ২ টাকা দিয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি পেতে চান, তাহলে আপনার আসলে টেকনোলজি সম্পর্কে আরও বেশি আপডেটেড হওয়া প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত দুইটা বড় বড় অভিযোগের ক্ষেত্রে চলে এসেছে। একটা হচ্ছে ওষুধ। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন।
ওষুধ সম্পর্কে বলি। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কমন অভিযোগের একটি হচ্ছে-তারা ওষুধ কোম্পানির সাথে যুক্ত। ওষুধ কোম্পানির কমিশন খেয়ে তারা ওই কোম্পানির ওষুধ ছাড়া লেখেন না। খুবই ভয়াবহ অভিযোগ। অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করাও অনেক দুরহ।
তার মানে কী ডাক্তার ওষুধ কোম্পানির কমিশন খান? বাংলাদেশে দুই শতাধিক ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানি আছে। এক এক কোম্পানির ওষুধের দামও সমান না, গুণগত মানও সমান না। কোন কোন কোম্পানির হয়তো ওষুধ তৈরি করতে খরচ বেশি পড়ে। তাদের কাঁচামাল হয়তো ভালো। তাদের ওষুধের দামটাও তাই বেশি। আবার কোন কোন কোম্পানি হয়তো কাঁচামাল তেমন একটা দেয় না। তাদের ওষুধের দাম কম। দাম কম দেখে বাজারে চলে বেশি। কোন কোন কোম্পানি হয়তো কাঁচামাল ভালো দেয়, কিন্তু দাম রাখে তুলনামূলক কম। তারা লাভও করে কম। এখন ধরুন, আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে যদি জানি যে-এই কোম্পানির এই ওষুধটি তুলনামূলক ভালো, এবং আমি যদি সেটা প্রেস্ক্রাইব করি, তার মানে কি এই-যে আমি ওষুধ কোম্পানির কমিশন খাচ্ছি? আমি হয়তো অন্য আরেকটি ওষুধ অন্য আরেকটি কোম্পানির লিখছি-কারণ সেটি ভালো। তাহলে তার মানে কি এই যে আমি দুই কোম্পানিরই কমিশন খাচ্ছি আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে অবশ্যই চাইবো আমার রোগীটা যাতে ভালো ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে ওঠে। তাই নয় কি? কেউ কি তার নিজের রোগীর খারাপ চায়? আমরা কি আপনাদের শত্রু? এখানে আমি আর কি করতে পারতাম? হ্যাঁ, এখানে আমি ওষুধের ট্রেড নেম না লিখে জেনেরিক নেম লিখতে পারতাম। অনেক দেশে তাই করে। (সেই সব দেশে সম্ভব কারণ সেখানের প্রতিটা ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিই মানসম্পন্ন) অর্থাৎ, উদাহরণ হিসেবে-"জিম্যাক্স"/ "এজিথ" এর বদলে এজিথ্রোমাইসিন। রোগী ফার্মেসী থেকে তার খেয়াল খুশি এবং পছন্দমতো কোম্পানির ওষুধ কিনে নিতে পারবেন। এটার সুবিধা কি-আপনি আর "কোম্পানির দালাল" বলে গালি খাবেন না। এটার অসুবিধা কী-এই দেশে রোগী ফার্মেসীওয়ালার কাছ থেকে সবচেয়ে বাজে এজিথ্রোমাইসিনটাই পাবে। তারপর কী হবে-রোগীর অসুখ ভালো হবে না। কিন্তু প্রেস্ক্রাইব করার সময় আপনি ব্যাপারটা বলে দিলে রোগী আপনাকে পুরোপুরি অভিযুক্ত করতে এক্ষেত্রে অসমর্থ।
ডাক্তার ভাই ও বোনেরা,
আমি জানি, এই বিতর্কের অবসান বাংলাদেশে জীবনেও হবে না। আপনাদের কাছে তবু আমার অনুরোধ-আপনারা ওষুধের জেনেরিক নেম লেখা শুরু করেন। রোগীর ভালো রোগী নিজে বুঝে নিবে। আপনি আগে এই অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন।

ডাক্তার অপ্রয়োজনীয় ইনভেস্টিগেশন করতে দেন?

রোগীদের আরেকটা খুব কমন অভিযোগ-ডাক্তাররা বিভিন্ন ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের সাথে জড়িত। সেখানে তারা রোগী পাঠায়, এবং কমিশন খায়। অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় নাই,কারণ সমগ্র বাংলাদেশ আমি চষে বেড়াই নাই। তবে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে দুই বছর ধরে কাজ করার পরেও, আমি একজন অনারারী কিংবা একজন ইন্টার্নকে কোন ধরনের কমিশন নিতে দেখি নাই। ডাক্তাররা কেন কোন নির্দিষ্ট টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের কথা বলেন? ডায়াগনোসিস এর উপর চিকিৎসার অর্ধেক অংশ নির্ভর করে। আপনি ভালো ডাক্তারের কাছে গেলেন, কিন্তু ডায়াগনোস্টিক সেন্টার আপনাকে ভুল রিপোর্ট দিলো, আপনি কি ভালো হবেন? এটা কি আপনার ভিজিট দেওয়া ডাক্তারটির দোষ? কিন্তু সে হয়তো নির্দিষ্ট ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে আপনাকে পাঠাচ্ছে, কারণ তার পূর্ব অভিজ্ঞতা হয়তো বলে-এই সেন্টারের রিপোর্ট তুলনামূলকভাবে নির্ভুল। আপনারা সেটা একবারও চিন্তা করতে পারলেন না। আপনারা ভেবেই নিলেন, এই ব্যাটা শিওর কমিশন খায়।
উত্তরণের উপায় কি? আপনারা রোগীকে নির্দিষ্ট ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে পাঠানো বন্ধ করেন। রোগী তার পছন্দমতো জায়গা থেকে টেস্ট করাক। তবে পাঠাবার আগে বলে দিয়েন, সব জায়গার রিপোর্ট কিন্তু সঠিক নয়। এবং আপনি রিপোর্টে যা পাবেন, সেটাই চিকিৎসা করবেন। সুবিধা কাদের হবে? ডাক্তারদের। তারা আর শুনবে না- ব্যাটা কসাই, টেস্টের কমিশন খায়। অসুবিধা কাদের হবে? রোগীর। কিন্তু তারা কখনো নিজেদের ভালো বুঝেনি। তাই তাদের নিয়ে চিন্তা করারও আপনার দরকার নেই। এই দেশে আপনারও মূল্যায়ন হয় নি। এটা পুরাই বিদেশী হেলথ কেয়ার সিস্টেম। ওখানে রোগীকে ট্রিটমেন্ট অপশনও দেওয়া হয়। রোগী বেছে নেয়। ফলাফল-ডাক্তারদের ঘাড়ে দোষ পড়ে না একদম। আপনি রোগীর কষ্ট কমাতে চাইলেন, তার ভালো করতে চাইলেন-কিন্তু রোগী বুঝলো না। তাহলে সেই উপকার করার কি দরকার আছে? যারা নিজেরা খাল কেটে কুমীর আনতে ভালবাসে, তাদের না হয় তাই আনতে দিন।

সমস্যাটা আসলে কাদের?

অতশত বুঝিনা, আমরা কম খরচে ভালো চিকিৎসা চাই। বিশেষজ্ঞের মতো চিকিৎসা।
ঠিক আছে। আপনারা বিশেষজ্ঞের মতো চিকিৎসা চান। তাও আবার কম খরচে। তাই সরকারী হাসপাতালে রোগী নিয়ে আসলেন, অর্ধ মৃত। যিনি এক পা কবরে দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু সরকারী হাসপাতালটা সারাদিন চালায় কারা? একটি ওয়ার্ডের ইনচার্জে থাকেন একজন প্রফেসর। কিন্তু দিনরাত সার্ভিস দেয় অনারারী এবং ইন্টার্নরা। তারা কি বিশেষজ্ঞ হতে পেরেছে এখনো? আপনি কি এইসব অনারারী এবং ইন্টার্ন দিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা চাইছেন? যে রোগীটাকে আপনি রাত তিনটায় সরকারী হাসপাতালে নিয়ে আসলেন, সেই রোগীটার হয়তো প্রয়োজন ছিলো ইনটেনসিভ কেয়ার। জটিল রোগী, বিশেষ চিকিৎসা। কিন্তু ভোর ৯টায় বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আসার আগেই রোগী এক পায়ের জায়গায় দুই পা কবরে দিয়ে দিলো। এখন কি আপনি এই কারণে-একজন অবিশেষজ্ঞ ইন্টার্ন কিংবা অনারারীকে মারধোর করবেন? সব রোগী তো আর সবসময় বাঁচে না।

কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা?

একজন অবিশেষজ্ঞ ইন্টার্ন কিংবা একজন অবিশেষজ্ঞ অনারারীর বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠার পিছনের রূপকথা সম্পর্কে আপনাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। ইন্টার্ন শেষের পর দীর্ঘ চার চারটা বছর তাদের সরকারী হাসপাতালে সেবা দিতে হয় বিনা পারিশ্রমিকে। একটা টাকাও তারা বেতন পায় না। তাদের এই সেবা দিতে হয় শুধুমাত্র একটা বিশেষজ্ঞ ডিগ্রীর পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। পরীক্ষা দেওয়ার মানে কিন্তু এই না যে তারা পাশ করে গেলো। পাশের সংখ্যাটা এতোই কম, যে বলতে লজ্জা লাগছে।

ডাক্তাররা মানুষ, নাকি পশু? বিদেশী ডাক্তারদের ব্যবহার জীবনেও দেখেছো? বিদেশী ডাক্তারদের ব্যবহার অবশ্যই ভালো। এটা আসলে গিভ এন্ড টেক নীতির মতো। ব্যাপার হচ্ছে-বিদেশের কোন নাগরিকই কিন্তু যেয়ে ওখানের ডাক্তার পেটায় না। হাসপাতালে যেয়ে কোনদিন হইচই, গ্যাঞ্জাম করে না। তারা নিজেরাও চিকিৎসা জানে না, কিন্তু কখনো চিকিৎসকের উপর মাতব্বরি করে চিকিৎসা শেখাতে যায় না। আমাদের দেশেও মূলত দুই শ্রেণীর মানুষ খুব ভালো চিকিৎসা পায়। এক-খুব উচ্চশিক্ষিত, ডাক্তার যা বলে তাই করে। দুই-অশিক্ষিত গরীব। ডাক্তার যা বলে তাই করে। ডাক্তার ছাড়া সাহায্য করার মতো যার কেউ নাই। আসলে এটা সমগ্র দেশের মানুষের মানসিকতার উপর নির্ভর করে।

অনারারীদেরও একটা পরিবার আছে। সন্তানটার মুখে ভাত তুলে দিতে হয় তাদের। বাবা মায়ের মুখে ভাত তুলে দিতে হয় তাদের। এই কারণে তারা চাকরি নেয়। কি চাকরি জানেন? হয় ক্লিনিক/বেসরকারি হাসপাতালের চাকরি, না হয় বিসিএস। বিসিএস? শালা তোমরা তো লাট বাহাদুর। গ্রামে যেয়ে থাকো না। আমাদের মন্ত্রী বলেছেন-দুই বছর বিসিএস ডাক্তারদের গ্রামে থাকতেই হবে। (এখন মাঝে মাঝে অবলীলায় ৩ বছরও বলেন) আর আপনারাও হুংকার ছাড়েন- শালারা গ্রামেই যেতে চায় না। আমি গুণে গুণে দুই বছর (তার মানে- ৩৬৫ দিন+ ৩৬৫ দিন= ৭৩০ দিন) গ্রামে থাকবো। কিন্তু মন্ত্রী সাহেব, আপনিও কথা দিয়েছিলেন-আপনি দুই বছর শেষ হওয়া মাত্রই আমাকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিবেন। আপনার সেই কথা মনে থাকে না। যারা যায়, তারা আর ফিরে আসে না। দুই বছর কেন, চার বছর চলে যায়, দশ বছর চলে যায়। তারা তো আর ফিরতে পারে না উচ্চ শিক্ষার জন্য। আপনি আমার বন্ড সই নিবেন? আমি দিবো। কিন্তু আপনারও বন্ড সই দিতে হবে, যে দুই বছর হওয়া মাত্রই আমাকে ট্রেনিং পোস্ট দিবেন। রাজী? যদি রাজী না হন,তাহলে আপনারও কোন অধিকার নেই হুংকার ছাড়ার। আপনি একজন মানুষকে দুই বছরের জায়গায় ৫ বছর গ্রামে রাখার চেষ্টা করলেও সেও তো একই ভাবে দুই বছরের জায়গায় এক বছরে ফিরে আসার চেষ্টা করবে। দুই জনের দাঁড়িপাল্লাইতো তখন সমান ভারী! আপনার বিসিএস এর কি সুযোগ সুবিধা? কতো টাকা পারিশ্রমিক দেন একজন চিকিৎসককে? ১৭৩১০ টাকা। ঢাকায় থেকে যে কোন বেসরকারি হাসপাতালে আবেদন করলে চাকরী মিলবে। ওরা বেতন দেয় কতো?
১৮০০০-২০০০০ টাকা। তাহলে আমার গ্রামে যাওয়ার পেছনে যুক্তিটা কি? গ্রামে গেলে সেই দুই বছর/তিন বছর/চার বছর/অনির্দিষ্ট বছর আমি ট্রেনিং করতে পারবো উচ্চশিক্ষার-না। বেসরকারি চাকরী নিলে আমি কি তার সাথে সাথেই উচ্চশিক্ষার ট্রেনিং নিতে পারবো-হ্যাঁ। তাহলে আমার গ্রামে যাওয়ার যুক্তিটা কী?

তবু চিকিৎসকরা সরকারী চাকরী নেয়। বিসিএসে। তারপর গ্রামে যায়। বেসরকারি চাকরীর তুলনায় তেমন কোন সুযোগ সুবিধা নেই, তেমন আহামরি কোন বেতনও না। অথচ অস্ট্রেলিয়ার মত জায়গায়, যে যত গ্রামের দিকে যায়, তার পারিশ্রমিক তত বেশী। শহরের তুলনায় দ্বিগুণ, তিনগুণ। কারণ, তারা গ্রামে যাচ্ছে কষ্ট করে, তাদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আমাদের দেশে এরকম কোন ব্যবস্থা নাই। তাহলে দেশের সবচেয়ে মেধাবী ছেলে মেয়েগুলি গ্রামে যেয়ে কেন পড়ে থাকবে? চিরকাল অবিশেষজ্ঞ থাকার জন্য? আমরা তবু যাই। কেন, জানেন? একটু সম্মানের জন্য। একটা সরকারী চাকরীর সম্মান। আর কিছু না।

বাংলাদেশে ম্যালপ্র্যাক্সিসের অভিযোগ অমূলক নয়। আমরা সমস্যা নিয়ে অনেক উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করি, সাংবাদিকরা সরকারী হাসপাতালের ভুল ধরার জন্য ওঁত পেতে বসে থাকে, কিন্তু আমরা কখনো মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারি না। এত এত মিডিয়া, এত এত সংবাদপত্র, কই-কোথাও তো রোগীদের সেরে ওঠার কোন খবর নেই তেমন। পত্রিকায় কয়টা ব্যাবসা করা, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা ক্লিনিকের কথা লেখা হয়? পত্রিকায় তো দেখি-ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু। অথচ একটা চিকিৎসা ভুল নাকি সঠিক, এটা চিন্তা করতেও ৩-৪ জন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন।

বাংলাদেশে হেলথ কেয়ার সিস্টেমের মূল সমস্যার গভীরে রয়ে গেছে এদেশের জনসংখ্যা। দুর্বল রেফারাল সিস্টেম। ডাক্তারদের প্রতি মানুষদের অনাস্থা। বিদেশ প্রেম। অসহনশীলতা, অধৈর্য, অসহিষ্ণুতা। পঙ্গু হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের চিকিৎসকদের অভিভাবক সংস্থা যার অবলুপ্তি সত্যিকার অর্থেই প্রয়োজন এই দেশকে বাঁচানোর জন্য। চিকিৎসকদের সাথে শাসকদের প্রতারণা এবং স্বাস্থ্য সেবার নামে ব্যাবসা করা প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেখানে রোগীদের দুর্ভোগের শেষ থাকে না কোন। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছি। আমি, এবং আমরা।

যে কথা বলবে না কোন মিডিয়া

মা'রুফ রায়হান খান, ব্যাচ-৮, এনাম এমসি, সাভার

১। গর্ভবতী মহিলা ভর্তি হলেন গাইনী এণ্ড অবস ওয়ার্ডে। ডেলিভারি হল। যে বাচ্চাটি জন্ম নিল সে প্রিম্যাচিউর, লো বার্থ ওয়েট মাত্র ১.৫ কেজির মতো ওজন। বাচ্চার অবস্থা বিশেষ ভালো না। নিবিড় পরিচর্যা অতি প্রয়োজন, তাকে পাঠানো হল NICUতে ভেন্টিলেটরে। যেহেতু এটা প্রাইভেট মেডিকেল, জেনে থাকবেন ICUতে অনেক খরচ। আর ওদিকে গাইনী ওয়ার্ডে ভর্তি বাচ্চার মা। এবার আপনি অবাক হবেন। মা একটু সুস্থ হবার পর রোগীর লোকেরা মাকে নিয়ে কেটে পড়লেন, বাচ্চাকে ফেলে! হ্যাঁ, বাচ্চা তখনও NICUতে, আর তারা পগারপার! NICUতে দায়িত্বরত ডাক্তাররা বাচ্চার এটেন্ডেন্ট না পেয়ে বারবার ফোন দিতে লাগলেন তাদেরকে। হয় তারা ফোন ধরেন না, নয়তো এই যে আমরা আসছি, অমুক জায়গায় আছি এসব বলেন। এভাবে কেটে গেল প্রায় এক মাস। অবশেষে বাচ্চার মায়ের চন্দ্রমুখ দেখা গেল। বাচ্চাকে নিয়ে যেতে হলে তো হসপিটালের এতদিনের বিল পরিশোধ করে যেতে হবে। বিল হয়ে গিয়েছে এতদিনে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। তাদের কাছে কোনো টাকা নেই। বাচ্চাকে কীভাবে নিয়ে যাবেন? ইন্টার্ন ভাইয়া আপুরা একসাথে বসলেন কী করা যায়, বাচ্চাটার জন্য তাদের গভীর মায়া জন্মেছে ততদিনে। চাঁদা তুলে তারা জোগাড় করলেন ৪০/৫০ হাজার টাকা। ছোট করে দেখবেন না, ইন্টার্ন ডাক্তারের বেতন আপনার গাড়ির ড্রাইভারের চেয়েও অনেকক্ষেত্রে কম। এবার তারা গেলেন হসপিটালের ডিরেক্টরের কাছে বিলটা যদি একটু কনসিডার করেন। অবশেষে প্রায় ১ লক্ষ টাকা মাফ করিয়ে ঐ টাকাতেই বাচ্চাটাকে রিলিজ করা হল। ঘটনা শুনে কেউ আবার বলে বসবেন না মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি!

২। আমরা ওয়ার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এক ইন্টার্ন আপু হাতে কয়েকটা টাকার নোট এবং পাশে এক লোককে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। ঐ লোকের মা মারা গিয়েছেন, দাফন-কাফনের টাকা নেই। আমরা যেন সাহায্য করি। যে যা পারি দিলাম। এভাবে আপুটা তার বিভিন্ন কলিগদের কাছে যেয়ে যেয়ে টাকা তুলছেন। তিনি একজন ধনীর দুলালী সব সঙ্কোচ ভুলে হাত পাতছেন, এমনকি জুনিয়রদের কাছেও! এটা কোনো বিচ্ছিন্ন কিংবা অস্বাভাবিক ঘটনা না।

৩। বাচ্চা প্রসবের সময়ে যে প্রসূতির রক্ত লাগা খুবই স্বাভাবিক এবং এজন্য আগে থেকে রক্তদাতা ম্যানেজ করা উচিত বেশির ভাগই হয়তো জানেন না, জানলেও হয়তো মানেন না। সে যা হোক, ওটির টেবিলে যখন পেশেন্টের রক্ত প্রয়োজন হয়, রোগীর লোকদের বলা হয়, রক্ত খুঁজে পান না তারা। সাধারণত রক্তের গ্রুপ মেলে না, রক্তের গ্রুপ মিললে তারা নাকি খুবই দুর্বল, স্বাস্থ্য ভালো না, ভয় পান ইত্যাদি বাধ্য হয়ে ডাক্তাররাই খোঁজ করেন রক্তের। কখনও সহকর্মীদের, কখনও জুনিয়রদের ফোন করে ব্যবস্থা করেন রক্তের। খুব কম ইন্টার্ন ডাক্তারই বোধহয় আছেন যারা এরকমভাবে রক্ত ম্যানেজ করে দেন না পেশেন্টদের।

৪। রাত সাড়ে ১২টা। পরের দিন পরীক্ষা। একটা সিরিয়াস রোগীর জন্য রক্ত লাগবে আরেক বন্ধু এসে খবর দিল। পড়া বাদ দিয়ে সে ছুটলো রক্ত দিতে। মেডিকেলে ৫ বছর পড়েছে, অথচ নিয়মিত রক্তদান করেন না এমন ছাত্র খুবই কম। আমাদের ব্যাচের কথা বলতে পারি, অন্তত ৬০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত রক্ত দেন।

৫। একজন Honorary Medical Officerকে একটা ওষুধ কোম্পানি এসে কিছু স্যাম্পল দিয়ে গেলেন। তিনি গ্রহণও করলেন। একটু পর নার্সকে ডেকে বললেন অমুক বেডে ওষুধগুলো দিয়ে অসুস্থ গরীব মানুষ ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই। প্রাপ্ত বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ অনেক ডাক্তারই দিয়ে দেন অসহায় রোগীদের।

৬। প্রসব বেদনা উঠেছে রাত ১০টায়। লেবার রুমে আনা হয়েছে যে কোনো সময় ডেলিভারি হবে। পৌনে ৪টার দিকে ডেলিভারি হল। পুরো সময়টাতে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি বাচ্চার অপেক্ষায়, মাঝে মাঝে পাশে একটু টুলে বসেন, অযথা বসে থাকেন না গ্লাভস খুলে বইয়ের পাতায় চোখ বুলান। সামনে সিম্পল এমবিবিএসের অপমানজনক তকমা এড়াতে পোস্টগ্রাজুয়েশান নামক সোনার হরিণের পেছনে দৌঁড়াবেন তিনি।

৭। অন্যদের কথা বাদ দিই। আমার বন্ধুদের কথায় আসি। তখন থার্ড ইয়ারে নতুন নতুন সার্জারি ওয়ার্ড করা শুরু করেছি। স্যার একটা পেশেন্ট দেখাতে নিয়ে গেলেন তার ফিকাল ফিস্টুলা ডেভেলপ করেছে। রোগী স্যারের হাত বড় নির্ভরতার সাথে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন "সার আমি বালো অমু তো, গরীব মানুষ আমরা সার।"স্যার আশ্বাস দিয়ে এলেন ঠিকই, পরে আমাদের ডেকে শোনালেন হৃদয়বিদারক কথাটা। রোগীটির যে জটিলতা তাতে তাকে মুখে খাবার দেয়া যাবে না। শিরার (Vein) মধ্য দিয়ে পর্যাপ্ত পানি, ইলেক্টলাইটস,খুব প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো তরলাকারে সরবরাহ করতে হবে। যদি তাকে এভাবে সাপোর্ট দেয়া যায় তাহলেই তার সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। প্রচুর খরচ এতে, অনেক বেশিই বলা চলে। যদি দিতে না পারা যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। ২য় বারেও মেয়ে সন্তান হওয়ায় উনাকে ফেলে নাকি চলে গিয়েছে তার পাষণ্ড স্বামী, বাবাও জীবিত নেই। স্যার বললেন, দেখ তোমরা কিছু করতে পারো কিনা।
এর আগের দিন আমাদের কলেজে পিঠা উৎসব ছিল। যে টাকা প্রফিট হয়েছিল, সেটা দিয়ে আমরা একটা পার্টি দেব ভেবে রেখেছিলাম। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হল যা টাকা সবাই মিলে ইনভেস্ট করেছিলাম এবং যা লাভ হয়েছে সব দিয়ে দেব উনার ট্রিটমেন্টের জন্য। শুধু তা না, এর পরদিন থেকে সব ক্লাসমেটরা যে যেভাবে যেখান থেকে পেরেছে টাকা জোগাড় করে একসাথে জমা করেছে। আমাদের টিচাররা ওষুধ কোম্পানির সাথে কথা বলে কম দামে ওষুধের ব্যবস্থা করেছে। এভাবে প্রায় ৩ মাস ধরে চললো তার ব্যয়বহুল চিকিৎসা। অপারেশন হল। কোন টাকা তার কাছে ছিল না। রিলিজের দিন সবাই মিলে গেলাম হসপিটাল ডিরেক্টরের কাছে। অনেক কম টাকা ব্যয়ে তাকে রিলিজ করা হল। এত টাকা উঠেছিল যে,পুরো চিকিৎসার পরেও আমাদের কাছে আরও টাকা থেকে গিয়েছিল। যাবার সময় সে টাকাটা আমরা দিয়ে দিলাম যাতে কিছু করে খেতে পারে। ছাগল কিনে পালা শুরু করলো। তা দিয়ে সংসার চলে না। একটা অর্গানাইজেশানের সাথে কথা বলে ব্যবস্থা করা হল সেলাই মেশিন। তার মেয়েকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হল মোহাম্মদপুরের একটা ভালো মাদ্রাসায়। এখনো তাদের সাথে যোগাযোগ হয়। সেদিন একটা সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন একজন স্যার ফ্রি দেখে নিজের কাছে থাকা ওষুধ দিয়ে দিলেন। সেদিনের কথা ভোলা সম্ভব নয় আমাদের এ উদ্যোগটা দেখে এক স্যার খুব খুশি হয়েছিলেন, মানিব্যাগ থেকে ৫০০ টাকার একটা নোট বের করে দিয়ে বলেছিলেন, এ স্পিরিটটা ধরে রাখিস সবসময়।
৮। আমাদের স্যার-ম্যাডামরা আমাদেরকে শেখান রোগীদের বাবা-মা বলে সম্বোধন করতে চাচা,মামা, খালা না। রোগীদের উপর যখন পরীক্ষা দিতে হয়, তখন রোগী যদি একটুও ব্যথা পায় কিংবা অন্য কোনোভাবে অসন্তোষ প্রকাশ কবে তাহলে সে ছাত্রের আর পাশ করা লাগবে না। এভাবেই প্রশিক্ষণ পায় প্রতিটি ছাত্র।
৯।একটা রোগীকে বলা হল তার অপারেশানের জন্য মুখে কোনো খাবার দেয়া যাবে না
সে জিজ্ঞেস করলো পানি খাওয়া যাবে, ভাইয়া বললেন, না। তার পরের প্রশ্ন, টাইগার খাওয়া যাবে কি?

"আমি এমপি সাহেবের চামচা, অমুক কমিশনারের একমাত্র ছাত্তিবাহক আমি, আমার কাম আগে কইরা দেন, তাত্তাড়ি কইরা দেন" এসব চোখ রাঙানি দেখার পর কোনো ডাক্তারের মন মেজাজ যদি একটু খারাপ হয়ে যায় এত ব্যস্ততা ও কাজের চাপের মধ্যে তাহলে সেটা কি অতি অস্বাভাবিক? ডাক্তারের জুতোটা আপনি নিজের পায়ে না পড়লে কখনোই তাদের সাইকোলজিটা ধরতে পারবেন না।
(নিজেদের ভালো কথা আমরা নিজেরা বলতে চাই না। কোনো মিডিয়া আমাদের দু'একটা ভালো কথা লিখতে চাইছে না, ছড়িয়ে দিচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিদ্বেষের বিষবাষ্প। জনতা ভুল বুঝছে। তাদের এখন জানার অধিকার আছে আমাদের ভেতরের কথাগুলো।)

বিদেশে চিকিৎসা

ডাঃ মৃণাল সাহা, ব্যাচ-৩৮, সিলেট এমএজি ওসমানী এমসি

১। আপনার পরিবারের কেউ খুবই অসুস্থ, ধরে নেয়া যায় এই রোগীর জন্য তেমন কিছুই করার নেই, শুধু খুব ভালো নার্সিং ছাড়া। এমনি সময় পাশের বাসার বড় ভাই বললেন, ভাই, এত কী যে করেন, এদেশে কোন ডাক্তার আছে? ওরা কিছু জানে? আমার বাবাকে তো সিঙ্গাপুর নিয়ে ভাল করে আনলাম। কিছু টাকা পয়সা খরচ হইসে এই যা! আপনিও যান, আমি এড্রেস দিমুনে! ইনশাল্লাহ দেখবেন আঙ্কেল দিব্বি ভাল হয়ে যাবে, মা বাপের চিকিৎসা নিয়া কি কিপ্টামি চলে? "সারা রাত আপনার আর ঘুম এল না। আপনি কি পারতেন না দেশে ঘুরাঘুরি না করে বিদেশ যেতে? তাহলে কি আজ এভাবে অপদস্ত হতে হত? আজ পাশের বাসার বড় ভাই বলেছেন, নিজের আপন ভাই যে ক'দিন পরে বলেবেন না তার কী গ্যারান্টি? আপনি যথারীতি আপনার ডাক্তারের কাছে গেলেন, উনি বললেন নিয়ে লাভ নেই, আরো বললেন,"ভাই! আমরা যে বই পড়ে ডাক্তার উনারাও তাই। হয়ত ওদের কিছু স্পেশাল যন্ত্রপাতি আছে,কিন্তু-যার শরীরের যন্ত্রই ঠিক নেই, তাকে কেন এত টানা হেঁচড়া করা? আর উনি তো ফ্লাই করার জন্য ফিট না"। আপনি সিদ্ধান্ত-নিলেন যাবেন না। রোগী কিছু দিন ভাল ছিল। তারপর আবার খারাপ হয়ে গেল। আপনি বিদেশ গেলেন, দীর্ঘ ক্লান্তিতে পেশেন্ট আরো খারাপ হল। ওখানকার ডাক্তাররা ফেরেশতার মত এসে বললেন-"ওহ! নো! ইফ ইউ কেইম আরলিয়ার, উই উড সেইভ হিম।"আপনার চোখে ভাসে,পাশের বাসার বড় ভাই য়ের বিদ্রুপ, মনে মনে গালি দেন বাংলাদেশের ঐ ডাক্তারকে-" কসাই একটা! আগে রেফার করলিনা কেন? নিজের লাভে রোগী রাইখা দিলি?"
২। এবার আসি আরেকটা সত্যি কথায়, আমার এক পেশেন্ট, একিউট এম, আই! ঢাকায় রেফার করলাম! রোগী ঢাকায় গেল। অ্যাঞ্জিওগ্রাম, তারপর ইমারজেন্সি বাই পাস! রোগীর মেয়ে জামাই ডাক্তার! কনসালটেন্ট! এর পর কিছু দিন পর ইনফেকশন! উনাকে পাঠান হলো বাড়িতে, নিয়মিত ড্রেসিং করলেই সেরে যাবে! রোগী আবার এল আমার কাছে! আমি ড্রেসিং করি, পুঁজ পড়া কমে না! আমি ছাপোষা! এমবিবিএস আমার কি সাধ্য? আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলি! ফোন বুকে যে সব বন্ধু কার্ডিয়াক সার্জারিতে আছে, তাদের জ্বালাই। দুই দিন পর পর জামায়ের কাছে কৈফিয়ত দেই, ভাই এমন পাইসি, ভাই একটু কমসে! এই আর কি! আমি উনাকে আবার ঢাকা পাঠাই। প্রফেসর দেখেন বলেন, ড্রেসিং করেন, সেরে যাবে! তারপর আবারো যান, একই কথা। তারপর আমাকে বলা হল, আমি নাকি স্টেরাইল ওয়েতে ড্রেসিং করি না! যাহ বাবা, বন্ধু হতে চেয়ে শত্রু না হয়ে যাই! বিশাল বড়লোক পেশেন্ট হলে এমনি হয় হয়তো! আমি উনাকে অন্য সার্জন দেখাতে বললাম, উনি নামকরা ডাক্তার দেখালেন কয়েকজন। তারা বললেন, এই সব পচা কেইসে আমরা হাত দেই না! যিনি করসেন উনার কাছে যান। কেউ বললেন বেপারটা জটিল, মেডিয়াস্টেনাইটিস, অস্টিওমায়েলাইটিস হয়ে গেসে, মাল্টি ড্রাগ রেসিস্টেন্ট কেইস! অনেক দিন হাসপাতালে থাকা লাগবে, অনেক টাকা লাগবে! এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের ডাক্তারদের নিজেদের পিঠ বাঁচানোটাই এখন মুখ্য ব্যাপার হয়ে গেছে! শিল্পপতি রোগীর যদি দুইজন অভিভাবক থাকে (একজন ডাক্তার আর একজন রাজনৈতিক নেতা), তাহলে কাউন্সেলিং এমনই হয়! কেউই সাহস করেন না। তাছাড়া, রোগীর লোকরাও হয়ত ডাক্তারকে সেই ভরসা দেয় না, যা আমাদের গরীব রোগীরা আমাদের অহরহ দিয়ে থাকে!
ঐ রোগী ঠিকই থাইল্যান্ড গিয়েছিল, আমিই বলেছিলাম। ভাল হয়ে দেশে ফিরে আমাকে তো পারলে মাথায় তুলে নাচে। আমিও তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভয়ে ছিলাম। যদি ওখানে গিয়ে কিছু হয়ে যেতো আমারও খবর ছিল! ভগবান এই যাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন!
(৩) কাজেই, রোগী যেখানে আপনাকে এত বেশী বিশ্বাস দেখান না, সেখানে আন্তরিক হয়ে তাকে সেবা দিতে গেলে হিতে বিপরীতই হতে পারে! এখন দেখুন, আমাদেরও কিছু কাউন্সেলিং এর ভুল-আমরা কি পারি না, ভেদাভেদ ভুলে, কয়েকজন ডাক্তারের টিম করে একটা সমাধানে আসতে? একজন আরেক জনের ভুল ধরে, নিজেকে সেরা প্রমাণ করার ট্রেন্ড আর কত? আমাদের আরো ভাল কাউন্সিলিং করানো দরকার, আরো উন্নত হাসপাতাল দরকার! আমাদের সীমাবদ্ধতা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের দেশের মানুষ এর মুখ বন্ধ করা আমাদের আর হবে না। কিছু রোগী বিদেশ যাবেই, আমরা কখনই তাদের কাছ থেকে সন্তুষ্টি সূচক ধন্যবাদ পাবো না। আমাদের আপামর গরীব মানুষের চিকিৎসা করে যে শান্তি, আমরা তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি! সেই ভালো!

অপুষ্টি ও ডায়াবেটিস

ডাঃ মফিজুল ইসলাম (সাচি), ব্যাচ-৩৬, চট্টগ্রাম এমসি
এন্ডোক্রাইন বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল ঢাকা

আমরা অনেকেই হয়তো জানি না যে, অদূর ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস মহামারী আকারে দেখা দেবে। আমাদের মত গরীব দেশের জন্য প্রতিরোধ হওয়া উচিত প্রথম লক্ষ্য। কারণ আমরা জানি ডায়াবেটিসের চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল এবং তা হবে আমাদের উন্নয়নের পথে শক্ত বাঁধা। এর পাশাপাশি শিশু ও গর্ভবতী-প্রসূতি মৃত্যুর উচ্চহার আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা ও প্রগতির অন্তরায়। এ দুটি সমস্যা আসলে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। গর্ভবতী নারীর অপুষ্টি→অপুষ্ট শিশু→শিশু মৃত্যু অল্পসময়ের ব্যবধানে পুনরায় গর্ভধারণ গর্ভবতী নারীর অপুষ্টি→অপুষ্ট শিশু→শিশু মৃত্যু।

এভাবেই চলতে থাকে দৃশ্যপট। সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্টে জানা যায়, স্বাভাবিক ওজনের (২.৫ কেজির বেশি) চেয়ে কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুর, স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুর চেয়ে পরবর্তীকালে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশি। এ ব্যাপারে ১৮২৩০ মানুষের উপর গবেষণা চালানো হয় সুইডেনে। তাই আমাদের ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে গর্ভবতী নারীর সুস্বাস্থ্যের প্রতি সমান সুনজর থাকে। সুস্থ মায়ের শিশু হবে সবল, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে বেশি আর কমবে শিশু মৃত্যুহার। এজন্য গর্ভবতীকে অবশ্যই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরামর্শের জন্য যেতে হবে এবং প্রসব পর্যন্ত স্বাস্থ্যকর্মীর তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। আর অপুষ্ট শিশু যদি হয়েই যায়, অবিলম্বে শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর ওজন অনুযায়ী পুষ্টি বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিশেষ খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে তা খাওয়াতে হবে। এর পাশাপাশি প্রতি মাসে শিশুর ওজন নিতে হবে এবং দেখতে হবে তা তার বয়স অনুযায়ী সঠিক ওজন সীমায় পৌঁছালো কিনা। এর পাশাপাশি শিশুর দৈর্ঘ্যও মেপে দেখতে হবে। রোগ প্রতিরোধ টিকার সবই শিশুকে দিতে হবে। তবে এই অপুষ্ট শিশুর চিকিৎসা ডায়াবেটিসের চিকিৎসার মতোই ব্যয়বহুল এবং প্রতিরোধই প্রত্যাশিত।

The Need for Palliative Care in Bangladesh

Dr Shahinur Kabir, Batch-10, Khulna Medical College, Palliative care doctor

Dying with incurable illness in poverty and pain is all too common in this sub continent as well in our country. With minimal resources shortages of health workers, national health systems in a number of South Asian countries have focused primarily on preventive, curative and maternal health services.In many countries minimal or no resources have been dedicated to supportive or palliative care. Palliative care is a developing branch of healthcare that deals with the terminally-ill, incurably-ill and chronically bed-ridden people. A large percentage of the patients who need palliative care are cancer patients in extreme pain; some of them are in the terminal stage. Millions of others suffering from paraplegia, acute renal and respiratory problems, and many other incurable illnesses also benefit from palliative care.

According to Bangladesh Cancer Society new adult cancer patients 250000/yr, and total cancer burden 10,00000/yr. This is an institutional based statistics, the actual picture probably far away from it because due to many barriers the majority of the patients could not reach to final diagnosis or avail treatment facilities. According to the oncologists and referral hospitals approximately 75% of the cancer patients attending for treatment are incurable and they get treatment in palliative setting. 30-40% of these patients are in end days of life with lot of sufferings and their admission are refused by the hospitals as our hospitals are overloaded with patients of acute illness. According to Society of Neurologist of Bangladesh (published in June, 2012) the rate of stroke patients 5-12 /1000/year and among them 35% become permanently disable or depend on care givers. There is no such hospital to support them on a regular basis.

Bangladesh, which in the past few years has made some strides in public health, has a large number of people in need of palliative care. The country, with 160 million people and scarce resources and medical infrastructure. Delivering appropriate care for people with incurable progressive diseases in the last phase of life is an important, but largely neglected . In recent year deficits in this field have increasingly come to the attention of the public, and professionals, as have increasing demands for the development of palliative care.

The first recognized Palliative Care Unit (PCU) in Bangladesh is ASHIC palliative care Unit for childhood cancer patient at Dhanmondi, Dhaka, which was Established on 20th May 2006. Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University established palliative care service in 2007. They improved their service for palliative patients in 2011 with indoor facilities of 25 beds. Besides Shanti oncology and palliative care unit, ASHIC oncology and palliative care center and newly established Hospice Bangladesh are working in these sectoer. We have only 5-6 Palliative Medicine specialsts in our country. A group of dedicated doctors and philanthropists working in this field with the vision to establish palliative care services for the patients with chronic illness and a lot of sufferings as well as development of manpower in this field. They are also trying to make available the essential drug Morphine as pain killer which is rarely available in our country.

The evolution and growth of palliative care service and hospice should be from the combined effort of both the public and the private sectors. Without community involvement establishment of this sector is not possible. The fact should not be overlooked that if specialist and facilities of palliative care become fully available in the future, a big proportion of the total number of patients with incurable, progressive diseases will get benefit from this care. It is estimated that 30-40 % of the incurable, seriously ill and dying need some form of palliative care in this country.

How to make the doctor-patient relationship work!

Dr. M. Tasdik Hasan. MPH, DMCH&IO, GAVI Alliance

From ancient times, physicians have recognized that the health and well-being of patients depends upon a collaborative effort between physician and patient. Patients share with physicians the responsibility for their own health care. The patient-physician relationship is of greatest benefit to patients when they bring medical problems to the attention of their physicians in a timely fashion, provide information about their medical condition to the best of their ability, and work with their physicians in a mutually respectful alliance.

If we consider Bangladeshi context, this relationship is passing a time of transition. Yellow journalism, media-conspiracy, silence of the highest authority of medical professionals and several factors have brought this unrest situation either in private or government medical sector in Bangladesh. Some strategies can be taken to develop the relationship between doctor and patient by considering all the extrinsic and intrinsic factors.

Time is a major factor in the primary care relationship. Patients don't like long waits for doctors, and doctors are annoyed when patients bring up multiple concerns in time allotted for one. When time is counted in years, the primary physician's complete record of a patient's health limits redundant testing and promotes positive change. To organize face-to-face time with patients, doctors can use several strategies like planning of appointments as per acute or chronic illness by generating test orders so data are available at the visit. A chart reminder can be used for vaccines and screenings both in tertiary hospitals or private visits. Patients should be encouraged to maintain and bring a list of concerns, medications, and blood pressure and glucose logs. At all visits, they can complete a written health history update. Paper based/electronic patient self-assessments can be used.

Technology, the second factor, is receiving unprecedented attention with primary care medical home initiatives and meaningful use. The Consumer Reports survey (USA) found that 37% of primary care doctors are using electronic health records (EHRs), a jump of 13% compared with 4 years ago. While 61% of patients search online about their health conditions, fully half of doctors believe their patients' Web research has little to no value.

However, In Bangladesh now a significant number of patients use reliable online sources. Still, they can be overwhelmed, like a GP from USA wrote in a medical blog "My two recent breast cancer patients who struggled to understand oncology stats on surgery, chemotherapy, radiation, and genetic testing before they had their final pathology results. In response to this trend, our hospital hired a "Breast cancer navigator" to help patients understand which information mined from a mountain of data actually applies to them. I predict the typical primary care physician's duties will develop into a similar health-navigator role in the years ahead." In this world of technology the physicians of Bangladesh can also start practicing using technology and understanding properly to let their patient understand so that no journalist can write the patient had died due to wrong treatment without understanding a single word regarding the treatment plan/the disease pathology and can create a platform of bitterness between a doctor and his patients.

Appreciation; Patients and doctors both value courtesy. Respect is a two-way street and can be expressed with simple steps, starting with promptness at appointments. Medical staff should ask patients how they want to be addressed, make eye contact, and ask about important people or events in the patient's life. Doctors surveyed by Consumer Reports say they appreciate patients who ask questions and challenge treatment recommendations. Doctors should value simple words of thanks and patients who refer family or friends. Patients appreciate professionalism. This starts with appearance. One patient recently wrote in Facebook that she felt doctors and assistants should be dressed professionally every day of the week, in keeping with the high standard of care we aspire to provide. Perhaps we need to reconsider our "casual" Fridays/Holidays. Other aspects of professional conduct include technical competence, attentive listening, and careful review of patient history and treatment options. In brief, the relationship between doctors and their patients has received philosophical, sociological, and literary attention since Hippocrates, and is the subject of some 8,000 articles, monographs, chapters, and books in the modern medical literature. A robust science of the doctor-patient encounter and relationship can guide decision making in health care plans. In our country, it is mandatory to understand the feeling of a patient party by considering the socio-economic background and act as much with sympathy and empathy being a physician. Doctors are role model till now and maintaining this profound relationship can sustain this glory forever.

ডিজিটাল ডাক্তার

সাজ্জাদ শাহরিয়ার সিয়াম, ব্যাচ-৪, ডেল্টা এমসি, ঢাকা

সময় এখন প্রযুক্তির। যখন সব সেক্টর প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাঁদের কাজগুলো সহজ করে তুলছে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব । মেডিকেলের পড়াশুনাকে কিছুটা প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট মাধ্যমে আরো বেগবান করা যায় কিনা দেখা যাক । এখন সবাই বলতে গেলে স্মার্টফোন ব্যবহার করে। হাজারো অ্যাপস আছে আমাদের দৈনন্দিন কাজকে সহজ করে তুলতে। মেডিকেলের পড়াশুনাকে একটু সহজ করতে আজ কিছু মেডিকেল অ্যাপস নিয়ে আলোচনা করবো। অনেকেই হয়ত জানেন আর যারা জানেন না তাঁদের জন্য এটা। (অ্যাপসগুলো সকল Android IOS ডিভাইসের জন্য) চলুন দেখে নেয়া যাক কিছু অ্যাপস এর কাজ ঃ

১। Dorlands Illustrated Medical মেডিকেল ডিকশনারী যাতে মোটামুটি আপনার দরকারি সকল মেডিকেল টার্মের ছবিসহ অর্থ পাবেন। খুব এ কাজের এই অ্যাপসটির দাম মাত্র ৫০ ডলার! IOS : http: //store.heaveniphone.com /2011/11/dorlands-illustrated-medical-dictionary-32nd-edition-iphone.html

২। Lab Values + Medical Reference ল্যাবের রেফেরেন্স ভ্যালুর এক বিশাল তালিকা আছে সিস্টেম অনুযায়ী যা আমাদের দ্রুত কাজ করতে হেল্প করবে ।
http://store.heaveniphone.com/2012/05/lab-values-pro-1-rated-medical-reference-app-iphone.html

৩। Drug Dictionary & information-নিচে কয়েকটা ভাল ড্রাগ ডিকশনারী নাম দেয়া হল যেখানে ড্রাগের ফার্মাকোলজি জানা যাবে। # Pocket Rx , http://store.heaveniphone.com/2012/11/pocket pharmacist--drug-information-and-medication-organizer-iphone.html #micromedex drug information

৪। Mnemonics : নতুন করে বলার কিছু নাই কম বেশি সবাই ব্যবহার করে। এরকম অনেক কিছু এক সাথে দেয়া একটি অ্যাপস

৫] Medscape : মেডিকেল নিউজ,রেফেরেন্স, ড্রাগসহ অনেক অনেক কিছু দিয়ে ভরপুর অ্যাপস টি ।
এরকম আরও কয়েকটি অ্যাপস : WebMD, Epocrates

৬] Bd Drug Directory, Bangladesh Drug Compendium Zils Drug Database: অবশেষে আমাদের দেশের ড্রাগ নিয়ে ডাটাবেজ তৈরি হল। ধন্যবাদ এর সাথে জড়িত সবাইকে। অ্যাপসগুলো সত্যি অনেক কাজের। উপরের ১ ও ২ ছাড়া বাকি সবই ফ্রি। কাজে লাগলে ডাউনলোড করে নিন ।

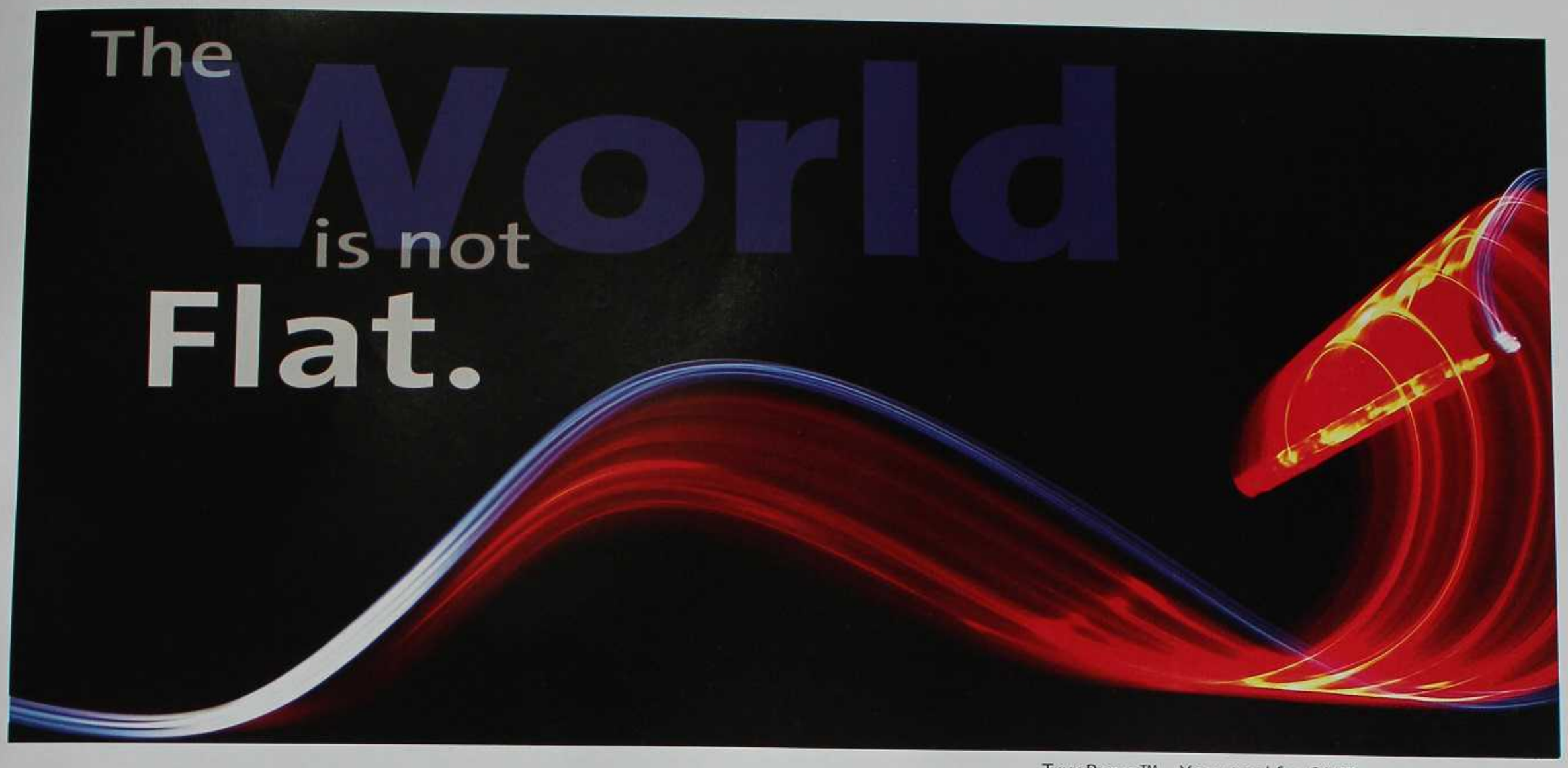

VARIAN
medical systems

Varian Medical Systems International AG
Zug, Switzerland
Phione: +41 41 749 88 44

Local Agent:

TRADEVISION LTD.

HOUSE-B-141, LANE-22
NEW DOHS, MOHAKHALI, DHAKA-1206
PHONE-88028711840-2, FAX-88028711940
www.tvlbd.com

TrueBeam™ – Your tool for SABR.

Stereotactic Ablative Radiotherapy (SABR) requires the highest possible precision – TrueBeam™ delivers it. Patients want to be treated in a short time – TrueBeam delivers it.
The Varian TrueBeam system with its unique high intensity modes in combination with the RapidArc® delivery technique enables you to deliver Stereotactic Ablative Radiotherapy with doses up to 25 Gy in 2 minutes – a delivery time you couldn't imagine before.
The exible fully integrated imaging system of the TrueBeam system provides you with the condence that the dose is precisely delivered to the planned position, while the integration with the ARIA® oncology information system and the Eclipse™ treatment planning system takes care that you have all information – plans, images and more – ready at your ngertips whenever you need them.

Be Smart with your patients, use TrueBeam.

Campus Through Our Lens

ডাঃ শোয়েব মোঃ রিয়াদ, ব্যাচ-৪৯, রামেক, স্থাপিত-১৯৫৮

আতিকুর রহমান বাপ্পী, ব্যাচ-২, সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম, স্থাপিত: ২০০৩

নওমি সাহাব দীপ্র, ব্যাচ-২ (ডেন্টাল), কুমুদীনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্থাপিত ঃ২০০১

যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে
রংপুরে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল

HEALTH CITY

CONCERN OF :

RANGPUR GROUP

- Doctors Community Hospital (Pvt.) Ltd
- RP pharmaceuticals Ltd.
- Rangpur Community Medical College
- RANGPUR HOUSING LIMITED
- Rangpur Dental College
- Rangpur Ready Mix Concrete Ltd.
- Rangpur Community Nursing Institute
- NU AUTO BRICKS LIMITED
- LASER DENTAL CARE & IMPLANT CENTER
- RANGPUR BEVERAGE LIMITED

Corporate Office :
House # 7 (1st Floor), Road # 13 (New) ,Dhanmondi R/A, Dhaka- 1209
Phone: 88-02-8150304,8150279,Fax: 88-02- 9140248
Mobile : 01715 201 980, 01732 711 107, 01972 000 200
E-mail: rangpurgroup@ymail.com, www.rangpurgroup.com

Rangpur Office :
Medical East Gate, Dhap, Burirhat Road, Rangpur, Bangladesh.
Phone: 88-0521-61113-5, Fax: 88-0521-61114
Mobile : 01717 292 458, 01773 793 330, 01739 015 195
E-mail: inforcmc@gmail.com,www.rangpurgroup.com